বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"কুঞ্জবালা" মুদ্রাঙ্কণকালে আমি শারীরিক অসুস্থ ও আকস্মিক নানা ঘটনায় নিতান্ত বিব্রত থাকায় দুই এক স্থানে চিহ্ন ব্যবহারাদির দোষ হইয়া গিয়াছে। একারণ সহৃদয় পাঠকমহোদয়গণের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে, অনুগ্রহপূর্ব্বক সে দোষ মার্জ্জনা করিবেন। ইতি

প্রকাশক।

গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন।

পাঠক মহাশয়েরা নায়ক নায়িকাচরিত উপন্যাস নবন্যাস অনেক দর্শন করিয়াছেন, বীরাঙ্গনা চরিতও অধুনা বঙ্গভাষায় বিরল প্রচার নহে; বলা বাহুল্য, তাহার অধিকাংশই ইংরাজীর ছায়া অবলম্বনে বিরচিত; তাহা বলিয়াই সে সকল পুস্তকের সার-বত্তা গুণের অপ্রশংসা করিতেছি অথবা লিপি মাধুর্য্যের অপলাপ করিবার ইচ্ছা করিতেছি, এমন আপনারা বিবেচনা করিবেন না, বাস্তবিক, তাহার অধিকাংশই সাহিত্যসমাজের আদরণীয়.— তাদৃশ গ্রন্থেরও অভাব নাই, সে অভাব মোচনেও আমি অগ্রসর নহি। তবে আমার এ আড়ম্বর, এ স্পৃহা কেন? পাগ্‌লামি বলি-লেও বলিতে পারেন; কিন্তু তাহা বলিবার অগ্রে আমার এই একটী নিবেদন, এই "কুঞ্জবালা" চরিত-খানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করুন। আশা করি প্রীতি পাইবেন, আনন্দ পাইবেন, কৌতুকও পাইবেন। যদিচ ইংরাজী অথবা অপর ভাষায় কোন পুস্তক ইহার মৌলিক আশ্রয় নহে, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য সারাংশকেই লক্ষ্য করিয়াছে। যিনি এ পুস্তকের প্রধানা নায়িকা, কার্য্য-কৌশলে প্রথমাবধি তাঁহাকে প্রকৃত পক্ষে চিনিয়া উঠা সুকঠিন। বাস্তবিক তাঁহার কার্য্যকলাপ ও গতিক্রিয়া আপাততঃ এত বিজটিল বলিয়া বোধ হইবে যে, পাঠ করিতে

করিতে ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময় ও বিভ্রম উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। অধিক কি, পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিমান নায়কগণও প্রধানা নায়িকা বিনির্ণয়ে সে বিস্ময় ও বিভ্রমের হস্ত অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ফলতঃ ইহাতে প্রায় সকল রসেরই বিদ্যমানতা আছে; তবে একটী কথা এই যে, কাশ্মীরকুসুম নামটী আপাততঃ সার্থক না হইতে পারে; সে সার্থকতা লাভ করিতে হইলে, পুস্তকের আয়তন বৃহৎ হইয়া উঠে। এই অংশ পাঠ করিয়া সহৃদয় পাঠকমণ্ডলি যদি কতক পরিমাণে আমোদলাভ করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগ্রহ হন, তাহা হইলে আমিও উৎসাহ লাভ করিতে, সত্বরে মনের আশা পূর্ণ করিয়া পুস্তকের নামটী সার্থক করত, যত্নবান্ হইব।

সন ১২৯৭ সাল }
৬ আষাঢ়। }

গ্রন্থকার।

কুঞ্জবালা।

কাশ্মীর-কুসুম।

প্রথম তরঙ্গ।

একটী বালিকা।

কাশ্মীর রাজ্যের মধ্যপ্রদেশে শোণ নদ প্রবাহিত। এই শোণ নদের পূর্ব্বপারে একটী সম্ভ্রান্ত ভদ্রপল্লী; পল্লীটী অতি মনোহর। ইহার শোভা-সৌন্দর্য্য ও সম্পদ্-গৌরব দর্শন করিলে একটী ছোট-খাট নগর বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। সুপ্রশস্ত রাজপথ, সুরম্য হর্ম্ম্যমালা, মনোহর কুসুমোদ্যান, শোভাময় কুঞ্জনিকেতন সকল অধিবাসীগণের সুখস্বচ্ছন্দতার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। একটী সুপ্রশস্ত রাজপথ কাশ্মীর নগর হইতে এই পল্লীর মধ্য দিয়া জম্বুনরের দিকে পড়িয়া আছে। পল্লীর উত্তরপ্রান্তে এই পথের পশ্চিমপার্শ্বে কাশ্মীররাজ-প্রতিষ্ঠিত একটী দেবালয়, সম্মুখে মনোহর উদ্যান পরিশোভিত শান্তিনিকেতন স্বরূপ একটী সুপরিস্কৃত উচ্চ অট্টালিকা। এই বাটীর ছাদের উপর একটী বালিকা বহুক্ষণ হইতে অর্দ্ধশায়িত ভাবে নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নযোগে যেন কোন

স্বর্গীয় দেবমূর্ত্তি দর্শন করিতেছিল, সহসা জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং চারিদিক্ চাহিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মা! মাঁ কৈ? মা! মা কোথায় গেলে? এই স্বপ্নে দেখিলাম, শূন্যপথে কোথায় চলিয়া গেলেন? প্রত্যক্ষে দেখিলাম না? দেখিয়াছি, চিনিনা, চিনিতে পারিলাম না; কে মা তুমি? আমার মন বিমোহিত করিয়া কেন মা তুমি চলিয়া গেলে?

প্রতিমা, প্রতিমা, দুটীই পাষাণ প্রতিমা!—তোমরা সমবয়স্কা নহ। বয়ঃকনিষ্ঠে! একাকারা, একবসনা, একাকার ভূষণা, কাহাকে তুমি ভগিনী বলিতেছিলে? তোমার সে সহোদরা কোথায়?—উত্তর করিলে না? তোমরা উভয়েই কি কুহকিনী, মায়াবিনী? আকাশপথে মিলাইয়া গেলে?—আমি ছাড়িব না। অবশ্যই আমি তোমাদের অন্বেষণে যাইব। যেখানে পাই অন্বেষণ করিয়া ধরিবই ধরিব।

এই কথা বলিতে বলিতে সেই বালিকা সহসা ঐ গৃহের ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া রাজপথে উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি এক প্রহর কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে রজনীর স্বভাববশে, সেই মাত্র শশধর অল্পে অল্পে আলোহিতবর্ণে সুপ্রকাশ। জলে কুমুদিনী কি করিতেছে? আকাশের ছায়ায় অর্দ্ধভাগ লুকাইয়া সুধাকর অর্দ্ধভাগে ধীরে ধীরে উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন। তারানাথের এরূপ গুপ্তপ্রেম;—গুপ্ত অভিনয় কি জন্য? প্রজাপতিবালারা চিরদিন সতিনী জ্বালায় জ্বালাতন, তাহার উপর সুদূরবর্ত্তী সরসীসলিলে কুমুদিনী সতিনী। তারামালা পাছে বিরহ অভিমানে মৌনবতী হইয়া অবগুণ্ঠনবতী

হয়, এই ভয়ে নবোদিত আলোহিত কুমুদিনীপতির গোপনে গোপনে এই দশা। কমলিনীপ্রেমে কমলিনীনায়ক দিবাকরের এত ভয় হয় না;—কেননা, দিবাকালে পদ্মিনীর প্রেমাকাঙ্ক্ষায় তিনি একা; নিশাপতির সেরূপ স্বাধীনতা নাই। পাছে তিনি পরপ্রেমাস্বাদে অনুরাগী হন, এই নিদারুণ প্রণয়সংশয়ে ঈর্ষাবিলাসিনী দক্ষদুহিতাগণ চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই আকাশগৃহে প্রদীপ জ্বালিয়া লক্ষ লক্ষ নেত্রে পতিপথে পাহারা রাখেন। তথাপি প্রেমচোর চন্দ্রমা জগতীতলে সলিলবাসিনী কুমুদিনীর প্রণয়লোভে বিমুগ্ধ; গোপনে গোপনে স্বর্গীয় প্রেমে প্রমত্ত।

চন্দ্রোদয়ে পৃথিবীর সরসীসলিলে কুমুদিনী প্রফুল্ল হইয়া যেন স্বাধীন ভর্ত্তৃকার ভাব দেখাইয়া হাসিতেছে; আবার সেই অবস্থাতেই মারুতসহবাসে কম্পিতা হইয়া যেন কলহন্তারিতাভাবে উপস্থিত মধুকরকে হতাশ করিতেছে। ভৃঙ্গ তাড়িত হইয়াও সে স্থান পরিত্যাগ করিতেছে না। এটী স্বভাবের দোষ। লম্পটের প্রকৃতিই এইরূপ।

বালিকা রাজপথে উপস্থিত হইয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দক্ষিণমুখে দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

কে এ বালিকা?—পাঠক মহাশয়! এখন যতদূর আমার জানা আছে, ততদূর আপনি জ্ঞাত হউন। অধিক পরিচয় আমি অবগত নহি।

বালিকা বলিলাম, কিন্তু আমাদের দেশের অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা নহে, বা দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকাও নহে। আকারেই পরিচয় পাইবেন।

বালিকা সুন্দরী।—সুন্দরী বটে, কিন্তু গৌরাঙ্গী নয়,হেমাঙ্গীও নয়, শ্যামাঙ্গী। আমাদের দেশের অনেকে মনে করে, ফুট গৌরবর্ণ না হইলে, সুন্দর সুন্দরী বলা যায় না। সেইজন্য আধুনিক কবিকুলচূড়ামণিগণের বর্ণনায় প্রায়ই তপ্তকাঞ্চন, কাঁচা হরিদ্রা আর দুধে আল্‌তার উপমার ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। এ বালিকা সুন্দরী। এ সুন্দরীর সহিত তপ্তকাঞ্চন, কাঁচাহরিদ্রা অথবা দুধে আল্‌তার কোন সম্বন্ধ নাই। বর্ণ শ্যাম—গাঢ় শ্যাম, তাহার উপর অল্প অল্প ফিকে ফিকে নীলের আভা। সে আভা যেন সূর্য্যকিরণে একটু একটু চক্‌মক্ করে। মুখখানি অনিন্দিত, চক্ষু দুটী প্রায় আকর্ণ বিস্তৃত, তারা দুটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, উজ্জ্বল এবং ভাসা ভাসা, নেত্রপল্লবদুখানি সস্তর মত দীর্ঘ, দৃষ্টি অতি কোমল এবং প্রশান্ত, ভ্রূযুগল ধনুকের মত টানা; কপাল, গণ্ডস্থল, ওষ্ঠাধর ও দন্তগুলি অনিন্দিত; কেশকলাপ কৃষ্ণবর্ণ, ঘন, নিতম্বস্পর্শিত ও চাকচিক্য; উভয় কপোলপ্রান্তে কৃষ্ণকুঞ্চিত অতি সুন্দর অলকদাম;—নাসিকা ঈষৎ উন্নত, বক্ষঃস্থল পীবর, বাহুলতা মৃণালসদৃশ সুললিত, কটিদেশ কেশরীর ন্যায় ক্ষীণ; নিতম্ব স্থূল, উরুযুগল করীশুণ্ড সদৃশ স্থূল ও সুবলন অথচ কোমল, পাণিতল ও পদতল যেন অলক্তরাগে সুরঞ্জিত, অঙ্গুলীদাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ কোমল এবং নখরাজী তদুপযোগ্য অথচ স্বচ্ছ এবং সুপরিস্কৃত। বয়স অনুমান পঞ্চদশ কি ষোড়শে পদার্পণ করিয়াছে,নাম কুঞ্জবালা।

বালিকা সুন্দরী।—এই অভাগা বঙ্গদেশের হঠাৎ কবিরা হয়ত এ সুন্দরীরে সুন্দরীই বলিবেন না। ব্যাসদেব মূর্খ! পঞ্চাল-

রাজকুমারী পাণ্ডবমহিষী শ্যামবর্ণা কৃষ্ণাকে তিনি সুন্দরী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন,—সমুদ্রমন্থনে মোহিনীরূপিণী বিষ্ণুমূর্ত্তিকে জগৎসুন্দরী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। যে সুন্দরীমূর্ত্তি সন্দর্শনে স্বয়ং বিশ্বমোহন বিশ্বনাথও মন্মথপীড়নে পাগল হইয়াছিলেন, সে মোহিনী কি সুন্দরী ছিলেন না?—ব্যাসদেব মূর্খ! সে তুলনায় কীটানুকীট আমি,—আমিও মূর্খ। সুতরাং আমার মতে এই প্রগাঢ় শ্যামবর্ণা কুঞ্জবালা সুন্দরী।

বালিকা দৌড়িতেছে,—এলোকেশী বালিকা কুঞ্জবালা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছে। চন্দ্রালোকে দিব্য দেখা যাইতেছে,ঊর্দ্ধমুখী বালিকা বিমনস্কভাবে জম্বুসরের রাস্তায় যেন উন্মাদিনীর ন্যায় দৌড়িয়া যাইতেছে। মনোমধ্যে জীবনের কি কোন বিষয়ে আশঙ্কা নাই।

পাঠক মহাশয়! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বালিকার পরিচয়ের বিষয় আমি জ্ঞাত নহি, কে এ বালিকা এখন তাহা কেমন করিয়া বলিব? জানিলেই জানাইব। যে বাটীর ছাদ হইতে বালিকা নামিয়া আসিল, সে বাটীখানি যেন রাজবাটীর ন্যায় পরিপাটী; বাটীতে নর-নারী দাস-দাসী কেহ উপস্থিত আছে কি না, দ্বারে দ্বারে প্রহরী প্রতিহারী আছে কি না, ব্যস্ততাবশতঃ সে গুলিও দেখিয়া আসা হইল না। চঞ্চলা উন্মনা কুঞ্জবালা সত্য সত্য রাজকুমারী কি না, ইহার পিতা-মাতা এ জগতে জীবিত আছেন কি না, তাড়াতাড়ি সেগুলিও জানা হইল না। অকস্মাৎ রাত্রি একপ্রহরের পরে এলোকেশী উন্মাদিনীর অনুসরণ করিতে হইল।

আকাশ-নন্দিনী অদৃশ্য প্রতিমাদ্বয়ের অনুসন্ধানকারিণী কুঞ্জ-

বালা এত দ্রুত গমন করিল যে, আমি তাহার পশ্চাদ্গামী হইয়াও ফললাভ করিতে পারি নাই। বালিকা কএক দিবারাত্রি কোথায় যে কি ভাবে অতিবাহিত করিল, আমি জ্ঞাত নহি। পঞ্চবিংশতি দিবসের পর কাশ্মীরের সুদূরবর্ত্তী জয়পুরের সীমা অতিক্রম করিয়া বালিকা আগরায় উপস্থিত। পূর্ব্বে এ স্থানের নাম, অগ্রবন ছিল। প্রবলপরাক্রান্ত যবনরাজ আকবর সাহ এই অগ্রবনের নাম দিয়াছিলেন আকবরাবাদ। কালে কালে, দিনে দিনে, পরিবর্ত্তনশীল জগতের, পরিবর্ত্তনশীলনিয়মে ইহার নাম আগরা হইয়াছে। অদূরে স্রোতস্বতী পবিত্রসলিলা যমুনা নদী প্রবাহিতা।

উন্মাদিনী কুঞ্জবালা সেই নিশাকালে একাকিনী আগরায় উপস্থিত। আকাশ জ্যোৎস্নাময়, ধরণী জ্যোৎস্নাময়ী, ক্ষুদ্র-প্রাণী অহঙ্কৃতা খদ্যোৎমালা এতক্ষণ নক্ষত্রমালারে উপহাস করিয়া দীপ দীপ করিয়া জলিতেছিল, কুঞ্জবাটীকার তরু-লতিকা আবৃত করিয়া অন্ধকার জগতে দীপ্তি বিকাশ করিতেছিল, চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রভয়ে এখন তারা কোথায় লুকাইয়া গিয়াছে। এতক্ষণ যাহারা তারকামালাকে স্পর্দ্ধা করিয়া গাছে গাছে খেলা করিতেছিল, তাহারা এখন নিষ্প্রভ। কেবল দূরে দূরে এক একটী টিপ টিপ করিয়া কখন জ্বলিতেছে, কখন নিবিতেছে, ভয়ে ভয়ে দেখিতেছে পশ্চাতে সুধাময় সুধাকর ধাইতেছে কি না। জগতে দুর্ব্বল প্রাণির দশাই এই;—অহঙ্কারী ক্ষুদ্র প্রাণী ভীরু লোকের দশাই এই, চন্দ্রোদয়ে নিশাকালে জোনাক পোকার দশাই এই। ভয়ের সময় গর্ব্ব থাকে না, জগতের

সম্ভাবকে এই শিক্ষা দিবার জন্যই জোনাক পোকারা এখন নিস্তেজ নিষ্প্রভ।

কুমুদিনী হাসিল।—হাসিয়া হাসিয়া আনন্দসলিলে,—উল্লাসে উল্লাসে সরসী-সলিলে ভাসিয়া উঠিল;—সরোবরে কুমুদিনী ফুটিল। সভয় মরুৎ এতক্ষণ নির্ভয়ে নিকটে আসিয়া কাণে কাণে কথা কহিতেছিল, এখন ভয়ে ভয়ে দূর হইতে আজ্ঞাবহ সেবকের ন্যায় বিজন করিতে লাগিল। ধরণীসতী চন্দ্রালোকে হাস্যমুখী। মৃদু মন্দ বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, কুমুদিনী দুলিতেছে, তরুশিরে পত্রাবলী কাঁপিতেছে, সলজ্জ লতাবল্লরি ধীরে ধীরে হস্ত নাড়িতেছে, মাথা নাড়িতেছে, বায়ু হিল্লোলে কল্লোলিনী তরঙ্গিনী যমুনা সুস্থির মন্থরে তরঙ্গিত হইতেছে। সরসীগর্ভে,যমুনা হৃদয়ে, চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, হিল্লোলে হিল্লোলে ক্ষয়কলা একটী চাঁদ হীরক খণ্ডের ন্যায় শত শত খণ্ড দেখাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন জলকেলি করিবার জন্য দক্ষবালাগণ চাঁদকে বুকে করিয়া আকাশের সহিত পৃথিবীর জলতলে নামিয়া আসিতেছে;—নীল জলে নীল আকাশ প্রতিফলিত; কালীন্দির নীল কলেবর শত শত হীরক খণ্ডে বিভূষিত ও উদ্ভাসিত।

বালিকা কুঞ্জবালা আর চলিতে পারে না।—শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া যমুনা তীরের একটী কুঞ্জবনে বিমর্ষভাবে উপবেশন করিল। মৃদু মন্দ বায়ু সঞ্চারে নিবিড় তরুপল্লব ভেদ করিয়া সুধাকরের সুধা-সিক্ত সুধাকর অল্প অল্প বিকাশ পাইতেছে, অগ্রবনের বনস্থলী অল্প অল্প চন্দ্রালোকে আলোকিত হইতেছে,বন অতি পরিস্কার।

বিধাতার আশ্চর্য্য লীলা;—তরুতলে একটীও শুষ্ক পত্র

পতিত নাই, কে পরিষ্কার করিয়া দিতেছে, কে বলিয়া দিবে? বোধ হয় মার্জ্জনী হস্তে স্বয়ং প্রেমময়ী প্রকৃতি দেবী এই মধুকুঞ্জ অহোরহঃ বিমর্জ্জন করিতেছেন। তরুতল অতি পরিষ্কার. সেই পরিচ্ছন্ন তরুতলে সুধামুখী কুঞ্জবালা উপবিষ্টা। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে, মুখে বাক্য নাই, কাহার নিকটেই বা বাক্য; স্ফূর্ত্তি হইবে? মন অন্য দিকে। যে প্রতিমা দেখিতে দেখিতে আকাশ পথে বিলীন হইয়াছিল, বালিকার মন সেই প্রতিমার দিকে আকর্ষিত; কুঞ্জবন অর্দ্ধ আলোকিত অর্দ্ধ অন্ধকার।

কুঞ্জবালা নিস্তব্ধ, নীরব।—কি যেন মনে পড়িল, কে যেন নিকটে ছিল, বিদ্যুতের ন্যায় কে যেন নয়ন পথ হইতে অপসৃত হইয়া গেল; ভাবিনী এই ভাবে ভাবাকুলা।

ক্ষণকাল অন্যমনস্কভাবে থাকিয়া পশ্চাৎদিক হইতে মনুষ্যের মৃদু পদশব্দ শ্রবণে বালিকা সহসা চমকিত হইয়া উঠিল এবং ভয়ে বিস্ময়ে জড়সড় হইয়া রোদনোন্মুখী কুঞ্জবালা সজলনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে তৎকালের একমাত্র সহায়িনী ভাবিয়া স্থিরমূর্ত্তি রজনী দেবীরে সম্বোধন করিয়া কহিল, মা! রজনী দেবি! তুমি বিনা এ নিশিথে মনের কথা বলিবার অনাথিনীর আর কেহই নাই। মা! কোথায় আমি।—দেখিতেছি অরণ্য! যমুনাতীরে মহারণ্য!! জগৎ যেন আমার চক্ষে অরণ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। মা! আমি কোথায় আসিয়াছি? মা! এ বনভূমে কে আমারে আশ্রয় দান করিবে? তুমি, তুমি মা! অদিন দুর্দ্দিনে দীনজনের একমাত্র সহায়। মা! আমি একটু শয়ন করি;—সুশীতল কোমলকোলে এই অনাথা বালিকারে

স্থান দান কর, একটু শয়ন করি। পথশ্রমে মনভ্রমে সাতিশয় কাতরা ; মা, রজনী দেবি ! পৃথিবীতে আর আমার কেহই নাই ; আশ্রয় দাও বলিয়া, বিপদে প্রার্থনা করি, ইহজগতে এমন আর আমার কেহই নাই। মা ! অনুকুলা হও। স্থান দাও। শীতল কোলে শয়ন করিয়া এই অনাথিনী যেন একটু শীতল হয়।

কুঞ্জবালা নিস্তব্ধ।—পশু পক্ষী নিস্তব্ধ, অগ্রবনের মহারণ্য নিস্তব্ধ—গভীর নিস্তব্ধ; এরূপ নিস্তব্ধতায় ক্ষণেকের জন্য বালিকার ভয়, সন্দেহ সমস্তই নিদ্রার আবেশে মিশাইয়া গেল; সুতরাং ঘুমঘোরে কুঞ্জবালার এখন কিছুমাত্র চৈতন্য নাই; চিন্তানিবারিণী নিদ্রাদেবীর শান্তিক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া কুঞ্জবালা এখন নিশ্চিন্ত। তরুপল্লব ভেদ করিয়া সুধাকরের সুস্নিগ্ধ কিরণ-রাজী অল্প অল্প করিয়া গাত্র স্পর্শ করিতেছিল, কুঞ্জবালা তাহা দেখিতে পায় নাই ; বনস্থলী অল্প অল্প করিয়া কৌমুদীমালায় আলোকিত হইতেছে, কুঞ্জবালা তাহা দেখিতে পায় নাই ; যে যে স্থলে তরুগণ নিবিড় পল্লবে সমাচ্ছন্ন, সেই সেই স্থল চন্দ্রিকা বিরহে অন্ধকার, কুঞ্জবালা তাহাও দেখিতে পায় নাই ; কেননা কুঞ্জবালা তখন অঘোরে নিদ্রিত।

সহসা কুঞ্জবালার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পুনরায় ভয়ের, বিস্ময়ের, বিপদের ছায়া অন্তরে প্রবেশলাভ করিল ; কমললোচনার কমল-লোচন ঈষৎ ঈষৎ উন্মীলিত হইয়া ঈষৎ ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। অল্পে অল্পে ওষ্ঠাধর কাঁপিল, কুঞ্জবালা জাগ-রিতা, সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া নিষ্প্রভ চন্দ্রালোকে বালিকা দেখিল, ভীষণ অরণ্য। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরুরাজী দীর্ঘ দীর্ঘ শাখাবাহু

বিস্তার করিয়া বনবাসীগণকে যেন ভয় প্রদর্শন করিতেছে। পশু পক্ষীর রব নাই, জনপ্রাণির সঞ্চার নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে সমুন্নত পাদপমস্তকে চঞ্চল পবন, শান্তভাবে খেলা করিতেছে মাত্র। এ বনে হিংস্র জন্তুর সম্পর্ক নাই। বিষধর কালভুজঙ্গের সমাগম নাই। তরুতলে শ্রুতিমত বৃন্দারণ্যের ন্যায় একটীও শুষ্ক পত্র নিপতিত নাই, সুতরাং কোন জীবের পদমর্দ্দন শব্দে আশঙ্কা সঞ্চারের সম্ভাবনা নাই; তথাপি, আহা! তথাপি বালিকা একাকিনী ভয়ে ভয়ে মনে মনে কম্পিত হইতেছে।

বালিকা তখনও বনমধ্যে ভূমিশয্যায় পতিত। সেই তরুতল-শায়িনী বনবিহারিণী শরণার্থিনী বালিকা কুঞ্জবালা নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করিবার অগ্রেই কম্পিত হৃদয়ে, কাতরকণ্ঠে পুনর্ব্বার রজনীদেবীরে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিল, মা! রজনীদেবি! আমিতোমার ছায়ায়, তোমার আশ্রয়ে, তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছি।—দেখ মা! যেন বিঘোরে জীবন বিসর্জ্জন না হয়।—মা! কোথায় আমি? কোথায় আমি আসিয়াছি? কত দিন গৃহ-ত্যাগিনী হইয়াছি? মা! রজনীদেবি! আমি সকলকে ত্যাগ করিয়াছি, আমাকেও সকলে ত্যাগ করিয়াছে, তুমি আমারে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। মা! আমি তোমারই আশ্রয়ে নির্ভয়ে শয়ন করিয়া থাকি।

অকস্মাৎ পার্শ্বে নেত্রপাত করিয়া ভয়বিহ্বলা বালিকা চকিত-নয়নে দর্শন করিল, একজন দীর্ঘাকার বিকটাকার পুরুষ বক্ষঃস্থলে বাহু বন্ধন পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখিয়াই অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া বালিকা সভয়ে নয়ন মুদ্রিত করিল। ভয় যখন

নারীহৃদয়ে অথবা শৈশব হৃদয়ে একবার প্রবেশ করে, সহজে তখন তাহার আশু বিরাম হয় না।—ক্ষণে ক্ষণে সেই ভয়োৎপাদক পদার্থকে নয়নগোচর করিবার ইচ্ছা জন্মে, চক্ষু উন্মীলিত করিবার আকাঙ্ক্ষা হয়, স্ত্রীলোকের আর বালকের প্রকৃতিই এই।—কেবল তাহাই নহে, ভীরুহৃদয় মাত্রেরই এটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যাহাকে দেখিলে ভয় হয়, পুনঃ পুনঃ দেখিলে সেই ভয় আরও বাড়িবে, জানে, বুঝিতে পারে, তথাপি দেখিতে ইচ্ছা হয়। কি আশ্চর্য্য প্রকৃতির লীলা।

সহসা নিদ্রা ভঙ্গে ভয়ার্ত্তা কুঞ্জবালা সম্মুখে বিকটমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে, দর্শন মাত্রেই নেত্র নিমীলন করিয়াছে, তথাপি, সেই মূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত বারম্বার ধীরে ধীরে নেত্রপল্লব উন্মোচন ও বারম্বার সভয়ে আবরণ করিতেছে, আশ্চর্য্য ভীতিভাব। বোধ হইতেছে যেন কমলের উভয় পার্শ্বে দুইটী মধুলোভা মধুকর থাকিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে পক্ষ সঞ্চালনদ্বারা পক্ষ সঙ্কোচন করিয়া নীরবে ক্রীড়া করিতেছে। বিরাট পুরুষ নির্ব্বাক্, নিস্তব্ধ। ভয়াকুলা কুঞ্জবালাও ভয়ে ভয়ে নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ।

কুঞ্জবালা তমাল বৃক্ষতলে শুইয়া আছে। গাছে গাছে সুস্বরবাহিনী বিহঙ্গিনীরা জগদীশ নামে মঙ্গল গীত গাহিয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, দয়াময়! বনবিহারিণী কাঙ্গালিনীরে অভয় দান কর। পদাশ্রয়ে অভয় দান করিয়া বনভয় বিদূরিত কর। বিশ্বেশ্বর! বিশ্বভয় নিবারণ করুণাময়রূপে উদয় হইয়া করুণা বিতরণে আগরার অরণ্য মধ্যে এই অনাথিনীরে এই রাত্রি কালে মহাবিপদে রক্ষা কর।

পক্ষী নীরব হইল। কুঞ্জবালা কএকটী পক্ষীর মধ্যে একটী পক্ষীর স্পষ্ট রব শ্রবণ করত মনে মনে করিল, পক্ষীতেও মনুষ্যের মত কথা কহিতে পারে? পারিবে না কেন? কত কত পালিত সুশিক্ষিত পক্ষী দিব্য কথা কয়; দেখিতেছি, এ পক্ষীটী ভগবানের নিকটে আমার মঙ্গলকামনা করিতেছে। আমি কি পক্ষীটীর কখন কোন উপকার করিয়াছি? না, যদি ক'রে থাকি, তাহা এখন আমার মনে নাই। আমি এ স্থানে আসিয়া ভাবিতেছিলাম, এ কোথা আসিলাম, তাহাও পক্ষীর কথায় জানিতে পারিলাম যে, আগরায় আসিয়াছি। মনের গতি একরূপ নহে, বালিকা কতরূপ ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় অচেতনে ঘুমাইয়া পড়িল। কে বলে গভীর নিদ্রায় স্বপ্ন হয় না? গভীর নিদ্রায় কুঞ্জবালা স্বপ্ন দেখিল, কে যেন তাহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে। দুই বাহু বিস্তার করিয়া বিকট বদনে কে তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে; দেহলতা স্পন্দিত হইল, ঘুমে ঘুমে স্বর ফুটিয়া উঠিল।

প্রথমে যেন গীতের সুরে করুণস্বরে একটী নাম ফুটিল। পরক্ষণেই যেন স্বপ্নে স্বপ্নে কহিতে লাগিল, মা! কোথায় তুমি!—একবার আসিয়া দর্শন দাও। তোমার অদর্শনে আমি জগৎসংসার অন্ধকারময় দর্শন করিতেছি। মা! তোমায় হারাইয়া উদাসিনী হইয়া অনিবার বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। জননি! দেখ এসে, তোমার অনাথিনী অভাগিনী আদরিণী কন্যা তোমা বিহনে বনবাসিনী হইয়াছে। মা! একবার আসিয়া তোমার আদরিণী কুঞ্জবালারে কোলে কর! মা!

অনাথিনী বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? কাহার কাছে ফেলিয়া গেলে? মা!—দয়াময়ি! কাতরে ডাকিতেছি, একটীবার সদয় হও! দেখা দাও। অনাথা দেখিয়া পাপ-সংসার যেন আমায় গ্রাস করিতে আসিতেছে। দয়া করিয়া রক্ষা কর।

অনেকক্ষণ নিশ্বাস পড়িতেছিল না। সজোরে একটী নিশ্বাস পড়িল! স্বপ্নে যেন আবার জননীরে বিস্মরণ হইয়া চেতনাহারা কুঞ্জবালা মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, মা! নিদ্রাদেবি! মা! বিরামদায়িনি! আশ্রয় দাও! এই অসার সংসারে আমার আর কেহই নাই। আমি জাগিয়াছি; কেন জাগিয়াছি? কাহার জন্য জাগরণ? মা! আবার আমারে ঘুম পাড়াও! আবার সুখে ঘুমাইয়া পড়ি,—পাপ-সংসারের সুখ দুঃখ, মায়া মোহ, অনুরাগ-বিরাগ সমস্তই ভুলিয়া যাই!—কোলে কর,—আশ্রয় দাও, আবার দয়া করিয়া উর মা! আমি অচেতনে ঘুমাইয়া পড়ি।

আর আমি স্বপ্ন দেখিব না। স্বপ্নেশ্বরি! আর আমারে প্রতারণা করিও না। এবার ঘুমাইলে আর আমি জাগিব না। আর আমি চতুর্দ্দিকে বিভীষিকা দর্শন করিব না।—মা! আর যেন মন আমার কাঁপিয়া কাঁপিয়া না উঠে।

মা! অভয়ে! আর যেন কোন দস্যু আমায় স্পর্শ করিতে না আইসে! জননি! তোমার কোলে আমি এই অগ্রবনকুঞ্জে ঘুমাইয়া থাকি। মায়াদেবি! তোমার মায়াকুহকে এ নিদ্রা যেন আর এ জন্মে ভঙ্গ না হয়! একবার আমি;—এই একটু

আগে একবার আমি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, 'কোথায় যেন রহিয়াছি—কোথায় যেন আবার পলায়ন করিয়াছে; একাকিনী মনহারা হইয়া তরুতলে শুইয়া আছি, নিকটে কেহই নাই, কেবল তুমিই আছ, আর কেহই নাই। মা! পদছায়া দান কর। আমি বড়ই অভাগিনী। মা! এই অনাথা কুঞ্জবালা তোমারই অধিনী তোমারই আশ্রিতা। মা! শান্তিপ্রদায়িনি! আমি জন্মাবধি কাঁদিতেছি, আর আমায় কাঁদাইও না। ভ্রমাবেশে এই দেশে আসিয়া পড়িয়াছি! মা! রক্ষাকালীরূপে আমায় রক্ষা কর!

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

——*-

মহাবিপদ।

অগ্রবনের মহারণ্য মধ্যে অনাথিনী বালিকা কুঞ্জবালা একাকিনী তরুতলে শয়ন করিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে কথন জননীরে, কথন রজনীরে, কথন নিদ্রারে এবং কথন বা স্বপ্নদেবীরে সম্বোধন পূর্ব্বক দুঃখ জানাইতেছে, আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে এবং বিশ্রাম লাভ-লালসায় নানাপ্রকার কাকুতি মিনতি করিতেছে; কিছুতেই ভয়াপনোদন হইতেছে না, সুতরাং শান্তিলাভ করিতেও পারিতেছেনা। বিকটাকার বিরাট পুরুষ

সমভাবে অস্পন্দ হইয়া এক স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে. তরুতলশায়িনী ভয়াকুলা বালিকা কুঞ্জবালাও সমভাবে শায়িত থাকিয়া পুনঃ পুনঃ নেত্রবিকাশ ও নেত্রনিমীলন করিতেছে। তদ্দর্শনে বিকটাকার দস্যুর আনন্দের আর সীমা পরিসীমা নাই। পাঠক মহাশয়! প্রকৃতি যদি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকেন, নিশ্চয়ই দর্শন করিয়াছেন, সেই নরাধম নৃশংস দুর্বৃত্ত দস্যু মনের আনন্দে নীরবে হাস্য করিয়াছিল।

এইরূপে একদণ্ড অতীত। ভয়াকুলা কুঞ্জবালা নীরবে শয়ন করিয়া আছে, ভয়ে হৃদয়, বদন, বাহু, উরু, পদতল, এমন কি, মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্তও কম্পিত হইতেছে। বিকটাকার বিরাট পুরুষ, সেই কম্পনদর্শনে আনন্দে হাস্য করিতেছে। আরও একদণ্ড অতীত। ভীমকায় ভীষণ দস্যু এই সময়ে জলদগম্ভীরগর্জ্জনে বালিকারে সম্বোধন করিয়া কহিল, আয়! এখানে শয়ন করিয়া কেন এই সুন্দর দেহকে ধূলায় ধূসর করিতেছিস্? উঠিয়া আয়! আমি তোরে সযতনে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাজরাণী করিয়া রাখিব। আয়! উঠিয়া আয়! আমি তোরে রাজভবনে লইয়া গিয়া রাজসিংহাসনে বসাইব। কালান্তক দস্যুর এইরূপ নির্ঘাত বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বালিকার সংজ্ঞাশূন্য কম্পিতহৃদয় আরও কম্পিত হইতে লাগিল। পরক্ষণেই চেতনা প্রাপ্ত হইয়া হতাশে সভয়ে মৃদুস্বরে কহিল, মা! রজনীদেবি! এইত আমি তোমারে মিনতি করিয়া বলিলাম, অভয় ক্রোড়ে স্থান দান করিয়া অনাথা বালিকারে নিরাপদে রক্ষা কর। সে

করুণস্বর তোমার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিল না? মা! জগৎমোহিনি! সন্তাপহারিণি! বিধাতা কি তোমারে শ্রবণ শক্তি প্রদান করেন নাই? বধিরে! থাক তুমি! আর আমি তোমারে দয়াময়ী বলিয়া ডাকিব না। জননী বসুন্ধরে! দয়া করিয়া তোমার সুধাময় গর্ভে এই হতভাগিনীরে একটু স্থান দান কর। এ পাপসংসারে আর আমার থাকিবার অভিলাষ নাই। মা! এই অনাথিনী কুঞ্জবালারে কোলে করিয়া লও। পাপমূর্ত্তি সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া কুঞ্জবালা আর ইহ জগতে বাঁচিয়া থাকিবে না।

নৈরাশ্যে বিলাপ করিতে করিতে সহসা বালিকার ভয়বিহ্বল কোমল হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় সাহসের সঞ্চার হইল। আরক্ত নয়নযুগল হইতে যেন অনলকণা বিনির্গত হইতে লাগিল। তত ভয়ের মধ্যে থাকিয়াও সেই সাহসের উপর ভর করিয়া বালিকা বৃক্ষতলে উঠিয়া বসিল এবং ঘূর্ণিতলোচনে সমীপবর্ত্তী কাল দস্যুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, পাপাত্মন্! কে তুই? পবিত্র অবলা কুমারীর অমূল্য সতীত্বরত্ন অপহরণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছিস্, কে তুই দুরাত্মন্? জানিস্ না, আমি ক্ষত্রিয়কুমারী,—সুপবিত্র সূর্য্যবংশে আমার জন্ম। দুরাচার যবনের দুরাচারে চিতোরের পদ্মিনী সতী প্রজ্বলিত হুতাশনে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, যবনের অত্যাচারে উদয়পুরের সরোজিনী সতী পাপমতি আলাউদ্দীনকে সতীত্ব দেখাইবার নিমিত্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ প্রদান করিয়াছিলেন, আমি সেই মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। দুরাত্মন্! দূরে অবস্থান কর্!

সতী ক্ষত্রিয় কুমারীর অঙ্গস্পর্শ করিতে কদাচ সাহস করিস্ না। যদি ততদূর দুঃসাহস তোর্ পাপ হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে, পরিত্যাগ কর্। ক্ষত্রিয়কুমারী কুঞ্জবালা সরসীসলিলে নিমগ্ন হইবে, প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যে প্রবেশ করিবে, তথাপি রে পাপাত্মন্! তথাপি তোর্ পাপাত্মার অনুগামিনী হইবে না; দুরাচার দুর্ব্বৃত্ত নরাধম! তুই দূর হ!

বিরাট পুরুষ হাস্য করিয়া কহিল, আয়! আমার সঙ্গে উঠিয়া আয়। কথা সমাপ্ত হইবার অবসরেই সেই দুরাচার দস্যু কালসর্পাকার বাহুযুগল-দ্বারা শোকসন্তপ্তা কুঞ্জবালারে আকর্ষণপূর্ব্বক অরণ্যপথে প্রস্থান করিল। কোথায় লইয়া চলিল, দেখিতে পাইলাম না। অসহায়া বালিকা উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; সে স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিবার অবসর পাইল না। দুরাচার দস্যু দ্রুতপদে কুঞ্জবালারে লইয়া দেখিতে দেখিতে অরণ্যপথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তৃতীয় তরঙ্গ।

পর্ব্বত গুহা।

চারিজন প্রহরী বন্দুক হস্তে লইয়া গুহামুখে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। পাঁচ সাতটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিকারী কুক্কুর ঘেউ ঘেউ শব্দ করিয়া গুহাপথে প্রহরীতা করিতেছে।

পথ শঙ্কীর্ণ,—দুর্গম,—নিতান্তই দুর্গম। গুহামধ্যে লোকালয়,—সম্মুখে ডাকাইতগণের একটী মজ্‌লিশ ঘর,—ঘরখানি বেশ আয়তনবিশিষ্ট।—মধ্যস্থলে একটা গোল মেজ; মেজের চতুঃপার্শ্বে মণ্ডলাকারে দশটী পুরুষ, সাতটী স্ত্রীলোক, কিঞ্চিৎ দূরে একখানি গালিচার উপর একটী বালিকা অচেতনাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। মেজ বেষ্টন করিয়া যাহারা বসিয়াছিল, তাহারা সকলেই সুরাপানে প্রায় উন্মত্ত। একজন বলিয়া উঠিল, যাহারে ধরিয়া আনিয়াছিস্, তাহারে সম্মুখে আনিয়া ধর।

একজন কুঞ্জবালারে উঁচু করিয়া ধরিয়া আনিল, কুঞ্জবালা অচেতন। যাহারা এ কার্য্য করিতেছে, তাহারা ডাকাইত।—উৎসাহে উৎসাহে একজন ডাকাইত বলিয়া উঠিল, ভাল শিকার ধরিয়া আনিয়াছিস্, আর একজন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, লুঠের মাল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইবে। আর একজন দয়া করিয়া বলিল, না—এ রত্ন—এ দুর্লভ রত্ন গিরিগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইবার উপযুক্ত নহে। এ রত্ন কোথা হইতে আনীত হইল?

ডাকাইতদের মধ্যে একদল বলিতেছে ধর, একদল বলিতেছে রক্ষা কর! একদল বলিতেছে, না, তাহা হইতে পারে না, অন্য দল বলিতেছে, অবশ্য,—অবশ্য হইবে। এইরূপে উন্মত্ত ডাকাইতগণ চেঁচামেচি করিতে লাগিল। দু চারিজন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যাইতেছে, আবার দু চারিজন নূতন ডাকাইত গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া সাগ্রহে সুরাতরঙ্গিণীর সেবা করিতেছে এবং অভিনব শিকার দর্শনে

আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে। তত ভিড়ের মধ্যে এক বৃদ্ধা আসিয়া অচেতনা কুঞ্জবালারে পাথালিকোলা করিয়া গৃহান্তরে লইয়া গেল। ডাকাইতেরা হায় হায় করিয়া ইতস্ততঃ শশব্যস্ত। রজনীদেবী ডাকাইতগণের চেঁচামেচি, গোলমাল সহ্য করিতে পারিলেন না। ঊষা-সখীরে প্রতিনিধি রাখিয়া দূর গহনপথে প্রস্থান করিলেন।

ঊষা সমাগত। রজনীর প্রিয়সুহৃদ অন্ধকারও একটু একটু করিয়া দূরে, অপসৃত হইতে লাগিল। ঊষাসমীরণ ধীরে প্রবাহিত হইয়া জগতের জীবগণকে জাগাইতে আরম্ভ করিল। খোপে খোপে পায়রা ডাকিতেছে, গাছে গাছে ময়ূর নাচিতেছে, পিঞ্জরে পিঞ্জরে পাপিয়া ডাকিতেছে, পাপিয়া বলিতেছে চোক গেল, বউ কথা ক পাখী বলিতেছে, বউ কথা ক! দহিয়াল শিশ দিয়া বলিতেছে, দহিলে দহিলে! কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিলে বলিতেছে কুহু কুহু কুহু! তথাপি পাপিয়া বলিতেছে চোক গেল। সে সকল স্বরে কে কর্ণপাত করে? বৃদ্ধা কুঞ্জবালারে লইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিল। ডাকাইতেরাও হায় হায় করিয়া ইতস্ততঃ মহা শশব্যস্ত।

ক্রমে প্রভাত হইল। গুহাবাসী জীব জন্তুগণ জাগিয়া উঠিল। সকলেই জাগ্রত সকলেই সচেতন;—অচেতন কেবল দুরাচার দস্যুদলকবলিত অনাথিনী কুঞ্জবালা। বৃদ্ধা অশেষ বিশেষ যত্ন করিতেছে, প্রবোধ প্রদান করিতেছে, কিছুতেই ভয় দূর হইতেছে না, কিছুতেই ভয়াকুলা বালিকার চৈতন্য জন্মিতেছে না। ক্রমে ক্রমে দুই জন দস্যু আসিয়া সেই

গৃহে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা দ্রুতপদে তাহাদের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া কহিতে লাগিল, কে তোরা দুরাচার? কাহারে তোরা কোথা হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছিস্! এ যে আমার রাজলক্ষ্মী!

প্রথম বিকটাকার দস্যু বিকট হাস্য করিয়া কহিল; কথা কহিবার তোমার অধিকার নাই। আমি ইহারে হরণ করিয়া আনিয়াছি। সুন্দরী অগ্রবনের নিকুঞ্জে শয়ন করিয়াছিল, আমি ইহারে কোলে করিয়া আনিয়াছি। বৃদ্ধা কহিল হায়!! ইহারে হরণ করিয়া তুই কি দুর্জ্জয় পাপ সঞ্চয় করিলি।— তোরা ইহারে আগরার অরণ্য হইতে হরণ করিয়াছিস্; তোদের আর মঙ্গল নাই। যা দুরাচারগণ! সত্বর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যা। এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেল। দস্যুরাও, কুঞ্জবালা অচেতন দেখিয়া, প্রস্থান করিল।

স্নেহদয়া শৈশবহৃদয়ে কিছু কম থাকে। যৌবনে আর কিছু, প্রাচীন অবস্থায় আর কিছু বেশী। ডাকাইতের গহ্বরে কুঞ্জবালারে সেরূপ বিপদাপন্ন অবস্থায় ফেলিয়া গিয়া বর্ষীয়সী অধিকক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। দস্যুদ্বয় চলিয়া গেলে, পুনরায় গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক, পূর্ব্ববৎ, কুঞ্জবালার চৈতন্য সম্পাদনে সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে কুঞ্জবালার চৈতন্যোদয় হইতে আরম্ভ হইল। ধীরে ধীরে একবার নেত্রপল্লব উন্মীলন করিলেন। অন্তরে দারুণ আঘাত, দারুণ যন্ত্রণা শরীর অতিশয় দুর্ব্বল! ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় নয়ন মুদ্রিত

করিলেন। দুরাচার দস্যু পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে, বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়াছে, বালিকার কোমলহৃদয় এই আঘাতেই নিদারুণরূপে আহত।

এই সময়ে প্রাচীনা ঘূর্ণিতনেত্রে তর্জ্জনস্বরে কহিল, আমার এই অনাথিনী বালিকার উপর কেউ তোরা অত্যাচার করিতে পারিবি না। কুঞ্জবালা অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। অগ্রবনে যে বিকটাকার বিরাট পুরুষ বিভীষিকা দর্শন করাইয়াছিল, আবার সেই মূর্ত্তি সম্মুখে। বিরাট পুরুষ আকারে নিষ্ঠুর প্রকৃতিতে তত নয়। একটু একটু হাস্য করিয়া সে কহিল, "সুন্দরি! তোমারে আমি অরণ্য হইতে আনয়ন করিয়াছি। অভিলাষ কি? তা তুমি জাননা। কেন আমি তোমারে আনিয়াছি; তাহাও তুমি জান না। এই সকল লোক তোমায় উৎপীড়ন করিবে, চক্ষে আমি তাহা দেখিব? তুমি সুশীলা বালিকা, জগৎপিতা তোমারে রক্ষা করিবেন, ভয় নাই, তুমি নিশ্চিন্তে নির্ব্বিঘ্নে অদ্য এই গিরিগুহায় বাস কর" দস্যু চলিয়া গেল।

আমি যেমন মানুষ, ডাকাইত কি সে রকম মানুষ নহে? আমার হৃদয়ে যেরূপ দয়া আছে, ডাকাইতের হৃদয়ে কি সে রূপ দয়ার সঞ্চার নাই? প্রকৃতি কহিয়া দিতেছেন জগতে নরনারী সকলেই সমান, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কাহার মনে কি, তাহার সামঞ্জস্য বৈশেষিক দার্শনিকেরাই করিতে পারেন, আমি জানি না।

বৃদ্ধা দয়া করিয়া কহিল, তোর মা ভয় নাই। ভয়াতুরা

কুঞ্জবালা কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। জন্মাবধি অনেক বিপদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু এমন বিপদে কখনই আমি পতিত হই নাই। এখনও স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চ হয়। যে সময় অগ্রবনে একাকিনী নিদ্রিতাবস্থায় শয়ন করিয়াছিলাম, দুরাচার রাক্ষস সেই সময় অজ্ঞাতসারে আমারে গ্রাস করিতে গিয়াছিল। তখনই যদি কৃতান্ত আমারে পৃথিবী হইতে তুলিয়া লইয়া যাইত, তাহা হইলে আর আমারে এ রাক্ষসী পুরীতে প্রবেশ করিতে হইত না।

মলিনবসনা কুঞ্জবালা ধরাতলে শয়ন করিয়া এই-রূপে বিলাপ করিতেছে, অশ্রুপ্রবাহে বালিকার বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত ভাসিয়া যাইতেছে; শোকে ও দুঃখে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছে না। এ রাক্ষস পুরীর মধ্যে কে তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিবে, কে তাহাকে প্রবোধ দিয়া শান্তনা করিবে? একমাত্র সেই স্থবিরা, দয়াবতী স্থবিরা বিষণ্ণবদনে নিকটে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে কহিতেছে মা! যেখানে তুমি আসিয়াছ, সে খানে কোন ভয় নাই। পাহাড়ী লোক স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর হয়, অসহায় লোকের উপর দৌরাত্ম্য করে, এ তাহাদের স্বভাব, তাহাতে তোমার ভয় নাই। যে তোমারে হরণ করিয়া আনিয়াছে, তাহারে আমি শত শত সহস্র সহস্র তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কাতরা হইও না।

স্থবিরা এইরূপে ভয়বিহ্বলা কুঞ্জবালারে প্রবোধ প্রদানে শান্তনা করিতেছে, ইত্যবসরে সেই বিরাট বিকটাকার দস্যু

আবার সেই গৃহমধ্যে সমুপস্থিত। ব্যস্ততা প্রযুক্ত আর কুঞ্জবালার শঙ্কা প্রযুক্ত অগ্রবনের প্রথম দর্শনে এই মূর্ত্তির ছবি অঙ্কিত করা হয় নাই। পাঠক মহাশয়! এই স্থান সেই করাল কাল পুরুষের আকৃতি অবগত হউন। কেননা, অনেকবার এই লোকের সহিত আপনার পরিচয় হইবে।

লোকটা বেঁটে, পরিমাণ ঊর্দ্ধসংখ্যা সার্দ্ধ দুই হস্তের অধিক হইবে না। যদি হইবে না, তবে বিরাট বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইতেছে কিজন্য? ভীমদর্শন বলিয়া?—ঊর্দ্ধমূর্ত্তি হইলেই বিরাট হয়, সকল স্থলে অভিধানে সে অর্থ বলিয়া দেয় না। লোকটা বেঁটে। গাঢ় নীলের সহিত তাম্র যোগ হইলে যেরূপ বিকটবর্ণ উৎপন্ন হয়, কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইলেও এই দস্যুর বর্ণও সেই প্রকার; গড়ন গাঁট গাঁট; শরীরের আয়তন মত হস্ত-পদ খর্ব্ব, উদর প্রকাণ্ড; বক্ষঃস্থলে ক্ষুদ্র কূপের ন্যায় এক গহ্বর—গহ্বরের উভয়পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোবর্দ্ধনের ন্যায় দুইটী ঢিবি, তাহার উপর কটা বর্ণের লোমপুঞ্জ বিকীর্ণ। গজস্কন্ধ,—পৃষ্ঠদেশ নিতান্ত কর্কশ চর্ম্মে আবৃত, মস্তক গোল, নাসিকা চেপ্‌টা, চক্ষু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিঙ্গল, একচক্ষে তারা আছে, দৃষ্টি নাই। পাতা ও ভ্রূতে পাত্‌লা পাত্‌লা দুই চারি গাছি চুল; দৃষ্টি ক্ষুধিত ব্যাঘ্র অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। কর্ণ ছোট ছোট; তা আবার বিলম্বিত পিঙ্গল কেশজালে সমাচ্ছন্ন; মস্তকের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড টাক; টাকের সহিত নাসাগ্র পর্য্যন্ত ললাটের অল্প-মাত্র প্রভেদ; ওষ্ঠদ্বয় স্ফীত, পরস্পর অসংলগ্ন; নিম্ন ওষ্ঠে তিনটা দাঁত অসম্ভব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বক্রভাবে বহির্গত;—

হস্তিদন্ত যেরূপ পার্শ্বে বহির্গত হয়, এ দন্ত সেরূপ দন্ত নহে; যাহারা বিকট দন্ত-বিবর দর্শন করিয়াছেন, তাহারাই এই লোকের ভীষণ দংষ্ট্রা অনুভব করিতে পারিবেন, চলন ঈষৎ বক্র; পরিধান নীলাম্বর; জানুদেশ পর্য্যন্ত নীল পায় জামা; বক্ষঃদেশ আদুড়; বাহু ও উরু অসম্ভব স্থূল; পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝাউ পুঞ্জের ন্যায় গুচ্ছ গুচ্ছ লোমাবলী; কপালে শৈশবকালে একটা কাটা দাগ; গোঁপ দাড়ী কিছুই নাই, নাম বিশ্বেশ্বর তেওয়ারি বয়স অনুমান চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ বৎসর।

বিশ্বেশ্বর গৃহপ্রবেশ করিয়া বুড়ীরে এক ধাক্কা দিয়া স্বভাব-সিদ্ধ বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া কি বলিল, বাক্যের জড়তা-প্রযুক্ত স্পষ্ট বোঝা গেল না। ভীষণ জলদগর্জ্জনে দ্বার গবাক্ষ-বদ্ধ গৃহ যেমন কাঁপিয়া উঠে, ঘন ঘন গৃহমধ্যে যেমন প্রতি-ধ্বনি হয়, সেই দৈত্যগর্জ্জনে কুঞ্জবালার শয়নগৃহও সেইরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। ধাক্কার আঘাতে বৃদ্ধা থরহরি কম্পে ভূশায়িনী। বিশ্বেশ্বর মল্লের ন্যায় তাল ঠুকিয়া অর্দ্ধচেতনা কুঞ্জবালারে সজোরে আকর্ষণপূর্ব্বক গৃহান্তরে লইয়া গেল।

চতুর্থ তরঙ্গ।

—–*—–

উদ্ধার।

রজনী প্রায় দ্বাদশ দণ্ড অতীত। কুঞ্জবালা অচেতন। দস্যুদল নিদ্রিত। দস্যুপল্লী নিস্তব্ধ। জগৎ ঘোর অন্ধকার নিস্তব্ধ,—গভীর নিস্তব্ধ। কুঞ্জবালার শয়নগৃহে সেই বৃদ্ধা উপস্থিত। ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, ধীরে ধীরে গাত্রস্পর্শপূর্ব্বক কুঞ্জবালার দেহলতা সঞ্চালিত করিল। আকিঞ্চন ও উদ্যম, সকল সময়, সকল স্থলে সমভাবে সফল হয় না। বৃদ্ধার আকিঞ্চনের বিপরীত ফল। বালিকা সভয়ে অস্ফুটস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। মুখপদ্মে শুষ্ক কর আচ্ছাদন করিয়া বৃদ্ধা তাহার কর্ণে মৃদুস্বরে কহিল! কুঞ্জবালা, ভয় নাই, আমি, আয় মা! আমি তোরে এই নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিব।

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া ভয়কম্পিতা বালিকা একটু সাহস পাইল। অল্পে অল্পে নেত্রপুত্তলী বিকাশ করিয়া আশ্বাসদায়িনীর মুখের দিকে একবার চাহিল। উজ্জ্বল আলোকে বর্ষিয়সীর উজ্জ্বলমূর্ত্তি দর্শনে বালিকার হৃদয় আনন্দ-রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। পাঠক মহাশয় মনে করিতে

পারেন, অন্ধকার রজনীতে, অন্ধকার দস্যুদুর্গের অন্ধকার গৃহে কুঞ্জবালা বন্দিনী, উজ্জ্বল আলোক কিরূপে সম্ভবিতে পারে। অসহায়া কুঞ্জবালার একমাত্র আশ্রয়ীভূতা বর্ষীয়সীই এই আলোক সংগ্রহের অনুষ্ঠানকারিণী। এই বুদ্ধিমতীর কৌশলসংগৃহীত অমূল্য মণিকিরণেই কুঞ্জবালার অন্ধকার কারাগৃহ আলোময়। কুঞ্জবালা সেই আলোকে বর্ষীয়সীর উজ্জ্বলমূর্ত্তি ঈষৎ উন্মীলিতনেত্রে দর্শন করিলেন। এই স্থলে এই দস্যু-দুর্গবাসিনী এই রমণী রত্নটীকে আপনাদের জানিয়া রাখা উচিত হইতেছে।

বৃদ্ধার আকার নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব, শরীরের গঠন কিছু কৃশ; বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, বদন প্রশান্ত, দৃষ্টি কোমল,, স্বর মিষ্ট, প্রকৃতি গম্ভীর, ভাব অতি মধুর, দেখিলে বোধ হয় হৃদয় যেন দয়ামায়া মাখা, যদিও হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কহিতেছে, তথাপি যেন কিছু আড় আছে; ভাবে বোধ হয় পশ্চিমদেশে ইহার জন্ম নয়, অনুমানে আইসে বঙ্গভূমিই ইহার জন্মভূমি। বয়শ অনুমান পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসর হইবে, নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, এই দয়াবতী রমণী ডাকাইতের আড্ডায় কেন আছে আমারা এখন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিলাম না।

কুঞ্জবালা কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কে মা তুমি? আশ্বাসদায়িনীর উপদেশের বশবর্ত্তিনী হইয়া আশ্বাসিতা কুঞ্জবালা সুমধুর উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কে মা তুমি?

চুপ্ কর। আশ্বাসদায়িনী সতর্ক করিয়া মৃদুস্বরে বাধা দিয়া কহিল, চুপ্ কর। এস মা চুপি চুপি ধীরি ধীরি আমার

সঙ্গে এস! আমি এখনি এই নরক-নিবাস হইতে তোমাকে উদ্ধার করিয়া দিতেছি!

এখনি? সাবধানে স্বর সঙ্কুচিত করিয়া কুঞ্জবালা জিজ্ঞাসা করিল, এখনি?

হা এখনি! এই রাত্রেই, এই যমপুরী হইতে নিক্রান্ত করিয়া দিব।

কিরূপে? কম্পিত অথচ কোমলকণ্ঠে কুঞ্জবালা জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপে?

তাহা তোমার জানিবার আবশ্যক নাই। অনুচ্চকণ্ঠে উদ্ধারকারিণী উত্তর দিল, সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। গাত্রোত্থান কর 'বিলম্ব করিও না, বিলম্বে বিপদ আশঙ্কা আছে।

কতক ভয়ে, কতক আশ্বাসে, কতক উৎসাহে কুঞ্জবালা গাত্রোত্থান করিল। বৃদ্ধার হস্ত ধারণ করিয়া নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে কারাগার হইতে বাহির হইয়া গেল। দস্যুদল অঘোর নিদ্রায় অচেতন, কেহ কিছু জানিতে পারিল না।

ক্রমে ক্রমে দস্যুদুর্গের চারিটী প্রকোষ্ঠ পার হইয়া উভয়ে পঞ্চম প্রকোষ্ঠে উপস্থিত, এইটী শেষ প্রকোষ্ঠ, এইখানে প্রহরীদল। গভীর নিশাকালে দুর্গমধ্যে কেহই প্রবেশ করিতে পারেনা, দুর্গ হইতে কেহ বাহিরেও যাইতে পারে না, এই বিশ্বাসে প্রহরীরা অকাতরে সুখনিদ্রায় অচেতন। দ্বারদেশে কুকুরেরা ইতস্তত: শয়ন করিয়া ঘুমাইতেছিল, মনুষ্যের পদশব্দে জাগিয়া উঠিল। দুর্গবাসীগণকে সজাগ করিবার নিমিত্ত শব্দ

করিবার উপক্রমেই বৃদ্ধা নীরব হইবার সঙ্কেত করিয়া দুইটী কুকুরের নাম ধরিয়া ডাকিল। দুর্গবাসিনীর পরিচিত স্বর শ্রবণে উহারা নীরব হইল, কেবল লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল মাত্র, আর কোন উৎপাত করিল না। কুঞ্জবালারে সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধা নিরাপদে দস্যুদুর্গ পার হইয়া মহারণ্যে উপস্থিত।

অরণ্য নিস্তব্ধ, পশুপক্ষী নিস্তব্ধ, প্রকৃতি সতী নিস্তব্ধ, জগৎ নিস্তব্ধ; বনস্থলী অন্ধকার। আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছে কি না, অনুভব হইতেছে না, নিবিড় পল্লবাবৃত বনস্থলী নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। পথ দেখা যাইতেছে না, পদে পদে পদস্খলন হইতেছে। পাদপগাত্রে মস্তক আহত হইয়া এক একবার গতি-রোধ হইতেছে। জীবনের এমনি মায়া, নিরাপদের এমনি আকর্ষণ কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই, বৃদ্ধারে সহায় করিয়া বালিকা সেই ঘোর অন্ধকারে দ্রুতপদে প্রধাবিতা। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধা একটী সঙ্কেতসূচক শব্দ করিবামাত্র সম্মুখে একটী মানবমূর্ত্তি দেখা দিল। মূর্ত্তিটী পুরুষ কি স্ত্রী, অন্ধকারে তাহা স্পষ্ট দেখা গেল না। আভাসে অনুমানে বোধ হইল, রমণীই হইবে। বিষ্ণুপ্রিয়া সেই রমণীকে উপদেশমত কার্য্য করিতে আদেশ প্রদান করিয়া কুঞ্জবালারে তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিল এবং কহিল, মা! তোমার কোন ভয় নাই, ইনি তোমার পথপ্রদর্শিকা হইয়া নিরাপদ করিবেন, নির্ভয়ে গমন কর। পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! বিষ্ণুপ্রিয়া পুনরায় দস্যুদুর্গে প্রবেশ করিল। কুঞ্জবালাও পথপ্রদর্শিকা রমণীর সহিত অরণ্যপথে ধীরে ধীরে পশ্চাৎবর্ত্তিনী।

উভয়ে নিস্তব্ধ, অন্ধকারে পথ দেখা যাইতেছে না; দুই দণ্ডের পথ চারি দণ্ডে অতিবাহিত। ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল, তরু-পল্লব ভেদ করিয়া চন্দ্রকিরণ অল্পে অল্পে দেখা দিতে লাগিল; কুঞ্জবালারে সঙ্গে লইয়া উদ্ধারকারিণী রমণী আশামত দ্রুতপদে অগ্রবর্ত্তিনী। অরণ্যের সীমা অতিক্রান্ত; সম্মুখে একটী প্রান্তর, প্রান্তর পার হইয়া উভয়ে একটী লোকালয়ে উপস্থিত। এখনও পর্য্যন্ত নিশানাথের সুবিমল স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ধরণী দেবীরে সুশীতল করিতেছে। গগনপ্রাঙ্গণে শুক্রতারা সমুদিত। বালার্করূপ সিন্দূরের ফোঁটা পরিয়া ঊষাদেবী পূর্ব্বাকাশে দেখা দিলেন, জগতের জীববৃন্দ এতক্ষণ সংসারের ধূলা খেলা বিস্মরণ হইয়া অঘোর নিদ্রায় অচেতন ছিল, দীপ্ দীপ্ করিয়া একে একে জাগিতে আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ ঊষার অবসান, প্রভাত সমাগত। ধীরে ধীরে অরুণসহচর সূর্য্যদেব পৃথিবীকে যেন স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দিলেন। ক্ষণকালের নিমিত্ত বিহঙ্গকুলের কলরব যেন সুদূরব্যাপী হইয়া পড়িল; নিস্তব্ধ জগৎসংসার পুনরায় জনকোলাহলে পরিপূর্ণ। কুঞ্জবালা দুর্গম বনপথ অতিক্রম করিয়া পথপ্রদর্শিকা রমণীর সহিত অবিরাম গতিতে ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। ভয় গিয়াছে তথাপি ভয় আছে, পাছে দুরাত্মা দস্যু-পিশাচ পশ্চাৎ দিক্ হইতে আসিয়া আক্রমণ করে। নিদ্রাভঙ্গে, শিকার পলাইয়াছে দেখিয়া পাছে সেই নৃশংস চণ্ডালেরা নৃশংসবেগে অনুসরণ করিয়া থাকে এই ভয়, এই ভয়েই নারীহৃদয় আকুল ব্যাকুল মহাসংশয়ে সমাকুল, সেইজন্যই গতির বিরাম নাই।

প্রভাতে যে লোকালয়ে তাহারা প্রবেশ করিয়াছিল, দ্রুতপদ-বাহনে সেই লোকালয় দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধক্রোশ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। সম্মুখে একটী চরভূমি। চর অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তিনী হইতেছে, বাধা পড়িল, গতি থামিল। পুরোভাগে প্রবল তরঙ্গ, প্রবল স্রোত প্রবাহিতা এক প্রবাহিনী স্রোতস্বতী; গগনে বেলা ছয় দণ্ড।

নদীতে তরণী নাই, অথচ উত্তীর্ণ হইতে হইবে, বিষম বিভ্রাট। বিমলা,—পথপ্রদর্শিকা বিমলা সশঙ্ক সজলনয়নে এক একবার পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিতেছে, দেখিতেছে, পশ্চাতে কেহ সঙ্গ লইয়াছে কি না, সহজেই ভয়, সহজেই পশ্চাদ্দৃষ্টি, কুঞ্জবালা তাহা দেখিতেছে না; চতুরা পথদর্শিকা তাহা তাহারে জানিতেও দিতেছে না। দৈব অনুকূলতাবশতঃ——কে জানে অনুকূল কি প্রতিকূল,—একখানি বাষ্পীয় তরণী তরঙ্গিণী বক্ষে ভাসিয়া আসিল।

পার করিয়া দিবে? বিমলা উচ্চৈঃস্বরে বার বার ডাক দিয়া কহিল, পার করিয়া দিবে? ধূমরাশি গর্জ্জনে,—বারি-তরঙ্গ আলোড়নে, প্রাচীনার ক্ষীণকণ্ঠস্বর তরণীবাহীদিগের শ্রবণে প্রবেশ করিল না। বাহু উত্তোলন করিয়া সঙ্কেতে আরও কিছু উচ্চকণ্ঠে বিমলা আবার ডাকিয়া কহিল, অসহায় নিরুপায় অবলা প্রাণের আশঙ্কা, উদ্ধার করিতে পার? তরণীর সারেং কিছু দয়ালু ছিল, তাঁহার দৃষ্টি সহসা তীরভূমে আকৃষ্ট হইল। দেখিল দুইটী স্ত্রীলোক তীরে দাঁড়াইয়া উত্তোরণ প্রার্থনা করিতেছে। তরণী তীরের দিকে ফিরাইল। জাহাজের

মালিম বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঝড় নাই, তুফান নাই; কোথায় লইয়া যাও? সারেং অঙ্গুলী-সঙ্কেতদ্বারা কূলভূমি প্রদর্শন করিল; মালিম সবিস্ময়ে নির্ব্বাক্।

তরণী তীরে লাগিল, সারেঙ্গের আহ্বানে পারপ্রার্থিনী কামিনীদ্বয় ভয়ে, সংশয়ে কম্পিত হইতে হইতে ত্রস্তপদে তরণীতে আরোহণ করিল। জাহাজে আরোহী কে কে? একটী পরম সুন্দর যুবা, রাজভূষণে সমলঙ্কৃত, বক্ষঃস্থলে সারি সারি ৮।১০টী স্বর্ণ-পদক, মস্তকে হীরকমণ্ডিত রাজকীরিট, কটিবন্ধে রজতমুষ্টি দীর্ঘ তরবারি। বদন প্রফুল্ল, মুখে যৌবন-চিহ্ন সুপ্রভাত শ্মশ্রুরাজির সম্পর্ক বিরহ; বয়স অনুমান অষ্টাদশ কি ঊনবিংশতি, পার্শ্বে একটী যুবতী, কমলার ন্যায় গৌরবর্ণা; রক্তাম্বর পরিধানা। মুখপদ্ম পদ্মফুলের ন্যায় ঢল্ ঢল্ করিতেছে। নেত্রযুগল ভ্রমরের ন্যায় সেই বদনসরোজে খেলা করিতেছে। শ্রবণপুটপার্শ্বে কৃষ্ণকুন্তল কুঞ্চিত হইয়া মৃদু বাতাসে অল্প অল্প দুলিতেছে। কর্ণমূলে দুইটী হীরার দুল, এক একবার প্রকাশিত, এক একবার অলকজালে সমাচ্ছাদিত হইতেছে। মুখে হাসি ধরে না; বয়স অনুমান ষোড়শ কি সপ্তদশের সীমাস্পর্শী। আরোহী আর কেহই না, কেবল এই দুটী।—তিনজন পাঞ্জাবী অনুচর নিয়মিত নির্দ্দিষ্টকার্য্যে শশব্যস্ত; পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় অটল অচঞ্চল। কুঞ্জবালার হস্ত ধারণ করিয়া বিমলা সেই অপরিচিত জাহাজে স্থির হইয়া বসিল। জাহাজ পূর্ব্বের ন্যায় দ্রুতগতিতে জল কাটিতে কাটিতে অভীষ্টপথে অগ্রসর।

পঞ্চম তরঙ্গ।

—(০)—

আমি কোথায় ?

কোথায় বা জাহাজ ; কোথায় বা বিমলা ; কোথায় বা মালিম্ ; কোথায় বা সারেং, কেহই কোথাও নাই। আমি কোথায় ? একটী প্রসাদে কুঞ্জবালা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আমি কোথায় ?

নদীতীরে একটী রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে মনোহর উপবন, মধ্যস্থলে রমণীয় সরোবর। সরোবরের সলিলসিক্ত সুস্নিগ্ধ পবন উপবনের কুসুমগন্ধ বহন করিয়া প্রাসাদের চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে। দক্ষিণ অলিন্দে একাকিনী কুঞ্জবালা দাঁড়াইয়া।

কুঞ্জবালা একবার চকিতনয়নে উদ্যানের চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিল। একবার প্রস্ফুটিত পদ্মসদৃশ সজল-নয়ন আপন অঙ্গযষ্টিতে সঞ্চালন করিয়া, ভয়কম্পিতকণ্ঠে আপনা আপনি বলিয়া উঠিল, কে কোথায় ? যাহাদের সঙ্গে আসিলাম, তাহারাই বা কোথায় গেল ? বাষ্পপোতে যে রাজকুমার ও রাজকুমারী দর্শন করিয়াছিলাম, তাঁহারাই বা কোথায় ? এই মনোহরা রাজপুরীও আমারে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে। ওঃ !—আজীবন বান্ধবশূন্য হইয়া সংসারধামে বিচরণ করাই

কি আমার ভাগ্য-লিপি! সেইজন্যই কি এই রাজপুরী আমার নেত্রে অন্ধকার!

কুঞ্জবালা এইরূপে বিলাপ করিতেছে, ইত্যবসরে সেই তরণীস্থিতা রাজকুমারী—কে জানে, রাজকুমারী কি না—লোক-ললামভূতা সুন্দরী যুবতী সহাস্যবদনে সম্মুখে উপস্থিত। পাণিপদ্মে কুঞ্জবালার পাণিপদ্ম স্পর্শ করিয়া হাস্যমুখী কহিলেন, ভগ্নি! তোমার কোন ভয় নাই, তুমি সচ্ছন্দে এইস্থলে অবস্থান কর। যতদিন তোমার চিত্ত সুস্থির না হয়, ততদিন আমি তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব না। এখানে তোমার কোনিরূপ ক্লেশের সম্ভাবনা নাই। কুঞ্জবালা একটীও কথা কহিল না, এক পদও অগ্রসর হইল না—আশ্বাসদায়িনী মধুর-ভাষিণীর মুখের দিকে একবার তাকাইলও না, পাষাণপ্রতিমার ন্যায়, নিশ্চল, নীরব, নিরুত্তর। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব পশ্চিম আকাশে বিলীন হইলেন। বিহঙ্গমগণ কলরব করিয়া স্ব স্ব আবাসমুখে প্রধাবিত হইল। ক্রমশঃ সন্ধ্যা সমাগত।

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

বিষম বিভ্রাট।

একদিন কুঞ্জবালা অলিন্দে দাঁড়াইয়া আপন মনে কহিল, "আমি কে?" পাঠক মহাশয়! অনাথিনী কুঞ্জবালা এখন

যাহা যাহা বলিবে, যে যে কার্য্য করিবে, যেরূপে যখন যেখানে সৌভাগ্যবতী অথবা দুর্ভাগ্যবতী থাকিবে, তাহাই আমাদের লক্ষ্য।

"আমি কে?" একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বালিকা আপনা আপনি কহিল, আমি কে? কোথায় কাহার আবাসে আমি আছি, কে আমারে এখানে এনে দিলে, যুবতী সুন্দরীই বা কে? রাজকন্যা কি দেবকন্যা? তাহা ত কিছুই জানি না; কেন তিনি আমারে ভালবাসেন, তাহাও ত বলিতে পারি না। যে যুবাপুরুষ কলের জাহাজে ছিলেন, তিনি কে? এখন তিনি কোথায়? চক্ষে একটীবার দেখিতেও পাই না। কেবল প্রাণ-পণে এই সুন্দরী যুবতীর মন যোগাই। তিনি ভালবাসেন; কেন ভালবাসেন, যিনি ভিখারিণী কোরে জগতে পাঠায়েছেন, সেই বিধাতাই জানেন।

আমার শয়নের জন্য যে ঘরটী নির্দ্দিষ্ট ছিল, একাকিনী নিশাকালে সেই ঘরে শুয়ে শুয়ে অদৃষ্টের ভাবনা ভাবি আর থাকি। দিবাভাগে আশ্রয়দায়িনীর কাজকর্ম্ম করি। তিনি আমায় সহচরী বলেন, কখনও বা ভগ্নী বোলে আদর করেন। সঙ্গে কোরে উপবনে বেড়াতে নিয়ে যান, সঙ্গে কোরে সরো-বরে জলকেলি করেন, পুষ্পকুঞ্জে ফুল তুলে, আমার গলায় মালা গেঁথে দেন, আমিও দিই। বাহিরে দেখ্‌তে শুন্‌তে যেন কোন অসুখ বিসুখ নেই; কিন্তু আমার মনে মনে যে কি বিষানল জ্বলে,—কি কালানল জ্বলে জ্বলে উঠে, সুখের সংসারে কে তা দেখ্‌তে পায়? যুবতী ভালবাসেন এই সুখ, তা ছাড়া যখন

আমি একাকিনী হই, তখন যে আমি—সেই আমি, যে অভাগিনী, সেই অভাগিনী। কোথায় কাহার গর্ভে জন্মেছি, জননী কে, জনক কে, জন্মভূমে তাঁরা বেঁচে আছেন কি না, কিছুই ত জানি না। যদি থাকেন, এ জন্মে আর সে পাদপদ্ম দেখ্‌তে পাব, সে আশাও মনের মধ্যে ধারণা হয় না।

এক রাত্রে আপন নির্দ্দিষ্ট শয়নঘরে চুপ্‌টী ক'রে শুয়ে আছি, ঘুম হ'চ্ছে না, তরঙ্গে তরঙ্গে কতই দুঃখতরঙ্গ হৃদিসমুদ্রে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে, স্থির ক'ত্তে পাচ্চি না। নিশা দুই প্রহর, হঠাৎ কে যেন আমার দরজায় ধাক্কা মাল্লে। ঘরে আলো নাই, অন্ধকারে চোখ বুজে থেকে থেকে যে একটু তন্দ্রা এসেছিল, মরীচহীন কর্পূরের মত সেটুকু ত উবে গেল। বালিস থেকে মাথা উঁচু ক'রে কাণপেতে শুয়ে আছি, একটু পরে আবার সেই শব্দ; মনে সন্দেহ হ'ল, এত রাত্রে আমার ঘরের দরজায় ধাক্কা মারে কে? একবার মনে ক'র্‌লেম, আমার আশ্রয়দায়িনী রাজকুমারী আমাকে কোন কথা বল্‌বার জন্যে এসে থাক্‌বেন, উঠ্‌লেম;—দরজা খুলে বারাণ্ডায় বেরুলেম, কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। ফিরে আস্‌ছি, দেখি, দক্ষিণের বারাণ্ডায় সহসা যেন বিদ্যুৎ নল্লে গেল। একজন পুরুষ মণিরত্নভূষণে বিভূষিত হ'য়ে এক ঘরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। কে সে পুরুষ? কোথায় যান্? এত গভীর রাত্রে বাইরেই বা কি জন্য? আড়ালেই বা লুকান্ কেন? নূতন দেখা—এসে অবধি কোনদিন কোন রাত্রেই এমন ব্যাপার আমি দেখি নাই। বড় কৌতূহল জন্মাল, ক্রুতপদে দরজা অর্দ্ধাবৃত কোরে ঘরের

ভিতর পাশ্ কাটিয়ে দাঁড়ালেম। সেই মূর্ত্তি আমার ঘরের দরজার সম্মুখ দিয়ে নিঃশব্দে পশ্চিমদিকে চ'লে গেলেন। প্রায় ২০ মিনিট আমি আর কোন সাড়াশব্দ পেলাম না; বেরুলেমও না। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকিমেরে দেখ্লেম, আশ্রয়দায়িনীর অবরুদ্ধদ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হ'ল। বিদ্যুৎ-পুরুষ গৃহমধ্যে আশু প্রবিষ্ট, নিঃশব্দে গৃহদ্বার অবরুদ্ধ।

ভাব্লেম একি? বাষ্পতরিতে যে সমুজ্জলমূর্ত্তি আমার সভয়নেত্রে প্রতিফলিত হ'য়েছিল, এ ত সে মূর্ত্তি নয়? এখানে এসে পর্য্যন্ত সে সুকুমার মূর্ত্তি ত একটী দিনও আমার নয়ন-সমক্ষে সমুপস্থিত হয় নাই। তবে কে এ? আর যাঁরে আমি দেবকন্যা ব'লে পূজা ক'রে থাকি, তাঁরই কি এই ব্যবহার? তবে কি এই পবিত্রাকুমারী জগৎঘৃণিত দুঃশীলপ্রেমে কলঙ্কিনী? না, কখনই ত সম্ভব নয়, এমন পবিত্রা প্রতিমা কি কখন এমন কলঙ্কে কলঙ্কিত হতে পারে? কখনই ত সম্ভব বোধ হয় না। তবে কে এ? তত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাব্লেম, অনেক্ষণ দেখ্লেম, আর কোন সাড়া-শব্দ পেলাম না। চিন্তায় চিন্তায়, উদ্বেগে উদ্বেগে, কৌতূহলে কৌতূহলে, আরও প্রায় দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাক্লেম; উচ্চবাচ্য নাই। দরজা বন্ধ ক'র্লেম। ঘুম ত নাই, শুয়ে আর ফল কি? আর শয়ন ক'র্লাম না। চঞ্চলা নিশি সাঁ সাঁ ক'রে পুইয়ে গেল। আশ্রয়দায়িনী সুন্দরীর গৃহদ্বার তখনও পর্য্যন্ত সমভাবে অবরুদ্ধ। মনে ক'র্লেম রোজ রোজ অন্যমনস্ক থাকি, কে কখন কোথা দিয়ে আসে, কোথা দিয়ে যায়, কোথায়

কি রকম কাণ্ড কারখানা হয় ভ্রূক্ষেপ থাকে না। আজ এরে ধোরবোই ধ'র্ব্বো। এই সংকল্পে প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা। প্রভাত হ'য়ে গেল; অভ্যাসমত খানিকক্ষণ বারাণ্ডায় বেড়ালেম, কোন দিকে কিছুই অস্পৃশ পেলেম না। তবে ইনি কে? যে মূর্ত্তি আমার হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত, চিত্রপটের ন্যায় অঙ্কিত র'য়েছে, যাঁরে আমি একটীবার চক্ষে দেখ্‌বার জন্যে লালায়িত, কৈ, তাঁকে ত দেখ্‌তে পাই না; এক মুহূর্ত্ত-একপলের জন্যেও পাই না! ঘুমে নয়,—স্বপ্নে নয়,—নিশাযোগে জাগ্রত অবস্থায় যাঁরে আমি বিদ্যুতের মত দর্শন ক'র্‌লেম, তাঁকেও আর ভাল ক'রে দেখ্‌তে পেলেম না, কিছুই জান্তে পা'র্‌লেম না। আবার ঘরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে শয়ন ক'র্‌লেম।

সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নাই, যেমন শুয়েছি, অমনি একটু তন্দ্রা এলো। রাত্রের ঘটনাগুলি স্বপ্নবৎ বোধ হ'তে লাগ্‌ল,—ক্ষণেক পরে চেয়ে দেখি, জানালা দরজার ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের আলো ঘরে প্রবেশ ক'রেছে। ত্রস্ত ব্যস্তে উঠে দরজা খুল্লেম;—বেলা অনেক হ'য়েছে;—আশ্রয়দায়িনীর ঘরে গিয়ে দেখি, কেউ নাই। তিনি কোথায়? রাত্রিকালে যে পুরুষ সেই কুমারীর ঘরে প্রবেশ ক'রেছিল, সেই বা কোথায়? প্রাসাদে দাসদাসী প্রহরী প্রতিহারী যারা ছিল, তারাই বা কোথায়? কোন দিকে কাহাকেও দেখ্‌তে না পেয়ে, সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেম, কেউ নাই, পুরী শূন্যময়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি, এক একবার পথের দিকে চেয়ে দেখ্‌চি! কতলোক রকমারিস্বরে রকমারি জিনিসের ফিরি

ক'চ্চে। কতলোক কতদিকে আপন আপন কাজে চ'লে যাচ্চে, কে তার সংখ্যা করে, পথ লোকে লোকারণ্য। হঠাৎ দেখি সম্মুখে ভীষণ দৃশ্য! সেই কালান্তক দস্যুদলপতি বিশ্বেশ্বর উপস্থিত। দেখেই ত প্রাণ উড়ে গেল! মনে যে কি ভাব হ'ল, কি ব'ল্‌ব! তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ ক'ল্লেম। সদর দরজায় জোরে তিন চার্‌বার আঘাত হ'লো। ভয়ে গা কেঁপে উঠ্‌লো। ভাব্‌লেম, দরজা ভেঙ্গে যদি প্রবেশ করে, তাহ'লে কি হবে? নির্ব্বান্ধব শূন্যপুরী, কে আমায় রক্ষা ক'র্‌বে? এ বাড়ীতে আমি আছি, যখন এরা জান্তে পেরেছে, তখন আমায় ধ'র্ব্বেই ধ'র্ব্বে, কিছুতেই পরিত্রাণ থাক্‌বে না। অতএব এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াই মঙ্গল। এই বিবেচনায় প্রাসাদের সুখভোগ পরিহার ক'রে গুপ্ত দরজা দিয়ে দ্রুতপদে বাহির হ'লেম। সবেমাত্র দরজা পার হ'য়েছি, একজন লোক পিছন দিক্ থেকে কাপড় দিয়ে আমার মুখ বেঁধে ফেল্লে। পাশেরদিকে চেয়ে দেখি, আর এক জন লোক, লোকটা অপর কেউ নয়,—দস্যুদলপতি বিশ্বেশ্বরের প্রিয়সহচর ফেরিঙ্গী, দেখেই ত আমার আত্মাপুরুষ উড়ে গেল। চারিদিক্ অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। পিছনের লোকটা সেই কাপড় দিয়ে চোক্ দুটাও বেঁধে ফেল্লে! আমি তখন অচল, অস্পন্দ, জ্ঞানচৈতন্য নাই ব'ল্‌লেও হয়। বাড়ীর পিছনে একটী গলিপথ, দুজন ডাকাত আমার দুহাত ধোরে টেনে হিচ্‌ড়ে সেই পথে নিয়ে গিয়ে একখানা গাড়ীর ভিতর তুলে, দরজা বন্ধ ক'রে দিলে; গাড়ি-ওয়ালা দ্রুতগতিতে চ'ল্‌তে লাগ্‌ল।

অনেকক্ষণ পরে একবার একটু জ্ঞান চৈতন্য হ'য়েছিল। ডাকাইতেরা তখন আমার মুখচোকের বাঁধন খুলে দিয়েছে। ভয়ে ভয়ে, আস্তে আস্তে একবার চেয়ে দেখ্‌লেম;—ভীষণ দৃশ্য! যমের মত চারজন অস্ত্রধারী ডাকাত গাড়ীর ভিতর ব'সে র'য়েছে। একজন একটা পিস্তলের অগ্রভাগ আমার কপালের কাছে হেলিয়ে ধ'রে, কট্‌মট্‌ ক'রে চেয়ে ধমক্‌ দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো; চুপটী ক'রে প'ড়ে থাক্‌, যদি গোল ক'র্ব্বি, পালাবার চেষ্টা ক'র্ব্বি, এই পিস্তলের বাড়ি মেরে তোর্‌ মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। স্বর শুনেই প্রাণ উড়ে গেল। আর আমি তাদের দিকে চাইতে পা'র্‌লেম না। চোখবুজে গাড়ীর পাপোশের উপরেই প'ড়ে থাক্‌লেম। ডাকাইতেরা মাঝে মাঝে গাড়ি বদল ক'র্‌লে, আড্ডা বদল ক'র্‌লে। আমাকেও দু এক জায়গায় উঠ্‌তে নাম্‌তে হ'ল, তখনও বেলা আছে, কিন্তু লোকালয় দেখ্‌তে পেলেম না, চারিদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রান্তর পার হ'য়ে গাড়িখানা একটী অরণ্যপথে প্রবেশ ক'র্‌লে, বেলাটুকুও দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফুরিয়ে গেল। ক্রমে অন্ধকার,—ঘোর অন্ধকার। খানিকদূর গিয়ে গাড়িখানির গতি থাম্‌ল, ডাকাতেরা সেইখানে আমাকে নাম্‌তে ব'ল্‌লে, আমি নাম্‌লেম। চেয়ে দেখি একটী পাহাড়।

সপ্তম তরঙ্গ।

বিন্ধ্যাচল—সখিসম্মিলন।

গাড়ি থেকে যখন নাম্‌লেম, তখন রাত্রি প্রায় চার দণ্ড। আকাশ বেশ পরিষ্কার, চন্দ্রোদয় হ'য়েছে জ্যোৎস্নার আলোকে দেখ্‌লেম সম্মুখে এক পাহাড়। পাহাড়ে নানারঙ্গের লোক যা'চ্চে আস্‌চে। নানারকম কলরব হ'চ্চে; ব্রাহ্মণ, দণ্ডী, পাণ্ডা, সন্ন্যাসী, নাম্‌চে আর উঠ্‌চে, ছোট ছোট কুটীর বেঁধে ঠাকুরের সেবাইতেরা গৃহাশ্রমের ন্যায় অবস্থান ক'চ্চে।

এ কোথাকার কোন্ পাহাড়? ঠিক্ বুঝ্‌তে পা'র্‌লেম না, কিন্তু আমার পূর্ব্বস্মৃতি যেন বলেদিলে,—মির্জাপুরের বিন্ধ্যাচল। যেখানে বিশ্বেশ্বর বীরভদ্র বিরাজিত, এ সেই বিন্ধ্যাচল। মেঘোপম গিরিদৃশ্য সম্মুখে বিরাজমান। গিরিতরু, গিরিলতা স্বভাবের শোভা সমভাবেই সুবিস্তার ক'চ্চে। যেন একটী নীল মেঘ চপলা-সমাগমে দিগে দিগে নীল দীপ্তি সুবিকাশ ক'চ্চে। দূরে দূরে গিরিগাত্রে দামিনীপ্রভ মণিমাণিক জ্বল্‌ছে। ফণিগণ মণি মাথায় ক'রে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ ক'র্‌ছে। চন্দ্রপ্রভা পর্ব্বতপ্রভাকে আরও প্রভাসিত ক'রে অহঙ্কারে দ্বিগুণ ত্রিগুণ দীপ্তি বিকাশ ক'চ্চে। গিরিগাত্র জ্বল্‌ছে। ডাকাইতেরা

আমায় সেই পর্ব্বতের উপর একটী মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গেল। সম্মুখে করালবদনা কালিকা। পাঁচ সাত হাত অন্তরে নৃশংস রাক্ষস বিশ্বেশ্বর তরবারি হস্তে হাঁটু পেতে ব'সে আছে। এত যে বিপদ, তবু যেন একটু সাহস পেলেম; অষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে, জানু পেতে ব'সে, স্তুতিবাক্যে ব'ল্লেম, মা! করালবদনা কালভয়বারিণি, বিপদনাশিনী রক্ষাকালি! এই বিপদে আমায় রক্ষা কর। যে বিপদ আমারে বারম্বার বিভীবিকা প্রদর্শন ক'র্‌ছে, সে বিপদ্ থেকে আমায় উদ্ধার কর। ব'ল্‌লেম, অভয় পেলেম না, উদ্ধার পেলেম না, যাঁর চরণে নিবেদন ক'র্‌লেম, অভয়া তিনি, তথাপি সেই অভয়া অভয় প্রদান ক'র্‌লেন না। ঘুমিয়ে প'ড়্‌লাম। বিন্ধ্যাচল শিখরে সেই দেবী-মন্দিরেই ঘুমিয়ে প'ড়্‌লেম।

একটু পরে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখ্‌লেম, বিকট মুখভঙ্গী ক'রে নৃশংস রাক্ষস বিশ্বেশ্বর আমার কাছে ব'সে আছে; কথা কইতে পা'র্‌লেম না, কিন্তু একদৃষ্টে অনেক-ক্ষণ তারে আমি নিরীক্ষণ ক'র্‌লেম লোকটার আকার যেমন ভয়ঙ্কর,—স্বভাব তেমন নিষ্ঠুর কি না, সে পরিচয় আমার ঠিক্ ঠিক্ পাওয়া হয় নাই। বার বার আমারে হেথা সেথা ক'রে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে, উদ্দেশ্য কি? অভিপ্রায় কি? বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি না। কয়েদ ক'রে রাখে, অথচ পাহারা দেয় না, খুলেও রাখে, অথচ আপনারা অসাবধানে অচেতন হ'য়ে পড়ে। মেরে ফেল্‌বার হ'লে, আন্তরিক কোন প্রকার আক্রোশ থাক্‌লে এতদিন অবশ্যই মেরে ফেল্‌ত, সে অভিপ্রায় নয়। এদের

ব্যবসা সে রকমের নয়; এম্নি ক'রে পথিক লোকদের ধ'রে ধ'রে আট্‌কে রেখে, কৌশলে জোর ক'রে টাকা আদায় করে। যাদের টাকা আছে, কিম্বা উদ্ধার ক'র্‌বার লোক আছে, তারা পরিত্রাণ পায়, আমার মত হতভাগিনীদের যদি এরা ধরে, এ জন্মে আর উদ্ধার হয় না। পালিয়ে যাওয়া? সে ত মিথ্যা উপায়। পালিয়ে যাওয়াই অসম্ভব; যদিও দৈব অনুকূল হ'য়ে এক আধবার বাঁচিয়ে দেন, তাতেও এরা ক্ষান্ত হয় না; সন্ধান ক'রে ক'রে যেখানে পায়, সেইখানেই ধরে। যম যদি উদ্ধার করেন, তবেই এক উপায় হয়, তা ছাড়া অপর উপায় পৃথিবীতে আর কিছুই নাই।

যা থাকে কপালে। একবার এই লোকটীকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি, কেনই বা ধ'রেছে; কেনই বা বার বার কষ্ট দেয়। কেনই বা জন্মশোধ নিপাত করে না। সাহসে একটু ভর ক'র্‌লেম, মনে মনে করুণাময় পরমেশ্বরকে স্মরণ ক'র্‌লেম, কালীমায়ীকে প্রণাম ক'র্‌লেম, সাহস আর একটু বেশী হ'ল; করুণস্বরে কাতরবাক্যে সমীপবর্ত্তী নির্ব্বাক্‌ দস্যুকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, "বাপু! তোমরা কে? তোমরা যে ঠাঁই ঠাঁই দলবদ্ধ হ'য়ে বেড়াও, দলবদ্ধ হ'য়ে থাক, অসহায় পথিকলোককে ধর, কয়েদ কর, যন্ত্রণা দাও, তোমাদের মতলব কি? সঙ্গে অর্থ থাক্‌লে চোর ডাকাতের লোভ হয়। আমায় যে তোমরা ধ'রেছ, আমার কি আছে? আমি চির-অভাগিনী, জগতে সকল জীবেরই মাতা পিতা থাকে, আমার মাতা পিতা আছেন কি না, তা পর্য্যন্ত আমি জানি না। সংসারে আমারে

আমার ব'ল্‌বার কেউ নাই; আমারে তোম্‌রা কেন ধ'রেছ? রাহু চন্দ্র-সূর্য্যকে গ্রাস করে, কেননা তাদের গতি আছে, পাষাণকে ত গ্রাস করে না? তোমরা এ পাষাণীকে গ্রাস ক'র্‌তে চাও কেন? ছেড়ে দাও; যদিন বাঁচি, স্বাধীনসংসারে হাহাকার ক'রে বেড়াই! যদি একান্তই না ছাড়, মেরে ফেল, এই পাহাড় থেকে ফেলে দাও, গলা টিপে মেরে ফেল, জ্বলন্ত আগুণে দগ্ধ কর, না হয় ত তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেল। যন্ত্রণা আর দিও না। যদি আর কোন কুমতলব থাকে, সুসিদ্ধ হবে না,—কখনই না। কখনই না!! অবলা হ'লেও আমার জ্ঞান আছে, সতীত্ব প্রাণের চেয়েও বড় ধর্ম্ম, আত্মঘাতিনী হওয়া অধর্ম্ম,—কিন্তু যেখানে জগতের সেই সারধর্ম্ম সঙ্কটে পড়ে, সেখানে জীবনকে অতি তুচ্ছ বোলেই জ্ঞান হয়। অবলা হ'লেও সেটী আমার বেশ জানা আছে। প্রাণের বদলে ধর্ম্মকে রক্ষা ক'র্‌তে কখনই আমি কাতর হব না। অন্য অভিসন্ধি যদি তোমাদের থাকে বল, তোমাদের মতলব কি?

নির্ব্বাক্ দস্যু একটী কথারও উত্তর ক'র্লে না; কেবল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কুটিল কটাক্ষপাত ক'রে দু একবার মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভাব্‌লেম প্রকৃতি যাদের ভীষণ, তাদের কাছে মিনতি বিফল। যে সকল যাত্রীলোক এই বিন্ধ্যাচলে ত্রিকোণ মণ্ডল দর্শন ক'ত্তে আসে, একবার প্রাণপণে দৌড়ে গিয়ে, তাদের দলে মিশে যাব।

ভাব্‌চি, অকস্মাৎ পাঁচটা ভয়ানক কদাকারমূর্ত্তি নয়নসমক্ষে

উপস্থিত। অধরপ্রান্তে দর দর রুধিরধারা, গলায় আনাভি-লম্বিত নরমুণ্ডমালা, মস্তকে জটা, হস্তে নরকপাল, কটিদেশ পশুচর্ম্মে আবৃত, মূর্ত্তি বিভীষণ। তারা হুহুঙ্কার গর্জ্জনে আমার চেতনা হরণ ক'র্‌লে। যা ছিলেম, তাই হ'লেম। আবার সভয়ে অচেতন। কতক্ষণ অচেতন ছিলেম, মনে হয় না। যখন মূর্চ্ছা ভঙ্গ হ'ল, তখন দেখি, সে পাহাড়ে আমি নাই। কোথায় বিন্ধ্যাচল, কোথায় দেবীমূর্ত্তি, কোথায় যাত্রীদল আর কোথায় বা আমি! একি ইন্দ্রজাল?—সকলই যেন আমার পক্ষে ইন্দ্রজাল ব'লে বোধ হ'ল।

আমি একটা ভগ্ন মন্দিরে শুয়ে আছি, বিশ্বেশ্বর নিকটে নাই, সেই সকল বিকটমূর্ত্তি নিকটে নাই, কোন বিভীষিকাও সম্মুখে উপস্থিত নাই, শুধু আমি একাকিনী। তবে ত পলাইবার উত্তম সুবিধা,—উঠে ব'স্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লেম, ভাল ক'রে চারি-দিক্ চেয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লেম, দুই চেষ্টাই বিফল হ'ল। নেত্রপল্লব অত্যন্ত ভারি, সর্ব্বশরীর প্রকাণ্ড পাষাণের মত ভারি; অথচ দেহের কোন স্থানে কোন বন্ধন নাই। উঠ্‌তে পার্‌লেম না! নিঃশব্দে অলক্ষিতে নেত্রযুগল অশ্রুপ্রবাহে দৃষ্টিহীন।

প্রায় দুই দণ্ড অতীত। কিছু পূর্ব্বে শরীর তত ভারি ছিল, এখন আর ভারি বোধ হয় না। শুনেছি, বিষ খেলে সর্ব্বাঙ্গ ভারি হয়, বিষাক্ত মাদকপ্রভাবে সর্ব্বাঙ্গ ভারি হয়। বোধ হয়, তাই কিছু আমার হ'য়েছিল, ডাকাইতেরা হয় ত তাই কিছু আমারে খাইয়ে থাক্‌বে; তা না হ'লে সে রকম অজানিত স্থানে একা

ফেলে চ'লে যাবে কেন? বিষ না,—বিষ খেলে বাঁচ্ব কেন? হ'লে হ'ত ভাল, কিন্তু বিষ না। দুরাত্মারা কোন প্রকার মাদকবলেই আমার উত্থানশক্তি রহিত ক'রে থাকবে। এখানে আমায় কে আন্লে? সে ভগ্নমন্দির কোথায় গেল? এত দেখ্ছি একখানি পর্ণকুটীর। পরিষ্কার কুসুমশয্যা, পুষ্পগন্ধে কুটীর আমোদিত, এখানে আমায় কে আন্লে? তারাই এনেছে। তারা না হ'লে এত খেলা কে খেলে! না,—তারা না, তারা হ'লে কেউ না কেউ নিকটে উপস্থিত থাকৃত। কেউ ত কোথাও নাই। কেবল বাতাসের সঙ্গে পুষ্পগন্ধ নাসা-পথে প্রবেশ ক'চ্চে। পবনদেব মৃদুসঞ্চারণে কুটীর মধ্যে বেশ খেলা ক'চ্চেন। আর ত কেউ নাই। শুনেছিলেম, পবন বড় দয়ালু, কিন্তু হা বায়ুদেব! এই কি তোমার দয়া? দুঃখিনী অনাথিনী দস্যু-কুহকে মহাবিপদে নিপতিতা; তার এই অবস্থা দেখে তোমার এত নৃত্য, এত আনন্দ!—এই আনন্দ কি তোমার ভাল দেখায়? এ আনন্দ কিসের? পরের নিরানন্দে যাদের আনন্দ হয়, মানুষ হ'লে লোকে তাকে নিদারুণ হিংস্র ব'লে ঘৃণা করে। তুমি দেবতা; মানুষে তোমায় ঘৃণা ক'র্তে পারে না, কিন্তু প্রভঞ্জন! এই কি তোমার বিশ্ব প্রসিদ্ধ দয়ার পরিচয়? যে বলে বলুক, আমি তোমারে দয়ালু বলি না। অপার অতল জলনিধি ধীর প্রশান্তভাবে প্রকৃতির শোভা বৃদ্ধি করেন, তুমি চঞ্চলরূপ ধারণ ক'রে উড়ে এসে জুড়ে ব'সে সে শোভা নষ্ট কর। জলধি-বক্ষে, তরণী-বক্ষে কত নর নারী, বালক বালিকা ভেসে ভেসে যায়, মহাবলে তুমি তাদের বিশ্ব-

খেলা ভুলিয়ে দিয়ে অতল জলে ডুবিয়ে মার। প্রফুল্ল পুষ্প-কুঞ্জে মধুকরেরা সানন্দে গুন্ গুন্ স্বরে প্রস্ফুটিত প্রফুল্ল পুষ্পে মধুপান ক'র্‌তে যায়, তুমি নির্লজ্জ, ঘোর দুরন্তবেশে তাদের বঞ্চনা ক'রে সেই ছোট ছোট ফুলগুলিকে কাঁপিয়ে দাও। জীব কল্যাণকর ফলভার-বাহী নব-পল্লবিত তরুরাজি সুখে দাঁড়াইয়া থাকে, তুমি হিংস্র, প্রবলাঘাতে সফল সপুষ্প এককালে তাদের ভূশায়ী ক'রে ফেল। প্রাসাদে, অট্টালিকায়, গৃহস্থ-গৃহে, দরিদ্র-কুটীরে—যার যেমন অবস্থা, তেম্নি ক'রে সুখে দুঃখে আশ্রয় লয়, তুমি পরশ্রীকাতর—আশ্রমপীড়ক দারুণ আঘাতে তাদের আশ্রয় স্থানগুলি নষ্ট ক'রে দাও। আশ্রিতেরা তোমার নিষ্ঠুরতায় জীবনধনে বঞ্চিত হয়। তুমি দয়ালু? কে বলে তোমায় দয়ালু? আমি ত বলি, তোমার মত মহানিষ্ঠুর ত্রিসংসারে নাই। কাহারও অপকার করে না, কাননের নিরীহ পশুপক্ষী-করুণাপূর্ণ করুণাসাগরের স্বাধীন বিশ্বক্ষেত্রে নির্ব্বিরোধে সুখে বিচরণ করে, তুমি নিষ্ঠুর,—নিদারুণ আঘাতে তাদের জীবলীলা সম্বরণ করিয়ে দাও। সুখসঞ্চরণে জীবলোকে যারা অবিচ্ছেদে নিরবচ্ছিন্ন জীবনানন্দ বিতরণ করে, অকারণে তুমি তাদের জীবলীলার অবসান কর। সরোবরের প্রফুল্ল কমলিনী আকাশের সূর্য্যদেবকে দেখে দেখে হাসেন, মধুপবৃন্দকে প্রফুল্ল মুখে মধু দান ক'রে পরিতৃপ্ত করেন। তুমি হিংস্র, সে দাতব্য দেখ্‌তে পার না। সে সুখ আনন্দ সহ্য ক'র্‌তে পার না। শান্ত-সলিলে ঢেউ দিয়ে দিয়ে শান্তিবিধায়িনীর তৃপ্তিদায়িনী, সুহাসিনী পদ্মিনীরে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ছিন্ন ক'রে ফেল। তুমি

দয়ালু, এরূপ দয়া জীবধামে বিদ্যমান না থাকাই ভাল। জগৎ-পালক শস্যজীবী কৃষককুল আকাশে জলদোদয় সন্দর্শনে চাতক-পক্ষীর ন্যায় শস্যক্ষেত্রে বারিপ্রত্যাশা করে, তুমি এমনি দয়ালু, হুতাশনের ন্যায় ভীম-প্রতাপে সেই সজল মেঘমালাকে উড়িয়ে পুড়িয়ে উৎসন্ন কর। এমনি দয়ালু ব'লেই জননী জঠরে দেবরাজ পুরন্দর তোমারে উনপঞ্চাশ খণ্ডে খণ্ড খণ্ড ক'রে-ছিলেন; তবু তোমার সেই হিংস্রপ্রকৃতি গেল না! তবু তুমি নিষ্ঠুর প্রকৃতির সমাদর পরিত্যাগ ক'র্‌লে না? ধিক্ তোমারে! আবার তুমি এই অসহায় পর্ণ-কুটীরে আনন্দে নৃত্য ক'র্‌তে ক'র্‌তে একটী অনাথিনী অবলা বালিকার চিত্তভ্রম জন্মাতে এসেছ! ধিক্ তোমারে!

এরা কে? পার্শ্ব পরিবর্ত্তন ক'রে শিয়রের দিকে একবার চেয়ে দেখি, তিনটী হাস্যমুখী কামিনী। এরা কে? এ আবার কোন্ কুহক? মায়াধামে মায়াবিনী অনেক থাকে, একরূপ শতরূপে দেখায়, লোকে বলে, বাঙ্গালার কামিক্ষ্যা পুরীতে কামিনীরূপিণী ডাকিনীরা বাস করে, আমি কি তবে কামরূপে আসিয়াছি! নির্ণয় ক'র্‌তে পা'র্‌লেম না। মনে মনে ভাব্‌লেম, মনে মনে প্রশ্ন ক'র্‌লেম, এরা কে? এক একবার চেয়ে দেখি, এক একবার চক্ষু বুজিয়া থাকি, কামিনীরা একটীও কথা কন না, হাস্য করেন, হস্ত ভঙ্গী করেন, মস্তকের কুন্তলদাম দুলাইয়া দুলাইয়া আমার দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া কটাক্ষপাত করেন, একটীও কথা কন না।

কি চমৎকার রূপ! দেবকন্যা দেখি নাই, অপ্সরা দেখি

নাই, বিদ্যাধরী দেখি নাই, এরা বোধ হয় তাই হবেঁন! তা নইলে—মানবীতে কি,—মানবী ত অনেক দেখেছি,—মানবীতে কি এমন সুন্দর রূপলাবণ্য কখন সম্ভব হয়? নিশ্চয়ই এরা মায়াবিনী, যদি দেবকন্যা না হয়, তবে নিশ্চয়ই মায়াবিনী ডাকিনী। আমারে বিমোহিত ক'র্‌বার জন্যেই দুরন্ত ডাকাই-তেরা এদের এখানে পাঠিয়েছে, তা নইলে কথা কয়না কেন?

উঠে ব'স্‌লেম। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে একদৃষ্টে অনেক্ষণ তাদের মুখপানে তাকিয়ে থাক্‌লেম। আহা! কি চমৎকার রূপ! চক্ষে পলক আছে, অথচ বোধ হ'চ্চে যেন পলক প'ড়্‌ছে না; মুখে হাসি আছে, অথচ বোধ হ'চ্চে যেন হাস্‌চে না; থেকে থেকে অঙ্গভঙ্গী ক'র্‌ছে, অথচ বোধ হ'চ্চে যেন ন'ড়্‌ছে না; আহা কি চমৎকার রূপ! আমাদের দেশের মেয়েরা অলঙ্কার বড় ভালবাসে, এদের গায়ে অলঙ্কার নাই। দেখ্‌ছি কেবল নীলরঙ্গের তিনটী পেশোয়াজ, হাতে দুই দুই গাছি হীরার বালা, কাণে দুটী দুটী হীরার দুল, কণ্ঠে এক এক ছড়া মতির হার, মস্তকে এক একটী পুষ্প-সুশোভিত বিলম্বিত বেণী। আহা কি চমৎকার রূপ! চাই, চাই,—চাইতে পারি না;—পলক পড়ে পড়ে,—পড়ে না।

অনেকক্ষণ চেয়ে থাক্‌লেম। তারাও যত দেখে, আমিও তত দেখি, আমিও কিছু বলি না, তারাও কিছু বলে না; এ রকমে কতক্ষণ থাকা যায়? অন্তরে ভয় থাক্‌লেও;—ডাকিনী মায়া খেলা ক'র্‌লেও যেন কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার ইচ্ছা

হ'লো। জিজ্ঞাসা করি করি মনে ক'চ্ছি, কি ব'লেই বা কি জিজ্ঞাসা করি, ভাব্‌ছি; ভয়, বিস্ময় সমতরঙ্গে অন্তর মধ্যে ক্রীড়া ক'র্‌ছে। অকস্মাৎ-আবির্ভূতা কামিনীত্রয়ের মুখপানে বিস্ময়াকুললোচনে চেয়ে আছি, তারাও অনিমিষনেত্রে আমার মুখের দিকে চেয়ে র'য়েছে; আমি ভয় পেয়েছি, অকস্মাৎ আশ্চর্য্য ভাবের আবির্ভাব হ'য়েছে, তারাও যেন সেটুকু বুঝেছে, তাদের চোক মুখ দেখে, সেই ভাব আমি অনুভব ক'র্‌লেম। অন্তরের সংশয়ভাব থেকে কতকটা পরিত্রাণ পেলেম—অগ্রে আমাকে কথা কইতে হ'লনা। কামিনী তিনটীর মধ্যে যেটী কিঞ্চিৎ বয়োধিকা, ঘন ঘন সর্ব্বগাত্র সঞ্চালন ক'রে,—স্বাভাবিক ভঙ্গী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উঁচু হ'য়ে ব'সে, সেই কামিনীটী বক্রনয়নে, মৃদু হাসি হেসে, হঠাৎ আমার নাম ধ'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কুঞ্জবালা! ভয় পাচ্চ কি?"

সেই প্রকারের বক্র হাস্যে মুখ-চক্ষু ঘুরিয়ে দ্বিতীয়া কামিনী একটু ব্যঙ্গস্বরে বোলে উঠ্‌লো, "কেন, আমরা কি রাক্ষসী যে আমাদের দেখে——"

চঞ্চল-বিস্ফারিতনয়নে দ্বিতীয়ার মুখ নিরীক্ষণ ক'রে আরব্ধ বাক্যে বাধা দিয়ে, প্রথম ভাষিণী তৎক্ষণাৎ ব'ল্‌লে, "তোমারে কেহ শালিসী হ'তে ব'ল্‌ছে না, কুঞ্জবালা যদি আমাদের চিন্‌তে পেরে থাকে, নিজেই আমার কথার উত্তর দিবে।"

গম্ভীরবদনে তৃতীয়া কামিনী ব'ল্‌লে; "ঠিক কথাই ত বটে, কুঞ্জবালা ঘুমিয়ে নাই, চক্ষু বুজে নাই, এরা আমাদের

দিকে চেয়ে র'য়েছে। স্বচক্ষেই দেখ্‌তে পাচ্ছে, আমরা রাক্ষসী নই, পিশাচী নই, ডাইনী-ডাকিনী কিছুই নই, আমরা কুঞ্জবালার মত মানবী; চিন্‌তে পারুক্ আর নাই পারুক্, মানবী ছাড়া আমরা যে আর কিছুই নই, সেটা নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে পার্‌ছে, বুঝ্‌তে পেরেও তবু কেন ভয় পাচ্ছে, সেই কথাই কথা।"

নয়ন বিকম্পিত ক'রে প্রথমা বোল্লে, "সেই কথাই ত কথা, সেই কথাই ত আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি।" সঙ্গিনীদের লক্ষ্য ক'রে, এই পর্য্যন্ত ব'লে প্রশ্নকারিণী আমারে সম্বোধন ক'রে আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে "ভয় পাচ্ছ কি?"

রাক্ষসী নয়, পিশাচী নয়, ডাকিনী নয়, মানবী।' এ কথাটী ত শুন্‌লেম, মনে ক'রেছিলেম মায়া, শঙ্কা হ'য়েছিল এরা মায়াবিনী, এদের মুখের কথায় সে শঙ্কা মিথ্যা ব'লে বোধ হ'চ্ছে,—মিথ্যা কি সত্য আর কিছু বিশেষ প্রমাণ না পেলে, নিঃসংশয় হওয়া যায় না। জিজ্ঞাসা ক'রেছে, উত্তর চাই, কি উত্তর করি, চিন্তা ক'র্‌ছি। সত্য বলাই ভাল। সম্মুখে ভয়ের কারণ কিছু নাই, কিন্তু আমি ভয় পেয়েছি! যেরূপ সঙ্কটক্ষেত্রে, যেরূপ শঙ্কাক্ষেত্রে গ্রহদেবতারা আমারে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চেন, তাতে ক'রে দর্পণে আপনার মুখ আপনি দেখ্‌লেও ভয় হয়, আপনার পদশব্দ শুনেও শিউরে উঠি, আপ্‌নার মুখের কথা আপ্‌নার কর্ণে প্রবেশ ক'র্‌লেও গা কাঁপে, সম্মুখে একগাছি তৃণ দেখ্‌লেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়! সেই-জন্যই ভয় পেয়েছি। প্রশ্নকারিণীর প্রশ্নে অনেকক্ষণের পর ধীরে ধীরে উত্তর ক'র্‌লেম, 'পাচ্ছি।'

"কেন ?"

আমি অভাগিনী।

"তা ত বুঝ্‌লেম, আমাদের দেখে ভয় কেন ?"

তোমরা কে ?

"আন্দাজ কর না। অনেকক্ষণ ধ'রে দেখ্‌ছ, এখনও বেশ চেয়ে আছ, আন্দাজ করনা, আমরা কে।"

আমি অবাক্ হ'লেম। আন্দাজ ক'র্‌তে বলে, কিসের আন্দাজ ক'র্‌ব! ঘুমিয়েছিলেম, জেগেই দেখি, নূতন তিন মূর্ত্তি! কোথাকার মূর্ত্তি, কেন এসেছে, ডাকাতের দলের গুপ্তদূতী কি না, কিছুই আমি জানি না, আন্দাজে কি নূতন লোকের পরিচয় পাওয়া যায় ? কেমন যেন হতবুদ্ধি হ'য়ে কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, কি আন্দাজ ক'র্‌ব ?

যে রমণী আন্দাজ ক'র্‌তে অনুরোধ ক'রেছিল, সউচ্চহাস্য ক'রে করতালি দিয়ে উচ্চকণ্ঠে সে আপ্‌না আপ্‌নি ব'লে উঠ্‌লো, হরিবোল হরি! আমাদের কুঞ্জবালা আজ্ যেন আমাদের কাছে বনের বাঘের মাসী। আচ্ছা কুঞ্জবালা! বাক্-চাতুরী ছাড়, সত্য সত্য কি তুমি আমাদের চিন্‌তে পার্‌ছ না ?

কেমন ক'রে চিন্‌ব ? অনেকক্ষণ তাদের মুখপানে চেয়ে চেয়ে, তিনজনের আপাদমস্তক ভাল ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে কিছুই স্মরণ ক'র্‌তে পার্‌লেম না। কাজে কাজেই বিস্ময়-বিজড়িত চমকিতস্বরে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন ক'র্‌লেম, কেমন ক'রে চিন্‌ব ? কে তোমরা ?

"আচ্ছা, যদি নাম বলি, তা হ'লে চিন্‌তে পার্‌বে ?"

তাই বা এখন কেমন ক'রে ব'ল্‌বো। আচ্ছা বল, নাম তোমাদের বল, দেখি যদি কিছু মনে ক'র্‌তে পারি।

প্রথমভাষিণী সম্মুখবর্ত্তিনী সুন্দরী কামিনী হাস্‌তে হাস্‌তে আমার মুখের কাছে হাত ঘুরিয়ে যেন কতই আত্মীয়ভাবে ব'ল্‌লে, "ততখানি ভালবাসার মানুষ কি এত শীঘ্র শীঘ্র ভুলে যেতে পারে? আচ্ছা থাক্, নাম এখন থাক্। আচ্ছা সেই শিবের মন্দির মনে পড়ে?"

প্রশ্ন আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। বিস্মিতভাবেই জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, কোন্ শিব?

পূর্ব্ববৎ হাস্য ক'রে প্রশ্নকারিণী আবার এক নূতন প্রশ্ন দিলে, "আচ্ছা সেই বাতাপী বাগান?"

হঠাৎ আমার মাথার উপর দিয়ে সাঁ ক'রে যেন একটা বিদ্যুতের আভা ছুটে গেল। কতদিনের কি যেন একটা পূর্ব্ব-কথা মনে প'ড়্‌ল, তথাপি সন্দেহে সন্দেহে প্রশ্ন ক'র্‌ছিলেম, কোন্ বাতা——

বাধা দিয়ে, প্রশ্নকর্ত্রী একটু যেন বিস্ময় জানিয়ে. একটু ক্ষুণ্ণস্বরে ব'ল্‌লে, "তা পর্য্যন্ত ভুলেছ? কুঞ্জবালার অন্নপ্রাশনের কথা পর্য্যন্ত স্মরণ আছে, যে সব ছোট কথা মনে রাখ্‌বার কিছুমাত্র দরকার নাই, চুলে চুলে সেগুলি পর্য্যন্ত কুঞ্জবালার মনে থাকে, সকলেই এই কথা ব'লে কুঞ্জবালার প্রশংসা ক'র্‌ত, আমরাও আহ্লাদে আহ্লাদে কত হাসি হাস্‌তেম, ধুলোমাখা ঐ মুখে আহ্লাদে আহ্লাদে কত চুমোই খেতেম, আমাদের সেই কুঞ্জবালা এখন এই! হ্যাঁ কুঞ্জবালা! তুমি কি আমাদের

সেই কুঞ্জবালা ?" দেবকন্যার মত তোমার সেই সব স্মরণশক্তি কোথায় গেল ? কোন্ শিব, কোন্ বাতাপী, এ কথাগুলিও তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছো ! কিছুই কি তোমার মনে হ'চ্ছে না ? সেই শিব, যে শিবকে আমরা চার্‌জনে, নিত্য নিত্য নূতন কল্‌সীর জলে স্নান করাতেম, যে শিবের মন্দিরে চারজনে আমরা আঁচল পেতে শুয়ে থাক্‌তেম ; সেই সব বাতাপী লেবুর গাছ, নিকটে বিল্বপত্র না পেলে, ফুল তোলা ভুলে গেলে, সেই বাতাপী লেবুর পাতায়—বাতাপী লেবুর ফুলে আশুতোষের পূজা ক'র্‌তেম, জ'ন্মে যেন চার্‌জনে ছাড়াছাড়ি না হয়, শিবের চরণে সেই বর মেগে নিতেম্। কুঞ্জবালা ! সে সব কথা কি কিছুই তোমার মনে পড়ে না ? চার জনে এক সঙ্গে কত খেলাই খেলেছি, কতদিন ঘর বাড়ী ছেড়ে প্রায় শিবের মন্দিরেই রাত্রি প্রভাত ক'রেছি। সে সব সুখের দিন—সুখের কথা কি একেবারেই ভুলে গিয়েছ ?"

আমার চট্‌কা ভেঙ্গে গেল ! মনে মনে বড়ই অপ্রতিভ হ'লেম। পরিচিতা সঙ্গিনীদের চির অপরিচিতা ব'লে এতক্ষণ জ্ঞান হ'চ্ছিল, সেইটুকু মনে ক'রে আপনা আপনি বড় লজ্জা পেলেম। বিষণ্ণবদনে, বিষণ্ণনয়নে কামিনীত্রয়ের প্রফুল্ল মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ ক'রে নিতান্ত বিষণ্ণস্বরে ব'ল্‌লেম, হাঁ ভাই ! আমি যেন পৃথিবীতে ছিলেম না, তোমার শেষকালের কথাগুলি শুনে, আমি যেন এইমাত্র কোন অজ্ঞাত জগৎ থেকে এখানে নেমে এলেম। চিন্‌তে পারি নাই, তোমরা ভাই আমাকে মাপ কর। এই পর্য্যন্ত ব'ল্‌লেম। মনের আবেগে

কণ্ঠ যেন বাষ্প রুদ্ধ হ'য়ে এলো, চক্ষু যেন জলভারে ভারি হ'য়ে উঠ্‌লো। টেনে টেনে দুটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, সজল-নয়নে, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে, আবার ব'ল্‌তে লাগ্‌লেম, হাঁ ভাই, সে সকল সুখের দিন—সে সকল সুখের কথা সমস্তই আমি ভুলে গেছি! জাননা ত আমার অদৃষ্টের কথা! কত বিপদ্‌চক্রে যে আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে, যিনি আমাকে মায়ের কোলে পাঠিয়েছিলেন, তিনি ছাড়া, আর আমি ছাড়া কে আর সে সব ভয়ানক কথা জান্‌বে! তা যদি তোমরা জান্‌তে, তা হ'লে আর আমাকে মনভোলা ব'লে লাঞ্ছনা দিতে না। শুনেছি, সম্পদে লোকে পূর্ব্বকথা, পূর্ব্ব পরিচয় ভুলে যায়, এখন আমি নিজে ভুক্তভোগী হ'য়ে বুঝতে পার্‌ছি, বিপদে আরও তার চেয়ে বেশী। পূর্ব্ব সুখের সব কথাই আমি ভুলে গেছি, বেশী কথা কি ব'ল্‌বো, এইমাত্র যা করি, যা বলি, যা শুনি, এই মাত্রই তা ভুলে যাই। সুখের কথা ব'লেই ব'ল্‌ছি, কিন্তু সুখী আমি কবে? শিবের মন্দিরে, বাতাপী বনে, সুখের খেলা খেলেছি, সত্য কথা, কিন্তু তখনও আমি কাঙ্গালিনী। দেশ আমার নয়, গৃহ আমার নয়, মন্দির আমার নয়, সমস্তই পরের। জন্মভূমি কোথায়, জন্ম হ'য়েছে কার কোলে, জন্মদাতা পিতাই বা কে, এখনও যেমন জানি না, তখনও তেমনি জান্‌তেম না। তবে তখন সুখের মধ্যে এই ছিল, আপদ্ বিপদ্ জান্‌তেম না, শত্রু দস্যু চিন্‌তেম না, অজ্ঞান বালিকাকালে একরকম সুখে সুখেই কেটেছে। এখন আমি লোমে লোমে বিপদ্‌চক্রে ঘেরা! এখন আর আমার এই দগ্ধ

হৃদয়ে তিলমাত্র শান্তির স্থান নাই, বিপদক্ষেত্র ব'লেই আপ্‌নাকে আপ্‌নি ভয় করে। তোমাদের আমি চিন্‌তে পারি নাই, তোমাদের দেখে ভয় পেয়েছি, সে দোষটী নিও না। তোমরা ভাই আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, হয় ভগবান্ আমাকে এই নিদারুণ বিপদ্‌চক্র থেকে পরিত্রাণ করুন্, না হয় পৃথিবী থেকে তুলে নিন্। আমার এ জন্মের খেলা ধুলা সাঙ্গ হ'য়েছে। তাই আমি মনে ভেবে রেখেছিলেম, তোমাদের পেয়ে আজ্ যেন আবার একটু আশা দীপ মিট্ মিট্ ক'রে জ্বোল্লো। নাম ব'লে পরিচয় দিতে যাচ্ছিলে, চক্ষের দেখাতেই দেখ্‌তে পাচ্ছি, জয় জয়কার! জয়—জয়—জয়!—আশীর্ব্বাদ কর।

ব'ল্‌লেম, জয় জয় জয়। একথার একটু মানে আছে। পাঠকমহাশয় মনে রাখ্‌বেন, করুণাময়ীর অনুগ্রহে আজ্ তিনটী জয় বহুদিনের পর আমার চক্ষের নিকটে—বক্ষের নিকটে উপস্থিত। ইন্দ্রজালের মত যে তিনটী কামিনী আমার সমীপ-বর্ত্তিনী, সে তিনটী আমার শৈশব সহচরী। প্রথমাটীর নাম জয় মঙ্গলা, দ্বিতীয়া জয়লক্ষ্মী, তৃতীয়া জয়তারা; ভাগ্যফলে এই তিন জয় আজ্ আমার সহায়, ভগ্নহৃদি মন্দিরে একটু একটু মিট্ মিট্ ক'রে আশাদীপ জ্বল্‌ছে। দুরাচার দস্যুবল নিকটে নাই, যে মন্দিরে এনে আটক রেখেছিল, সে মন্দির থেকেও আমি স'রে এসেছি, এটা এখন বোধ হ'চ্ছে মা কালীরই কৃপা! নিদ্রা-দেবীর কোলে দেবী দয়াময়ীই দয়া ক'রে আমারে স'রিয়ে দিয়েছেন। দৈববশেই তিনটী বীর্য্যবতী, বুদ্ধিমতী, সুনিপুণা, প্রাণসঙ্গিনী আজ্, আবার বিপদ্‌সঙ্গিনী হ'তে মিলেছে।

এ প্রকার শুভলক্ষণের—শুভ সংযোগের অবশ্যই কিছু শুভ পরিণাম আছে, সেই ধারণাটুকুই আমার আশাদীপের মিট্‌মিটে আলো।

মনে মনে এই রকম নানাখানা চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে একটা কথা হঠাৎ আমার মনে প'ড়্‌লো। তাড়াতাড়ি জয়-মঙ্গলাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, জায়গাটার নাম কি?

জয়মঙ্গলা উত্তর ক'র্‌লে "কেন? নাম কি তুমি জাননা? রাত্রে কোথায় ছিলে, সে স্থানের নাম জান?"

না। একটু একটু আভাস মনে আসে।

"কেন? এস্থান ত তুমি আর একবার দেখে গেছ। এটা বিন্ধ্যাচল, এখানে ত তুমি আর একবার এসেছিলে, তবে, সে এরকমে নয়, বিপদে প'ড়ে ডাকাতের হাতে নয়, সাধক লোকের সঙ্গে তীর্থ দর্শনে আসা। তা হোক্, স্থান ত সেই বটে।"

সখীর কথাগুলি শুনে প্রথমে আমি একটু কেঁপে-ছিলেম, কুটীরখানা তবে বিন্ধ্যাচলে—তবে ত নিরাপদ নই, ওঃ! যা ভেবেছি তাই, ডাকাতেরাই তবে নেসার ঘোরে অচেতন ক'রে এইখানে লুকিয়ে রেখে গেছে, এখনি হয় ত আস্‌বে। তবে আর রক্ষার উপায় কই? তবে কেন আশাদীপ জ্বলে! বিন্ধ্যাচলের নাম শুনেই সত্য সত্য এই ভয় আমার হ'য়েছিল, কিন্তু কেন জানিনা, তখনই তখনই সে ভয় অনেক দূর তফাতে সরে গেল। একটু একটু অন্ধকার থাক্‌লো, দেখ্‌লেম, সেই অন্ধকারের ভিতর আশাদীপ জ্বলে, নির্ব্বাণ হ'তে চায়না। জয় মঙ্গলার পূর্ব্ববাক্যে উত্তর

ক'র্‌লেম, হাঁ ভাই! বিন্ধ্যাচল, রাত্রে আমি অনুমানে একটু একটু তাই ভেবেছিলেম। ডাকাতেরা আমারে কালীর মন্দিরে রেখেছিল, মন্দিরটী ঠিক্ ত্রিকোণ মণ্ডলের ধারে। বিপদের রাত্রি, মহাবিপদে আমি বন্দিনী, পূর্ব্বস্মৃতি ঠিক্ মনে ক'র্‌তে পারা গেলনা, মন্দিরের প্রতিমাখানি দেখে, কতক কতক অনুমানে এসেছিল, বিন্ধ্যাচলের বিন্দুবাসিনী। তা সে কথায় এখন কাজ কি, বিন্ধ্যাচলেই র'য়েছি, তবে ভাই ডাকাতের হাতে রক্ষার উপায় কি? তোমরা এখান থেকে যাও, আমার জন্যে তোমরাও কি দুরন্ত দস্যুর করাল গ্রাসে——

জয়মঙ্গলাকে এই কয়টী কথা সবে ব'ল্‌ছি, হঠাৎ একটা অশীতিবর্ষীয়া বুড়ী বিকটবদনে ঝাঁকড় মাকড় চুলে দুই হাতে মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে অস্থির পদে সেইখানে এসে উপস্থিত হ'লো। আমি ত তাকে দেখেই শিউরে উঠ্‌লেম। কিন্তু আমার সহচরী তিনটী সেই ঘটনায় একটু বিস্ময় বোধ ক'র্‌লে, কোন লক্ষণেই আমি সেরূপ অনুভব ক'র্‌তে পারলেম না। বুড়ীটা এসেই কোটর-লুক্কায়িত বিকটনয়নে আমাদের দিকে চেয়ে ঘর্ ঘর্ কর্কশ গভীর আওয়াজে ভঙ্গস্বরে যথা সম্ভব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ব'ল্‌লে, "এখনও তোরা এখানে ব'সে ফাজিল চালাকী ক'র্‌ছিস্?" একটা অস্থিসার দীর্ঘ অঙ্গুলি দীর্ঘ হস্ত বিস্তারে দক্ষিণদিকে হেলিয়ে গভীর গর্জ্জনে যেন হাকিমের স্বরে হুকুম ক'র্‌লে, "আয় উঠে আমার সঙ্গে! এখনও দেরি! আয় শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর! বেলা মাথা মাথি হ'লো, তারা এসে প'ড়্‌লো।"

বুড়ীর হুকুমে থতমত খেয়ে আমার সখী তিনটী ত্রস্তভাবে উঠে দাঁড়ালো, শঙ্কিতস্বরে আমারেও শীঘ্র শীঘ্র উঠে আস্‌তে ব'ল্‌লে। আমি আর কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি না ক'রে—ভাল মন্দ কিছুই বিবেচনা না ক'রে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উঠে দাঁড়ালেম। কুটীরের একধারে একখানা অর্দ্ধ দগ্ধ কাঠ প'ড়েছিল্‌, বুড়ী সেই কাঠখানা হাতে ক'রে নিয়ে 'চল্‌ চল্‌ চল্‌' ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সজোরে দু তিনবার ভূমিতলে আঘাত ক'র্‌লে। হস্তসঙ্কেতে আমাদের চার জনকে অনুগামিনী হ'তে ব'লে পূর্ব্বের মত গর্জ্জনস্বরে হুকুম দিলে "আয় উড়ে!—পাখী যেমন উড়ে যায়, তেম্‌নি উড়ে আয়! কোন কিছু দেখ্‌বি না, কোনদিকে চাইবিনা, কোথাও থম্‌কে দাঁড়াবিনা, বেপরোয়া, আয় উড়ে।"

ব'লেই ছুট। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ছুট্‌লেম্‌। বুড়ীর কথাই যেন ঠিক্‌ হ'লো, বুড়ীর পশ্চাতে পশ্চাতে আমরা ঠিক যেন পাখীর মত উড়ে চ'ল্‌লেম।

অষ্টম তরঙ্গ।

অদ্ভুত সন্দর্শন।

দিবা দ্বিপ্রহরের পরে বিন্ধ্যাচলের কুটির পরিত্যাগ ক'রে এসেছি। সঙ্গিনী সেই তিনটী সখী, আর সেই বিকটবেশ-ধারিণী অপরিচিতা বৃদ্ধা। কি ভাবে, কি প্রকারে, কতদূরে এসেছি; জ্ঞানে কি অজ্ঞানে কোথায় এসে পৌঁছেছি,

ভ্রমণকালে কোন প্রকার যান বাহনের প্রয়োজন হয়েছিল কি না, সারাপথ জাগন্ত ছিলেম, কিম্বা নিদ্রার আবরণে জ্ঞান ঢাকা পড়েছিল স্মরণ করা বড় কঠিন। এখন আমি জাগরিত। দিব্য মনোহারিণী অট্টালিকায়, দিব্য সুকোমল সুখময় শয্যায় আমি শুয়ে আছি; কিন্তু একাকিনী। সময় প্রভাত। সখী তিনটীর একটীও নিকটে নাই। বৃদ্ধা থাক্‌বে কি না থাক্‌বে জানা ছিল না। আমি একাকিনী। গৃহের চারিদিক্ চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি; গৃহ চেনা চেনা। গৃহসজ্জা শোভাপারিপাট্য, সমস্তই যেন চেনা। গৃহের দ্বারগবাক্ষ সমস্তই অনাবৃত। শয্যার উপর থেকে বাহিরের সুরঞ্জিত বারাণ্ডা বেশ দেখা যায়, তাও আমি দেখ্‌ছি। বাহিরের দীর্ঘ দীর্ঘ তরুরাজী প্রভাত সমীর-হিল্লোলে মৃদু মৃদু কম্পিত হ'চ্চে; পরিচিতা ব'লে যেন আমার তপ্ত শরীরে শীতল বায়ু বিজন ক'চ্চে। সেই বৃক্ষশাখার আহ্বানেই যেন তাড়াতাড়ি আমি শয্যা থেকে উঠ্‌লেম। চঞ্চল পদে বাহির হ'য়ে বারাণ্ডায় গিয়ে দাঁড়ালেম। সম্মুখে, বামে, দক্ষিণে চঞ্চলনয়ন মূহূর্ত্তের মধ্যে একবার ঘুরালেম। যথার্থই এ পুরী আমার পরিচিত। দৈব মিলিত তরণী আরোহণে ইতিপূর্ব্বে যে পুরীতে আশ্রয় পেয়েছিলেম, এ পুরী সেই পুরী।

মহা বিস্ময় উপস্থিত! এখানে আবার কেমন কোরে এলেম? যা যা ঘ'টেছে, যা যা ঘটেছিল, যা যা ঘ'ট্‌লো, আগাগোড়া সমস্তই মনে মনে তোলাপাড়া কোল্লেম; পরিণাম কি দাঁড়াবে সেই টুকু অবধারণ ক'ত্তে পাল্লেম না। বক্ষঃস্থল

কম্পিত হ'লো! এই কি আমার নিরাপদের পন্থা? যেমন মনে মনে এই প্রশ্ন উদয় হয়েছে, কোথাও কিছু নাই, তৎক্ষণাৎ অমি যেন নানাপ্রকার বিভীষিকা সম্মুখে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। কম্পিত পদে, হতাশ-হৃদয়ে আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'ল্লেম। আবার গৃহের চতুর্দ্দিক ভাল ক'রে দেখ্‌লেম। মন কোথাও স্থির নয়। দারুণ ভয়ে অন্যমনস্কে পা ঝুলিয়ে শয্যার উপর গিয়ে ব'স্‌লেম। কেমন কোরে এ পুরীতে এলেম? আগেও যেমন দেখে গেছি, এখনও তেম্নি দেখ্‌ছি। পুরী শূন্যময়! জনমানবের সঞ্চার নাই। যারা নিয়ে এলো, তারাই বা কোথায় পালালো? ডাকাতের সঙ্গে যোগ আছে না কি? পরিচয় দিলে বাল্যসখী ব'লে, আমিও চিন্‌লেম বাল্যসখী ব'লে। আশ্বাস দিলে উদ্ধার ক'র্ব্ব ব'লে। কিন্তু এই কি সেই উদ্ধার? এই কি সেই বাল্যসখীর কাজ? ক্রিড়াসঙ্গিনী বাল্যসখী। তারা কি এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে একাকিনী ফেলে সচ্ছন্দে পালিয়ে গেল? সেই যে বুড়ীটা এসেছিল, চেহারা দেখেই বুঝেছিলেম এটা ডাকিনী! সমস্তই ডাকিনীর মায়া! এখন বুঝতে পারছি, তারা আমার বাল্যসখী নয়! মুখে রং মেখে এসেছিল;—বেশ ব'দ্‌লে এসেছিল, সেই জন্যই প্রথমে আমি চিন্‌তে পারি নাই। সখী হ'লে ছদ্মবেশ ধ'র্‌বে কেন? একবার ভেবেছিলেম মায়াবিনী, কার্য্য দেখে এখন নিশ্চয় প্রতীতি হ'চ্ছে মায়াবিনী! দুঃখিনী আমি, কাঙ্গালিনী আমি, বিপদে বিপদে পাগলিনী আমি, আমার সঙ্গে কেন তাদের এ ছলনা। ডাকাতের সঙ্গে যোগ আছে। ডাকাতেরা আমাকে কালীর

মন্দির থেকে স'রিয়ে পর্ণকুটীরে লুকিয়ে রেখেছিল, যা তাদের মনে ছিল, ইচ্ছা ক'র্‌লে সেইখানেই সে ইচ্ছা সফল ক'র্‌বার চেষ্টা পেতো, দূতি সাজিয়ে আবার আমাকে স্থানান্তর ক'র্‌বার মানে কি ?

ভাব্‌ছি, আনাভি-অবগুণ্ঠনবতী একটী যুবতী চমকিত চমকিত মৃদুপদে সেই গৃহ মধ্যে এসে প্রবেশ ক'র্‌লে। প্রবেশ ক'রেই, চঞ্চলহস্তে মুখের অবগুণ্ঠন খুলে ফেল্‌লে। প্রকাশ হ'ল, জয়মঙ্গলা।

ভয়ের গুহায় কিঞ্চিৎ সাহস এসে দেখা দিলে। দাঁড়িয়ে উঠে চক্ষের জলে ভেসে কম্পিতহস্তে জয়মঙ্গলার হাত ধ'রে শয্যার উপর বসালেম, দুটীতে পাশাপাশি ব'স্‌লেম। মুখ-পানে চেয়ে জয়মঙ্গলা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "তুমি কাঁদ কেন ?" সময়ের স্তম্ভিতস্বরে আমি উত্তর ক'র্‌লেম, কৈ ? আমি কাঁদি নাই।

"এই যে চক্ষের জল ?"

কাঁদ্‌লেই বুঝি চক্ষে জল আসে, ও আমার আহ্লাদের জল। এতক্ষণ অতলপাথারে ডুবেছিলেম, এখন তোমাকে দেখে ভেসেছি। আমি ভেসেছি ব'লেই চক্ষু ভাস্‌ছে। ও আমার আনন্দাশ্রু। এই কথা ব'লেই সচঞ্চলে আমি উভয়হস্তে অশ্রু মার্জ্জন ক'র্‌লেম। সানন্দমুখী জয়মঙ্গলাও বসনাঞ্চলে আমার আনন্দাশ্রু পরিমার্জ্জনে সহায়তা ক'র্‌লে। উভয়েই আমরা সুস্থির। আমি কি রকম সুস্থির ?—অগ্নিপূর্ণ চক্‌মকি পাথরের মত ;—ভিতরে আগুণ, বাহিরে হিম ;—জয়মঙ্গলার চক্ষে আমিও সেই

প্রকার অগ্নিপূর্ণহৃদয়ে বাহিরে সুস্থির। উৎকণ্ঠিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, "তারা কোথায় গেল?"

একটু উদাসীন হাসি হেসে জয়মঙ্গলা সংক্ষেপে উত্তর ক'র্‌লে, "আছে।"

সসংশয়ে আবার আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, "তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

জয়মঙ্গলা আমার এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে আমার উপরেই প্রশ্ন চাপালে, "সে তত্ত্ব তোমার জান্‌বার দরকার কি?"

প্রথম প্রশ্নের উত্তরটাও যেমন বুঝ্‌লেম, দ্বিতীয়বারের প্রশ্নটাও তেম্‌নি বুঝ্‌লেম। সংশয় আস্‌ছিল, দ্বিগুণ প্রবল হ'লো। সবিস্ময়ে উক্তি ক'র্‌লেম, কি? দরকার নাই?

আমার মুখপানে চেয়ে জয়মঙ্গলা খানিকক্ষণ কি ভাব্‌লে। ভেবে ভেবে মুখখানি ভারি ক'রে সেখান থেকে উঠে গেল, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, টিপি টিপি মৃদুপদে বারাণ্ডায় গিয়ে দাঁড়াল। আমি মনে ক'র্‌লেম, রাগ ক'রে গেল, পূর্ব্বে যেরূপ আশঙ্কা আস্‌ছিল, তাই কি সত্য? ডাকাতের দলে খবর দিয়ে ডাকাত কি সঙ্গে ক'রে এনেছে? ক্ষণকাল কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

সহচরীর প্রতি এরূপ সংশয়ের অবিশ্বাস আমার হৃদয়ে তখন অধিকক্ষণ স্থায়ী হ'ল না, একটু পরেই জয়মঙ্গলা পুনঃ প্রবেশ ক'র্‌লে। এসেই আবার তেম্‌নি ভাবে আমার কাছে গা ঘেসে ব'স্‌ল, মুখখানি তেম্‌নি ভারিই আছে, চুপি চুপি জয়মঙ্গলা আমারে ব'ল্‌লে, "বাতাসের মুখে কথা চলে, ঘরের

এই কবাট জানালা গুলোরও কাণ আছে, সাবধান হ'য়ে এলেম, যে রকম ভয়ানক চক্র ঘুরে ঘুরে বেড়ালে, কে কখন কোথা দিয়ে এসে কাণপেতে শুনে, সুলুক সন্ধান জানে, কিছুই বলা যায়না, কিছুই ভাবা যায় না। কেহ কোথাও ওতে ঘাতে গা ঢাকা হ'য়ে লুকিয়ে আছে কি না, দেখে শুনে সাবধান হ'য়ে এলেম। সিঁড়ির দরজায় শিকল লাগিয়ে দিলেম। যে সব কথা তোমাকে এখন ব'লতে হবে, সে সব বড় ধরণের কথা। কুটীরে তুমি ব'লেছ, তোমার এই গ্রহচক্রের বিপদের কথা কিছুই আমরা জানি না। জানি;—জানি ভাই চন্দ্রমুখি! সব আমরা জানি। কারা কারা তোমার অনুকূল, কারা কারা তোমার প্রতিকূল, স্ত্রীজাতি আমরা,—ধ'র্‌তে গেলে বালিকা আমরা, সে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব কেমন ক'রে জান্‌ব? সাহস হয় না, অবসর হয় না, সুযোগ হয় না, তাই ভেবেই আমরা ফাঁপর। সেই যে বুড়ী দেখেছ, সে বুড়ী বড় সামান্য বুড়ী নয়, মন্ত্র তন্ত্র অনেক জানে, বনের গাছপালা অনেক চেনে, ঔষধ পত্র অনেক জানে, পরের উপকার ক'র্‌বার ইচ্ছাও দেখেছি তার খুব বেশী। দৈবযোগে আমার সঙ্গে তার এক বনে দেখা হয়। বনে আমি কেন গিয়েছিলেম, সে সব অনেক কথার কথা,—কোন বিপদের কথা নয়, সে সব কথার কোন দরকার নাই, বনে ঐ বুড়ীর সঙ্গে আমার দেখা হয়,—কেন জানি না। বুড়ী আমাকে ভালবাসে, আমার উপর বুড়ীর দয়া হয়। বুড়ী আমার সঙ্গে কথা কয়, কোন বিপদ্ আমাকে ছোঁবে না, বুড়ী আমাকে এত বড় ভরসা দেয়, তার পর

ঘটনায় ঘটনায় আমরা তিন ভগ্নী (খুড়ি ভাই) আমরা তিন জনেই বুড়ীর আদরের পাত্রী হই। বুড়ী দেখি যা মনে করে, তাই করে, থাকে থাকে যেন উড়ে যায়, সময়কালে—কতদিনের পর—আচম্বিতে কোথা থেকে যেন উড়ে আসে, বোধ করি, ডাকিনীমন্ত্র জানে;—ডাকিনী কিন্তু নয়, বেশ মানুষ, শরীরে খুব মায়া দয়া, বেশ বুড়ী, বুড়ীর গুণে আমরা তিন জনেই একবারে জন্মের মত সেবাদাসী হ'য়ে আছি। এবার আমরা বিন্ধ্যাচল দেখ্‌তে এসেছিলেম, ভগবান্ যদি দিন দেন, সে সব কথা শেষে ব'ল্‌বো। ঘটনাসূত্রে তোমাকেও ডাকাতেরা বিন্ধ্যাচলে এনে ফেলেছিল, কামচারিণী বুড়ী ঠিক্ সময়ে বিন্ধ্যাচলে দেখা দেয়। তোমার বিপদের কথা বুড়ী জানে, তাও তুমি ক্রমে ক্রমে শুন্‌তে পাবে। কালীর মন্দিরে তোমাকে আটক্ ক'রে রেখে, ডাকাতেরা যখন যে যার ভোরপুর মদ খেয়ে এখানে ওখানে অজ্ঞান হ'য়ে শুয়ে পড়ে, বুড়ী সেই অবকাশে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে তোমাকে খানিকটা লতা পাতার রস খাইয়ে অনেকক্ষণের মত ঘুম পাড়ায়, তুমি তখন ঘুমন্ত ছিলে কি অজ্ঞান ছিলে, বুড়ী সে কথা বলে নাই; কিন্তু জোর ক'রে ঔষধটা খাইয়েছিল, সে কথা শুনেছি; সেই অবস্থায় বুড়ী তোমারে কোলে ক'রে, সেই জনশূন্য পর্ণকুটীরে এনে রাখে। আমরা যেখানে ছিলেম, আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে বুড়ী আমাদের তিনজনকেই সেই রাত্রে সেই পর্ণকুটীরে নিয়ে আসে; তোমায় পাহারায় রাখে। সারারাত্রি তুমি অজ্ঞান ছিলে, সারা রাত আমরা তোমাকে চৌকী দিয়েছি, আমাদের পাহা-

রায় রেখে বুড়ী অদৃশ্য হ'য়েছিল, ডাকাতদের মদের নেসা যাতে ক'রে শীঘ্র শীঘ্র না ছোটে, বুড়ী তারও উপায় ক'রেছিল। সব ঠিক্ ঠাক্ ক'রে কাল সকালে অতখানি বেলায় পর্ণকুটীরে দেখা দিয়েছিল, সে সব কথা তুমি জান। এখন কথা হ'চ্চে এই, বুড়ী এখন এই বাড়ীতেই আছে। এক রাশ জবাফুল নিয়ে কি একটা যোগসাধন ক'র্‌তে ব'সেছে। রাতারাতিই আমরা তিন জনে সমস্ত যোগাড় ক'রে দিয়েছি, তাতেই আমার তোমার কাছে আস্‌তে এতখানি বেলা হ'য়ে গেছে। জয়লক্ষ্মী আর জয়তারা সেই যোগের পরিচর্য্যা ক'র্‌ছে, আমি তোমার কাছে এলেম। এখানে তোমার কোন ভয় নাই।"

সব কথাগুলি আমি মন দিয়ে দিয়ে শুন্‌লেম। আপনার তত বড় দ্বিগুণ ভাগ্যের কথা—ক্ষণকালের জন্য যেন সব ভুলে গেলাম। সবিস্ময়ে ব'লে উঠ্‌লেম, অ্যাঁ! এমন বুড়ী! অত কদাকার, অত ভয়ানক, দেখ্‌তে যেন ভূত-পেত্‌নির মত বিদ্‌-কুটে চেহারা, কাছে এলেই ভয় হয়, ঘৃণা হয়, ও বুড়ীর শরীরে এত গুণ!

জয়মঙ্গলা বোল্লে, "হাঁ, অতগুণ! আরও কত আছে, আমরা সব এখনও জান্‌তে পারিনি। বুড়ীর গুণে তিনজনে আমরা কিন্তু একেবারে মোহমন্ত্রে বিমুগ্ধ হোয়ে গেছি।"

একটী নিশ্বাস ফেলে আমি বোল্লেম, হাঁ তা ত গিয়েইছ, যাওয়াই সম্ভব; কিন্তু সেই ডাকাতের সর্দ্দারটা,—যার নাম সকলে বলে বিশ্বেশ্বর, সেই সর্দ্দারটা যে এ বাড়ী জানে, আরও তার দলের জনকতক বড় বড় পালোয়ানও জানে। আমি যে

দিনকতক এই বাড়ীতে ছিলেম, তাও তারা জানে। এই বাড়ী থেকেই আমাকে ধোরে নিয়ে গিয়েছিল, তবে আর তোমাদের যোগিনী আমাকে নিরাপদ কোল্লেন কি কোরে?

"তাও আমরা জানি।' যেন কতই সাহসে প্রফুল্ল মুখখানি ঘুরিয়ে জয়মঙ্গলা বল্‌লে, তাও আমরা জানি। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি নিরাপদ,' মা কালী তোমাকে নিরাপদ ক'র্‌ছেন, দেখ্‌ছ না! বিন্ধাচলে তুমি বন্দিনী, বিন্ধাচলে আমাদের আশা, যোগিনীর সঙ্গে মিলন, এত শুভসংঘটন মানুষ হ'তে কি ঘটে? মা কালী তোমাকে রক্ষা ক'র্‌ছেন, কোন ভয় নাই।"

অভয় দিয়ে জয়মঙ্গলা একবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, ক্ষণকাল আমি একাকিনী হ'লেম। একটু পরে জয়মঙ্গলা আবার এলো, আরও কতকগুলি গুপ্ত পরামর্শের কথা আমাকে জানালে, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে যথাসম্ভব আহারাদি ক'রে আমরা সেই বিশ্রামগৃহে গিয়ে ব'স্‌লেম, আমরা ব'স্‌লেম বটে, কিন্তু সে আমরা সব নয়, কেবল আমি আর জয়মঙ্গলা। জয়লক্ষ্মী আর জয়তারা সে বেলার মধ্যে একটীবার আমার সঙ্গে দেখাও ক'র্‌লে না, আহার হ'ল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, জয় মঙ্গলাও আমার সঙ্গে একত্রে ব'সে আহার ক'র্‌লেনা। কেন, কি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসাও ক'র্‌লেম না। অন্য দিনের চেয়ে সে দিন মনটী আমার ভাল ছিল, জয়মঙ্গলার সঙ্গে নানা রকম গল্পে দিবাকাল অতিবাহিত হ'য়ে গেল। খোস-গল্প নয়, অবশ্যই বিপদের গল্প, কিন্তু সময় সাঁ সাঁ ক'রে কোথা দিয়ে কেটে গেল, কিছুই জান্‌তে পার্‌লেম্‌না। সূর্য্যদেব অস্তশৈলে বিশ্রাম ক'র্‌তে গেলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে

পুরীময়' ধূসরবসনা গোধূলী পুরীতে লোকজন নাই, কিন্তু আস্‌বাব পত্র সব আছে, জয়মঙ্গলা সন্ধ্যাসমাগমে রজত দীপ-দানে বাতি জ্বেলে ঘরটী আলোকময় কো'র্‌লে। সুগন্ধ ধূপ দীপে কক্ষটী অমোদিত হ'লো, বাতির আলোতে আর সেই সকল সুগন্ধ ধূপধূমে জয়মঙ্গলার মুখখানি ঈষৎ আরক্তরাগে রঞ্জিত হ'য়ে উঠ্‌লো। সে সময় জয়মঙ্গলাকে আমি কতই সুন্দরী দেখ্‌লেম। হঠাৎ অট্টালিকার পূর্ব্বদিকে বোধ হ'লো, দ্বিতীয় মহলে শঙ্খঘণ্টাদি বাদ্যধ্বনি সমুত্থিত। সচকিতে জয়মঙ্গলাকে আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, "এখানে কি ঠাকুর আছেন?"

জয়মঙ্গলা উত্তর ক'র্‌লে, "এতদিন তুমি এ বাড়ীতে ছিলে, জাননা আছেন কি না?"

তখন কৈ এ রকম বাদ্য শুনি নাই।

তবে বুঝি নূতন এসেছেন। ঠাকুরের আরতি হ'চ্চে বটে, যাবে কি দেখ্‌তে?

আমি একটু ইতস্ততঃ ক'র্‌লেম। এতদিন এ বাড়ীতে ছিলেম, এ তত্ত্ব জানিনা, এটা সত্য কথা। আমার কর্ণে এ বাদ্যধ্বনি আজ্ নূতন। এই বাদ্যধ্বনির ভিতর আমার জন্য আর কোন নূতন বিপদ্ লুক্কায়িত নাই ত? চকিতমাত্র এই ভাবনা ভাব্‌লেম। কেননা, আমি অভাগিনী,—জন্মের অভাগিনী;—আমার অদৃষ্টকে বড় ভয় করে। ইতস্ততঃ ক'রে ভেবে চিন্তে ধীরে ধীরে জয়মঙ্গলাকে ব'ল্‌লেম, "যদি কোন বাধা না থাকে, তবে যেতে পারি।"

"হাস্য ক'রে জয়মঙ্গলা ব'ল্লে, বাধা নাই, তুমি এস। ঠাকু-রের আরতি ত ভক্তেরাই দেখে, কোন বাধা নাই, তুমি চল।"

দুজনে আমরা উঠ্লেম। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরুলেম, অগ্রে জয়মঙ্গলা, পশ্চাতে আমি। গুর্ গুর্ ক'রে বুক কাঁপ্লো। ঠাকুরের আরতি দেখ্তে যাচ্ছি, বুক কাঁপে কেন? বুকের ভাব বুকেই চেপে রাখ্লেম। বোবাটীর মত জয়মঙ্গলার সঙ্গে চ'ল্লেম। ঠাকুরবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লেম। কি আশ্চর্য্য! ঠাকুরবাড়ী খাঁ খাঁ কার! আলো নাই, লোকজন নাই, সে বাদ্যধ্বনিও নাই, সব শূন্য! ভয় পেয়ে জয়মঙ্গলাকে জিজ্ঞাসা ক'র্লেম, এ কি?

জয়মঙ্গলা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্লো। সম্মুখদিকে যাচ্ছিল, আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে, আমার একখানি হাত ধ'রে টেনে হাস্তে হাস্তে ব'ল্তে লাগ্লো, "এস না, চল না, ভয় কি?"

অন্ধকারে কোথায় যাব! ঘর থেকে বেরিয়ে অবধি বুক কাঁপ্ছে! জয়মঙ্গলা হাত ধ'রে টানাটানি ক'র্লেও আর এক পাও এগুলেম না,—খুব জোর দিয়ে পা ভারি ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্লেম।

টেনে টেনে জয়মঙ্গলা আবার ব'ল্তে লাগ্লো, "এস না, চল না, আট্কে গেলে কেন?"

একটু বিরক্ত হ'য়ে আমি ব'ল্লেম, "টান কেন?—ছেড়ে দেও!—অন্ধকারে কোথায় যাব?"

পূর্ব্বের মত হাস্তে হাস্তে জয়মঙ্গলা ব'ল্লে, "অন্ধকার

নয়, এস না, ভিতরে আলো আছে, ভিতরে ঠাকুর আছে, এস তুমি।"

আবার আমি একটু রুক্ষস্বরে বোল্লেম, "এটা তোমার ঠাকুর বাড়ী নয়, এটা ভূতের বাড়ী।"

জয়মঙ্গলা আরও উচ্চরবে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো। ভিতরে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য বার বার জেদ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। কি আশ্চর্য্য! জয়মঙ্গলা হাসে, আমার ভয় হয়। অনুরোধ এড়াতে পার্‌লেম না, অন্ধকারে তার হাত ধ'রে ধ'রে পায়ে পায়ে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেম। পাষাণে গাঁথা আট দশটা সোপান বেয়ে উঠ্‌লেম। অন্ধকার কাছাকাছি, পাশাপাশি পাঁচ সাতটী ঘর, সে সব ঘর আমার আগেকার চেনা। একটা ঘরে প্রবেশ ক'র্‌লেম। অন্ধকার সেই ঘরের ভিতর দিয়ে আর একটা ঘরে প্রবেশ ক'র্‌বার দরজা, দরজার কপাট খোলা ছিল না, ভিতর দিকে কি বাহির দিকে বন্ধও ছিলনা, হাত দিয়ে ঠেলে জয়মঙ্গলা আমাকে দ্বিতীয় ঘরে নিয়ে গেল। অন্ধকার। সে ঘরের ভিতরও আর একটা দরজা, পূর্ব্ব প্রকার দ্বার উদ্‌ঘাটন ক'রে আমরা তৃতীয়গৃহে প্রবেশ ক'র্‌লেম। সারি সারি তিন তবক ঘর, যে ঘরে এখন এলেম্ সেটী শেষ তবকের শেষের ঘর। ঘরটী প্রায় বিশ হাত লম্বা, ঘরে আলো আছে, একটীমাত্র আলো, আলোটী সেই ঘরের অপর এক প্রান্তে স্থাপিত। দ্বিতীয়প্রান্তের প্রায় অর্দ্ধেকটা স্থান অল্প ছায়ায় অল্প অল্প অন্ধকার। চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, ঘরে মানুষ আছে এমন কোন চিহ্ন দেখতে পেলেম না। আলোটা

মধ্যস্থলে রাখে নাই, সব ঘরে আলো না পড়ে, এমন কি কোন অভিপ্রায় থাকতে পারে? তা না থাকলে অত ধারে, অত টেরে, অত অযত্নে রাখ্‌বার কারণ কি? আলোও বড় উজ্জ্বল নয়, একপাশে দাঁড়িয়ে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি, যে দিক্‌টা অন্ধকার, সেই দিকের শেষ দেয়ালের কাছে যেন একখানি চৌকী পাতা, সেই চৌকীর দুধারে রাশিকৃত ফুল জড় করা, ফুলের স্তূপ ছোট বড় নানাজাতি ফুল, তাই দেখে মনে ক'র্‌লেম, তবে হয় ত এঘরে ঠাকুর আছে। কিন্তু ঠাকুরের কাছে আলো না রেখে অত তফাতে রেখেছে কেন? সন্দেহ-সাগরে সাঁতার দিচ্ছি, সেই অবসরে জয়মঙ্গলা আবার আমাকে টানাটানি আরম্ভ ক'র্‌লে। এসনা, ঠাকুর দেখবে চল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, আরতি হ'য়ে গেছে, ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা চ'লে গেছে, বেশ হ'য়েছে; নিরীবিলি, ঠাকুর দেখ্‌বার সময়ই এই ঠিক্। এই সব কথা ব'লে জয়মঙ্গলা আমার হাত ধ'রে বারম্বার আকর্ষণ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। আমি অনিচ্ছায়, মৃদুপদে অগত্যা তার সঙ্গে সঙ্গে চ'ললেম। চৌকীর নিকটে গিয়ে উপস্থিত হ'লেম, সেই পুষ্পরাশি দুই দিকে খুব উঁচু ক'রে সাজান, জয়মঙ্গলা আমারে সম্মুখে টেনে নিয়ে প্রফুল্লকণ্ঠে ব'ল্‌লে, "এই দেখ, এই ঠাকুর দেখ।"

দু পা পেছিয়ে দাঁড়িয়ে, মুখ ফিরিয়ে আলোর দিকে চেয়ে সঙ্গিনীকে আমি ব'ল্‌লেম, "ঠাকুর এত অন্ধকারে কেন? আলোটা নিকটে আননা, মূর্ত্তিখানি ভাল ক'রে দেখি।"

জয়মঙ্গলা আলো আন্‌তে গেল। আমার মনে তখনও

পর্য্যন্ত অন্য ভাব নাই। যতক্ষণ সে ঘরে প্রবেশ ক'রেছি, সত্য ব'ল্‌ছি, ততক্ষণের মধ্যে ঠাকুরের কথা ছাড়া অন্য কথা ভাবি নাই। আলোহস্তে জয়মঙ্গলা নিকটবর্ত্তিনী। সহসা আমি সেই ফুলের ভিতর চেয়ে দেখি, একখানি মুখ, দিব্য চমৎকার। রূপবান্ যুবাপুরুষের চাঁদপারা একখানি মুখ! দেখেই তৎক্ষণাৎ অম্‌নি আমি ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায়, ক্রোধে, অভিমানে মুদ্রিতনয়নে অবনতমুখী। একি অদ্ভুত ঘটনা! একি অদ্ভুত সন্দর্শন!

নবম তরঙ্গ

একি লুকাচুরি?

কি দেখ্‌লেম, ফুলের ভিতর লুকান এ মূর্ত্তি কে? এত ঠাকুর নয়! জয়মঙ্গলা কোথায় এনেছে! কাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি? মনকে। মন কি বলে? পালা, সশঙ্ক ব্যস্তহস্তে জয়মঙ্গলার হাত ধ'র্‌লেম। মুখে কিছু তিরস্কার ক'র্‌লেম না, সচঞ্চলে, সচকিতে, সভয়ে ঘরের দরজার দিকে একটী অঙ্গুলী হেলিয়ে, বেরিয়ে যাওয়ার ঈঙ্গিত ক'র্‌লেম। হাত কাঁপ্‌ছে, সেই কম্পিতহস্তে সহচরীর হস্ত আকর্ষণ ক'রে দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে দুই এক পা অগ্রসর হ'লেম। ফিক্ ফিক্ ক'রে

জয়মঙ্গলা হাস্‌তে লা'গ্‌ল, তার হাসি দেখে, তখন আমার রাগ হোল। টানাটানি—আমি জয়মঙ্গলাকে টানি বাইরে যাওয়ার জন্য, জয়মঙ্গলা টানে আমাকে ঘরের ভিতর আট্‌কে রাখ্‌বার জন্য। দুজনে দুই দিকে টানাটানি। আমার মুখ দরজার দিকে, জয়মঙ্গলার হাতে আলো ছিল, কে যেন কোন্‌ দিক্‌ থেকে ছুটে এসে তার হাত থেকে আলোটা ধাঁ ক'রে ছিনিয়ে নিলে। সম্মুখদিক্‌টা অন্ধকার হ'য়ে এলো, কাঁপ-ছিলেম, কাঁপুনি আরও বেড়ে বেড়ে উঠ্‌লো। আস্তে আস্তে ঘাড় বেঁকিয়ে ভিতরদিকে চেয়ে দেখি, রণবেশী বীরমূর্ত্তি! ফুলের ভিতর যে মুখখানি দেখেছি, সর্ব্বাবয়বে সেই মুখ বাতি-হস্তে দণ্ডায়মান। মস্তকে পক্ষি-পক্ষযুক্ত রণ-রঙ্গের কিরীট, কারচুপি কাজ করা মহামূল্য পোষাক, বাতির আলোতে সোণার ফুল গুটা, অঙ্গের মণিমুক্তা ঝক্‌মক্‌ চক্‌মক্‌ ক'র্‌ছে। কটিবন্ধে বামদিকে বিলম্বিত কোষযুক্ত তরবারি, দক্ষিণভাগে রজত-কোষে সূক্ষ্মাস্ত্র কিরীচ, বদন গম্ভীর, একটীবারমাত্র চেয়ে সে দিকে আর আমি চাইতে পার্‌লেম না। মনে মনে নানা অমঙ্গল কল্পনা ক'রে বক্রচক্ষে একবার সেই ফুলরাশির দিকে দৃষ্টিপাত ক'র্‌লেম। ফুলরাশি থরে থরে সাজান ছিল, সমস্তই এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে প'ড়েছে, সেখানে সে মুখ নাই। কেনই বা থাক্‌বে? কেমন ক'রেই বা থাক্‌বে? যে মূর্ত্তি দেখ্‌লেম, সেই মূর্ত্তির অবয়বই সেই মুখ, পূর্ব্বে যে সন্দেহ হ'চ্ছিল, সে সন্দেহ থাক্‌লো না, কিন্তু সাগরের তরঙ্গের মত আমার ভয়াকুল হৃদয়-সাগরে নূতন নূতন ভীষণ সন্দেহের তরঙ্গ খেল্‌তে লাগ্‌লো।

সে অবস্থায় শরীরে আমার যতদূর শক্তি ছিল, সব শক্তি একত্র ক'রে, দুই হাতে জয়মঙ্গলার দুই খানি হাত ধ'রে, প্রাণপণে দরজার দিকে আকর্ষণ ক'র্লেম। আমার কপালে যা কিছু ঘটে, তাই আশ্চর্য্য! বিপদ্‌কালে লোকে কেবল মুক্তি চায়, আমার বিপদ্‌কালে কোন প্রকার মুক্তির চেষ্টায়, অভাবনীয় নূতন নূতন বিপদ্ এসে সম্মুখে দাঁড়ায়। বাতিহস্ত বীরপুরুষ লম্ফে লম্ফে ছুটে এসে ঘরের দরজটা বন্ধ ক'রে দিলেন, শুধুই কেবল অর্গলবদ্ধ নয়, কট্ কট্ শব্দে চাবি দিলেন। বনপোড়া হরিণী এইবার যেন পালাবার মুখে ব্যাধের জালে বাঁধা প'ড়্লো।

গৃহের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আমাদের দুজনের দিকে প্রফুল্ল কটাক্ষপাত ক'রে, বীরবেশী গম্ভীরস্বরে উচ্চারণ ক'র্লেন, "মাভৈ।"

আর মাভৈ! ভয়ের সাগরের ভিতর ডুবে র'য়েছি, আমার প্রাণে এখন 'মাভৈ' কথাটা বিদ্রূপমাত্র। মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গোক্তি, অদৃষ্টের বিড়ম্বনা, কথাও কৈতে পার্ছি না। 'মাভৈ' বক্তার মুখের দিকে চেয়েও দেখ্তে পার্ছি না। বিফল চেষ্টা হ'লেও সহচরী জয়মঙ্গলাকে মুখ ফুটে দুটী কথা ব'ল্তেও পার্ছি না। বিষম বিভ্রাট! শঙ্কটের উপর শঙ্কট! যেন অচল পাষাণের মত আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্লেম। জয়মঙ্গলার হাত ধ'রে আছি, ছাড়্লেম না। শরীরে এদিকে কিন্তু স্পন্দ নাই, পা আছে চলে না, হাত আছে সরে না, চক্ষু আছে দৃষ্টি নাই, মুখ আছে বাক্য নাই, এ শঙ্কট যে কি রকম

শঙ্কট, দয়াময় পাঠক মহাশয়গণের মধ্যে দয়াময়ী পাঠিকা গুলির মধ্যে যদি কেহ এমন শঙ্কটে ভুক্তভোগী থাকেন, তিনিই অনুভব ক'র্‌তে পার্‌বেন, তদ্ভিন্ন সহস্র চেষ্টা পেলেও বুঝিয়ে দিবার উপায় নাই।

পূর্ব্বেই ব'লেছি, পুরীতে মানুষ নাই। কিন্তু ঘরে ঘরে আস্‌বাবপত্র সব আছে। যে ঘরে প্রবেশ ক'রেছি, সেই ঘরের চারিদিকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুসজ্জিত আসন পাতা। হাতের বাতিটা একটী দীপাধারের উপরে রেখে বীরবেশী যুবা সেই সব আসনের মধ্যে, একখানি আসনের উপরে গিয়ে বস্‌লেন। খুব যেন ঘনীষ্ঠ আত্মীয়ভাবে স্নেহমাখা প্রফুল্লস্বরে জয়মঙ্গলাকে নিকটে যেতে ডাক্‌লেন, জয়মঙ্গলাও বেশ অকুতোভয়ে পায়ে পায়ে এগুতে লাগ্‌ল। আমি তখন অসাড়। গায়ে একগাছি তৃণ ছোঁয়ালেও প'ড়ে যাই, চলিত কথা মত ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাই, বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমার তখন ঠিক্ সেই রকম অবস্থা। জয়মঙ্গলা স্বচ্ছন্দে ঠিক্ যেন একটা কাঠের পুঁতুলের মত আমারে টেনে নিয়ে সেই বীর-পুরুষের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল। হাস্‌তে হাস্‌তে বীরপুরুষ ব'ল্‌লেন, "বোসো"।

বেশ সপ্রতিভ হ'য়ে জয়মঙ্গলা পাশের একখানি আসনের উপর উপবেশন ক'র্‌লে। যে আসনে সেই যুবাপুরুষ, সেই আসনের দক্ষিণ ভাগে—এক দিকে যুবা, এক দিকে জয়মঙ্গলা, তারই ঠিক্ মাঝখানে একখানি আসন খালি থাক্‌লো, সেই আসনে জয়মঙ্গলা আমাকে ব'স্‌তে ব'ল্‌লে। আমি ত

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মরা, সে শঙ্কটে আবার বসা! হ'লে কি হ'বে, আমি ত তখন আমি নই, জোর ক'রে জয়মঙ্গলা আমাকে সেই আসনেই টেনে বসালে। তখন আর আমি কি করি, কম্পিতকলেবরে জয়মঙ্গলার দিকে ফিরে চক্ষুবুজে মাথা হেঁট ক'রে ব'সে থাক্‌লেম।

বীরপুরুষকে আমি যুবাপুরুষ ব'ল্‌ছি, কেননা, রণবেশে সর্ব্বশরীর আচ্ছাদিত থাক্‌লেও মুখশ্রী দেখে তাঁর বয়ঃক্রম চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের বেশী ব'লে বোধ হয় না। কথাবার্ত্তায় ভাব-ভঙ্গিতেও সেই প্রকার বয়োধর্ম্ম প্রকাশ পেতে লাগ্‌লো। আমাদের বস্‌বার পরক্ষণেই জয়মঙ্গলার সঙ্গে তিনি বেশ হাসিখুসী ক'রে আমোদ আহ্লাদের গল্প জুড়ে দিলেন। বীরপুরুষের মত কথা একটীও নয়। আমার কাণে সে সব কথা তখন যেন জলন্ত অগ্নি বর্ষণ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। অন্তর যখন শোকে, দুঃখে, শঙ্কায়, বিপদে, অবসন্ন থাকে, অতিপ্রিয় মধুর কথাও তখন কাণে যেন বিষ ঢালে! সকলের কাণে ঢালে কিনা, জানি না, আমার কাণে ঢাল্‌ছে! যে সব কথা ভালবাসি, দিন রাত যে সব কথার আলোচনা ক'র্‌তে অহরহঃ প্রাণ চায়, অষ্টবন্ধন শঙ্কটে সে সব কথা এখন যেন শতগুণ সহস্রগুণ প্রজ্জলিত হুতাশনের সমান হ'য়ে, আমার তপ্তহৃদয়কে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেয়। কথাগুলো থেমে গেলেই আমি বাঁচি, দয়া ক'রে কেহ চাবিটা খুলে দিলেই আমি বাঁচি, জ্ঞান হ'চ্ছে যেন এটা জাদুঘর! এ ঘরে যদি কোন জাদুদেবতা থাক, দয়া কর, রক্ষা কর, বড় বিপদে আমি প'ড়েছি, দুঃখিনী

কাঙ্গালিনীর প্রতি কৃপা ক'রে জাদুমন্ত্রে ঐ চাবিটা খুলে দাও, পাখীর মত উড়ে পালাই।

পাগলিনীর মত মনের ভিতর এই রকম কাণ্ড-কারখানা ক'র্‌ছি, তাদের দুজনের আমোদের কথায় ভুলেও একটীবার কাণ পাত্‌ছি না, হঠাৎ সেই বীরপুরুষ পরিহাসবাক্যে আমাকে লক্ষ্য ক'রে মিষ্টস্বরে ব'ল্‌লেন, "কুঞ্জবালা! বোবা হ'য়েছ কত দিন? এই দিকে একবার ফের, চাঁদমুখখানি তুলে আমার মুখের দিকে একবার তাকাও। আমি ঠাকুর নই, আমি ভূত-প্রেত নই, আমি মানুষ—তোমার চেনা মানুষ। কুঞ্জবালা! দেখদেখি একবার চেয়ে, চেনা মানুষকে চিন্‌তে পার কি না? আমি তোমাকে উদ্ধার ক'র্‌তে এসেছি, একটী-বার চাও, একটীবার একটী কথা কও, আমি তোমার সেই——"

পাছে গায়ে হাত দিয়ে ফেলে, সেই ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে জড়সড় হ'য়ে, জয়মঙ্গলার আসনের দিকে—জয়মঙ্গলার গা ঘেঁসে সরে ব'স্‌লেম। "উদ্ধার ক'র্‌তে এসেছি" এই কথাটী শুনে হৃদয় একটু আশ্বস্ত হ'চ্ছিল, কিন্তু ভবের মায়া বোঝা ভার! বিপদ্‌চক্রের অনুবর্ত্তী হ'য়ে যে মায়াচক্র আমাকে ঘিরেছে, এ অবস্থায় সংসারের কোন লোকের কোন কথায়—কোন ভরসায়—কোন আশ্বাসে কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না। বিশ্বাস ক'রে আমি ঠকেছি, বারবার ঠকেছি, মিষ্টবাক্য তিক্ত হয়, এই বীরপুরুষের মিষ্টবাক্যে আমার আশ্বাস ঘুচে ভয় এলো! স্ত্রীজাতির যে বিপদ্, সংসারের সর্ব্ববিপদ্ অপেক্ষা

বড় বিপদ্, সে বিপদে রক্ষাকর্ত্তা কে? যম। আমি তখন সেই বিপদের আশঙ্কায় মনে মনে সর্ব্বকালগ্রাসী যমের আরাধনা ক'র্‌তে লাগ্‌লেম।

আমার ভয় দেখে যুবাপুরুষের মুখে ঘোর ঘটার হাসি। শেষকালে আমাকে তিনি যে কথাটী ব'ল্‌ছিলেন, বল্‌তে ব'ল্‌তে থেমে গিয়েছেন, সেই সূত্র ধ'রে আবার আরম্ভ ক'র্‌লেন, "কুঞ্জবালা! ব'ল্‌ব কি, যে কথাটী ব'ল্‌ছিলেম, শুন্‌বে কি? শুন্‌লে পরে চিন্‌তে পার্‌বে কি? না,—এখন সেটী ব'ল্‌ব না। আগে তুমি একবার আমার মুখপানে চেয়ে দেখ, ভাল ক'রে ঐ পদ্মপত্রের ঢাকন খুলে, সেই রকম আগেকার মত ভাসা ভাসা কাজলমাখা মধুরদৃষ্টিতে, আগে একবার আমার মুখের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি কর, তাতেও যদি চিন্‌তে না পার, তখন——"

আমি কি চাইতে পারি? ম'রে গেলেও না, চাইলেমনা। বার বার কতবার তিনি অনুনয় বিণয় ক'রে অনুরোধ ক'র্‌লেন, একটীবারও চাইলেম না;—পার্‌লেম না, তিনিও দেখ্‌লেন আমি পার্‌লেম না। শেষকালে আবার তখন একটু গম্ভীরভাব ধারণ ক'রে আদরের স্বরে ব'ল্‌লেন, "কুঞ্জবালা। পার্‌লে না? চাইলে না? এত ভয় কি তোমার আমায় দেখে? আমি তোমার সেই ললিতগড়ের সোমরাজ, তুমি আমাকে আহ্লাদ ক'রে সোমেশ্বর ব'লে ডাক্‌তে।"

"ললিতগড়ের সোমরাজ! আহ্লাদ কোরে সোমেশ্বর!" হা বিধাতাঃ! চিরদুঃখিনী কোরে এই অভাগিনীকে মায়ার

সংসারে পাঠিয়েছ, তাই বোলে কি অভাগিনীর প্রতি এত বঞ্চনা তোমার! প্রাণকে সাক্ষী রেখে আমি বোল্‌তে পারি, জন্মাবচ্ছিন্নে "ললিতগড়, সোমরাজ, সোমেশ্বর" এই তিন অদ্ভুত নাম কোনকালে কোন অবস্থায় একটীবারও আমার ক্ষুদ্রকর্ণে প্রবেশ করে নাই। এ ঘরটা নিশ্চয়ই জাদুঘর! এই এত বড় প্রকাণ্ড সংসারটা সমস্তই জাদুক্ষেত্র! উঃ! কি পাপে আমি এই প্রকাণ্ড জাদুক্ষেত্রে জীবনধারিণী মানবী হোয়ে জন্মেছি?—জীবন আছে বোলেই জ্ঞান আছে, জ্ঞান আছে বোলেই চৈতন্য আছে, জীবন আছে বোলেই ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার আছে। এ জীবন কি যাবে না? যম কি আমাকে ছোঁবে না? জীবন যদি না থাক্‌তো, তা হ'লে আর এ সকল লোকের কাছে কিছুতেই কোন অংশে অপরাধিনী হ'তে হ'তো না। জীবন-বিহীন হোলে এ দেহে আর মায়ামমতা কার থাকে? এই বীরপুরুষকে পরপুরুষ ব'লে এই কুঞ্জবালার জীবনশূন্য দেহের তখন আর কি কোন ভয় হোত? পৃথিবীর কোন অপর পুরুষকে দেখে, এ দেহের কি কোন রকম লজ্জা আস্‌তো? বন্ধনগৃহ থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনায়, এ দেহ কি তখন কাহারও কাছে কোন রকম ভিক্ষা চাইতো? ডাকাতে ধ'র্‌বার ভয়ে এ দেহ কি তখন কোন রকমে বিপদ্‌মুক্ত হওয়ার বাসনা রাখ্‌তো? কিছুই রাখ্‌তো না, কিছুই থাক্‌তো না। জীবন আছে, জীবন যাক্, এ যে দেখি বিষম বিভ্রাট! পাপ হয় জানি, তথাপি সেই রজনীতে, সেই গৃহে, সেই অবস্থায় মনে মনে মৃত্যুকামনা ক'র্‌লেম।

জয়মঙ্গলা আর কথা কয় না। লোকটী আমায় বোল্লেন,

"চেনা মানুষ"; যদি সরলভাবে বলে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই ভুল হোয়েছে। জয়মঙ্গলার চেনা মানুষ অবশ্যই হোতে পারেন, তা না হোলে, অত ঘোরঘটার হাসি-খুসী কি সম্ভবে? কিন্তু আমার সম্বন্ধে এ কি? কখন যদি কোন দিনের চেনা থাক্‌তো, ফুলের ভিতর মুখখানি দেখেই কিছু'না কিছু মনে আস্‌তো। সখী তিনটীকে চিন্‌তে পারি নাই, তার মানে ছিল; পূর্ব্বেই ত বোলেছি, রং মেখে এসেছিল, যোগিনীর সেবাদাসী হোয়েছে; হোলেই হয় ত রং মাখ্‌তে হয় সেটা তত ধর্ত্তব্য নয়। কিন্তু এই বীরপুরুষ এমন কথা কেন বলেন? তা ডাকাতেরা আমাকে ধরে। জনপূর্ণ পুরীর ভিতর বাস ক'র্‌লেও, খুঁজে খুঁজে সন্ধান ক'রে এসে ধরে, নানাস্থানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, মেরে ফেলে না। মতলব কি? টাকার লোভ? জন্মদুঃখিনী পথের ভিখারিণীর কাছে টাকার লোভ কিসের? যখনি ধোর্‌বে, তখনি অন্য লোকে পণ দিয়ে উদ্ধার কোর্‌বে, এটাই বা কি কথা? দয়া ভাবা অন্য লোকই বা আমার কোথায়? তবে দুই একবার যা ঘ'টেছে, সেটা ব'ল্‌তে হবে দৈবাৎ। তবেই বোঝা যাচ্ছে, শুধুই কেবল টাকার লোভ নয়, আরও কোন নিগূঢ় মতলব থাক্‌তে পারে। গোড়ায় অবশ্যই অন্য লোকের সংস্রবে কোন প্রকার ষড়যন্ত্র আছে। জাহাজে যাঁহার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল, তাঁর ভাব অন্য প্রকার। বিজনপুরীতে অন্ধকার রাত্রে আর যে এক অজ্ঞাতমূর্ত্তি আমার চক্ষে প'ড়েছিল, তাঁর মনের কোন ভাল মন্দ ভাব কিছুই জানা যায় নাই। কিন্তু এ মূর্ত্তি ত সে মূর্ত্তি নয়! ইনি তবে কে?

ইনি কি তবে ডাকাতের দলের কর্ত্তা হবেন? এমন সুন্দর চেহারা, ইনি যে ডাকাতি কর্‌বার কর্ত্তা হবেন, শীঘ্র ত এমন বিশ্বাস আসে না। ভাবগতিকে বোধ হয়, কোন প্রকার নিগূঢ় অভি-সন্ধিতে ডাকাতের দলের নিয়োগকর্ত্তা হ'তে পারেন। তাই হওয়াই সম্ভব, তা না হ'লে এত লুকোচুরি খেলা কেন? ঠাকুর-চৌকির উপর ফুল ঢাকা দিয়ে লুকিয়েই বা ব'সে থাক্‌বেন কেন? যে সূত্রটা ধরি, সেইটাতেই গোলমাল ঠেকে! জয়মঙ্গলা আমার শৈশব-সহবচরি, হিতৈষিণী প্রিয়-সহচরি, এর ভিতর জয়মঙ্গলার হাত আছে। এমন শঙ্কটসময়ে হিতৈষিণী প্রিয়-সহচরীর হাতে আমার এ কি দুর্দ্দশা! আরও এক আশ্চর্য্য! এই অপরিচিত বীরপুরুষ আমায় জানেন! নাম ধোরে ডাক্‌লেন, নাম ধোরে আদর ক'র্‌লেন, নাম ধোরে সম্ভাষণ ক'র্‌লেন, এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড কোথা থেকে হয়! নির্ব্বান্ধব পুরী! সঙ্গিনীমাত্র প্রিয়-সখী জয়মঙ্গলা। অকস্মাৎ একজন যুবাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ! এ ঘটনায় কেবল বিস্ময় আসাই ত সম্ভব! তবে এত কম্পই বা কেন? এত ভয়ই বা কিসের? প্রাণের ভিতরেই বা এমন করে কেন? আমি না কি সর্ব্বক্ষণ বিপদ্‌চক্রে ঘেরা, ভয় না কি সর্ব্বক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, সেইজন্যই—সঙ্গিনীসঙ্গে, নিভৃতকক্ষে, অপরিচিত যুবাপুরুষকে দেখে, কেবল ভয়ই অগ্র-সর হ'চ্চে। হৃদয়ে কেবল অমঙ্গলের আশঙ্কা আস্‌ছে। ঘূর্ণা ঝটিকায় সমুদ্র যেমন তোলপাড় করে, আমার বুকের ভিতর তেম্‌নি তোলপাড় হ'চ্চে। মন যেন কেবল অমঙ্গলের কথাই ব'লে দিচ্চে। আকাশ—চারিদিকেই আমি কেবল ঘোর-কৃষ্ণ-

জলদ-জালাচ্ছন্ন, গ্রহ-নক্ষত্র-পরিশূন্য ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ-চকমকি-পূর্ণ ভয়ঙ্কর অন্ধকার আকাশ অবলোকন ক'র্‌ছি। পৃথিবীর জাদু-ঘরে কি এই রকম খেলা হয়?

মনের কথা মনেই থেকে গেল। চিন্তাস্রোতে বাধা প'ড়ে গেল। যুবাপুরুষ আবার আমারে বিদ্রূপভঙ্গিতে সম্বোধন ক'রে বোল্লেন, "কুঞ্জবালা! জান্‌তেম আমি, তুমি সরলাবালা, কিন্তু দেখ্‌ছি, এই বয়সে তুমি বেশ চাতুরী শিখেছ। এত ভালবাসি আমি তোমাকে, তুমি কি না আমার কাছে নাম লুকিয়েছিলে. অন্য নামে পরিচয় দিয়েছিলে। নারীজাতী—বিশেষতঃ তোমার মত বালিকা অকারণে এমন বঞ্চনা কল্পনা ক'রে আন্‌তে পারে, এটী আমার জানা ছিল না। এখনও দেখ, এত ক'রে বিনয় ক'রে, এত পূর্ব্বকথা স্মরণ ক'রিয়ে দিয়ে, একটীবার আমার দিকে মুখ তুলে চাইতে অনুরোধ ক'র্‌ছি, কাণেও শুন্‌ছ না। এখন আমি তোমার নাম পেয়েছি, মনের কপাটও খুলে দিয়েছি, এইবার একবার চাও দেখি আমার মুখ-পানে, কও দেখি একটী সেই রকমের মধুমাখা মনের কথা, দেখদেখি একবার চেয়ে, এইবার চিন্তে পার কি না"

আমি ত অবাক্ আছি, কেবল মুখ অবাক্ নয়, বুক পর্য্যন্ত, মাথা পর্য্যন্ত, চক্ষু পর্য্যন্ত, কাণ পর্য্যন্ত অবাক্! চাতুরী শিখেছি, প্রতারণা ক'রেছি, নাম ভাঁড়িয়েছি, এ সব আবার কি সর্ব্বনেশে কথা! জয়মঙ্গলার গা ঘেঁসে ব'সেছি, বলি যদি, জয়মঙ্গলাকে এক রকমে জড়িয়ে ধোরেই র'য়েছি। বীরের আসন আমার কাছ থেকে অতি কম দুই হাত তফাৎ। হঠাৎ অঙ্গস্পর্শ ক'র্‌বার ভয়

কিছু কম। মনে ক'র্‌লেম, একবার আস্তে আস্তে চেয়ে দেখি। এত কথা ইনি ব'ল্‌ছেন, সমস্তই কি মিথ্যা হবে? সমস্ত কথাই কি সাজান?. আমার মত বালিকার কাছে সাজিয়ে সাজিয়ে এত মিথ্যা কথা ব'ল্‌বার কোন তাৎপর্য্য আছে কি? না আছেই বা কেন ক'রে ভাবি! প্রথম কথা, "ললিতগড়, সোমরাজ, সোমেশ্বর।" এ তিন কথার একটীও ত আমার মনে হয় না। তার পর আবার চাতুরী শেখা, বঞ্চনা করা, নাম ভাঁড়ানো। কৈ! জ্ঞান হ'য়ে অবধি কখনও ত কাহারও কাছে নাম ভাঁড়িয়ে নূতন পরিচয় আমি দি নাই! তবে এ সব মিথ্যা কথা নয় ত কি? হয় হবে মিথ্যা হবে, যাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে তাঁরই হবে, আমি ত তাতে মিথ্যাবাদিনী হব না। এত কথা যখন ব'ল্‌ছেন, এত ঘনিষ্ঠতা যখন জানাচ্ছেন, ভুলেই হোক্ অথবা কপটেই হোক্, এত আত্মীয়তা যখন জানাচ্ছেন, তখন নিতান্ত অপরাধিনীর মত মুখ বুজে, চক্ষু বুজে এক ঘরের ভিতর ব'সে থাকা ভাল হয় না। একটা কিছু উত্তর না করাও ভাল দেখায় না, একটীবার চেয়ে দেখি—মনে ক'র্‌লেম চেয়ে দেখি, কিন্তু চক্ষু আবার অবাধ্য হোল চাইতে চায় না। সাহসে বুক বাঁধ্‌লেম, সত্য সত্য জয়মঙ্গলাকে জড়িয়ে ধ'রে মুখ তুলে, ঘাড় বেঁকিয়ে, ধীরে ধীরে সেই বীরপুরুষের দিকে বক্রনয়নে একবার দৃষ্টিপাত ক'র্‌লেম।

সানন্দে করতালি দিয়ে, সাহস্যবদনে বীরপুরুষ ব'লে উঠ্‌লেন, "বাহবা, বাহবা, বাহবা।" সূর্য্যতাপে পদ্মকুঁড়ি এতক্ষণে এই যে বেশ প্রফুল্ল হ'য়ে ফুটে উঠ্‌লো।

উক্তি শুনে লজ্জায় আমি আবার অবনতমুখী হ'লেম। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিলেম না, ফুলের ভিতর দেখেছি, তার পরেও আতঙ্কে আতঙ্কে আরও দু একবার চেয়েছি, এখনও আবার চাইলেম, কিছুমাত্র মনে ক'র্‌তে পার্‌লেম না। আবার চাইলেম, মনকে সুস্থির ক'রে, বিস্তৃতনয়নে নিস্পন্দভাবে মুহূর্ত্তকাল চেয়ে থাক্‌লেম, চিন্‌তে পার্‌লেম না। ঠাউরে ঠাউরে অনেক ভেবেচিন্তে অনেক পূর্ব্বকথা মনে ক'র্‌লেম, সে রূপ, সে মূর্ত্তি কস্মিন্‌কালে কোথাও চক্ষে দেখেছি, এমন ভাব কিছুতেই মনে হোলনা। জয়মঙ্গলা কথা কয় না, ভঙ্গিতে প্রকাশ, একবার সেই যুবাপুরুষের মুখের দিকে, এক একবার সকৌতুকে আমার দিকে উৎফুল্লনয়নে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছে। দেখ্‌ছে আর টিপি টিপি মুখ টিপি টিপি হাস্‌ছে। অন্য সময়ে সে ভাব দেখ্‌লে আমার মনে হয় ত আহ্লাদ হোত, কিন্তু তখন কেবল রাগ হোতে লাগ্‌লো। রাগ ক'রেই বা কার কি ক'র্‌তে পারি? ক্ষণকালের জন্য লজ্জাকে সঙ্কোচ ক'রে, অঙ্গীভূত ভয়কে কিঞ্চিৎ তফাতে সরিয়ে রেখে সাহসে আশ্বাসে, হৃদয়কে একটু আশ্বস্ত ক'রে, আমিই কথা কইলেম।

মৃদুস্বরে, ধীরে ধীরে, অর্দ্ধকম্পিতগাত্রে বীরপুরুষকে সম্বোধন ক'রে আমি ব'ল্‌লেম, "আপনি বার বার ওরকম কি সব কথা ব'ল্‌ছেন? আপনার কথা আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, একটীও না।

তা এখন পার্‌বে কেন? হাস্য ক'রে বক্রস্বরে বীরপুরুষ ব'ললেন, "তা এখন পার্‌বে কেন? তোমার এখন দিন

ফিরেছে, কাল ফিরেছে, সখী মিলেছে, দিব্য কুঞ্জপুরীতে বাস ক'র্‌ছো, এখন আর এই সামান্য লোকের কথা সহজে কি বুঝ্‌তে পার?"

কথাগুলি আমার বুকে বড় বাজ্‌লো। ছল্ ছল্ নয়নে উত্তর ক'র্‌লেম, দেখুন্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি চিরদুঃখিনী, চিরদিনের অভাগিনী, সুখের মুখ কেমন জন্মাবধি আমি তা দেখি নাই। ত্রিসংসারে আমারে, আমার ব'ল্‌বার কেহ নাই। যদি কিছু থাকে, সে কেবল ভয়ানক ভয়ানক সাংঘাতিক করাল-মূর্ত্তি মহা মহা বিপদ্। আপনি আর আমাকে ওরকম বাক্যযন্ত্রণা দিবেন না, মিছামিছি দুঃখিনীকে অপরাধিনী ক'র্‌বেন না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আত্মাপুরুষকে সাক্ষী রেখে আমি ব'ল্‌ছি, জন্মাবধি কখন আমি আপনাকে দেখি নাই; আপনার ভুল হ'চ্ছে, যে সব পূর্ব্বকথা আপনি স্মরণ করিয়ে দিবার চেষ্টা পাচ্ছেন, কস্মিন্‌কালেও সে সব কথার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। কারে আপনি ললিতগড়ে দেখেছেন, কার সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় হ'য়েছিল, কে আপনাকে আদর ক'রে সোমেশ্বর ব'লে ডাক্‌ত, কে আপনার কাছে কি নাম ব'লে পরিচয় দিয়েছিল, আপনি হয় ত তা ভুলে গেছেন। সে আমি নই। ওসব কথার কিছুই আমি জানি না। কিছুমাত্র অঙ্কুর যদি পেতেম, সাদা কাল একটুও আভাস যদি আস্‌তো, তা হ'লে অবশ্য না অবশ্য আমি আপনাকে চিন্‌তে পার্‌তেম।

হঠাৎ বীরপুরুষের প্রফুল্ল মুখখানি ম্লান হ'য়ে গেল। সজোরে টেনে টেনে তিনি একটী বহুক্ষণস্থায়ী বিশাল দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ক'র্লেন। কাতরনয়নে আমার মুখের দিকে চেয়ে ক্ষুণ্ণস্বরে আক্ষেপ ক'রে বল্লেন, "সকলই অদৃষ্টের ফের।"

আমার প্রাণে ব্যথা লাগ্লো। আমিও সকাতরে ক্ষুণ্ণস্বরে ব'ল্লেম, কেন আপ্সোস করেন? ক্ষমা করুন। সত্য কথা ব'ল্তে কি, আপনাকে দেখে আমি ভয় পেয়েছি, চিন্তে পার্ছিনা, অথচ আপনি পুনঃ পুনঃ জেদ ক'রে, ব'ল্ছেন, চেনা। রাগ ক'র্বেন না আমার কথায়! প্রাণে আমার ব্যথা লেগেছে। আপনি ব'ল্ছেন, 'আমি চাতুরী শিখেছি, প্রতারণা ক'রেছি, নাম ভাঁড়িয়েছি, এত সৃষ্টি ক'রেছি, কিন্তু মহাশয়! আপনি শপথ মানেন? আমি শথপ ক'রে ব'ল্ছি, আমি এই বেঁচে আছি, আপনি এই ব'সে আছেন, এটা যেমন সত্য, আপ্নাকে আমি চিন্তে পার্ছি না, জন্মেও কখন আপনাকে আমি দেখি নাই, ঠিক্ জান্বেন, এটাও তেম্নি সত্য। রাগ ক'র্বেন না আমার কথায়। আপনিই বরং আমার সঙ্গে প্রতারণা খেল্ছেন, তা নইলে এ রকম লুকোচুরি খেলা কেন? আর সব ছেড়ে দিয়ে একটা মোটা কথায় বলি, প্রতারণা যদি না থাক্বে, তবে আপনি এই অন্ধকার মহলে, এই রাত্রিকালে, একাকী এই বিজন কক্ষে, কুল ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে ব'সেছিলেন কেন? দ্বারেই বা চাবি দিলেন কেন?

সর্পের লাঙ্গুলে পাদস্পর্শ ক'র্‌লে, সে যেমন তীরবেগে চঞ্চল হ'য়ে উঠে, আমার ঐ সত্য উক্তিতে, এতক্ষণের বহুভাষী সেই বীরবেশী যুবাপুরুষ, সেই রকম চঞ্চল হ'য়ে, বিড়্ বিড়্ ক'রে কি ব'ক্‌তে ব'ক্‌তে, তৎক্ষণাৎ আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কুটীলনেত্রে আমাদের দুজনের দিকে চেয়ে, স্তম্ভিত-স্তম্ভিত অস্ফুটস্বরে থেমে থেমে ব'ল্‌লেন, "জয়মঙ্গলা! বড় সাজা পেলেম! আজ্ তোমরা ঘরে যাও। কুঞ্জবালা সত্য ব'ল্‌ছে কি মিথ্যা ব'ল্‌ছে, রাত্রে তা আমি বুঝ্‌ব না, দিনমানে সূর্য্যের আলোতে এর পরীক্ষা হবে।"

এইরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা ক'রেই, বীরপুরুষ চঞ্চল পদে দরজার কাছে অগ্রসর হ'য়ে, খট্ খট্ শব্দে চাবি খুলে ফেল্লেন। তিন জনেই আমরা ঘর থেকে বেরুলেম। বাতী হাতে ক'রে তিন তবক পার হ'য়ে, তিনি সেই মহলের অন্যদিকে, অন্য এক ঘরে প্রবেশ ক'র্‌লেন, আমরা সদর দরজার দিকে এগিয়ে এগিয়ে চ'ল্‌লেম; অনুগ্রহের মধ্যে এই হোল, বাতিটা তিনি জয়মঙ্গলার হাতে দিলেন, নিজে অন্ধকারের সঙ্গে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

দশম তরঙ্গ।

দুখানা চিঠি।

রাত্রি প্রভাত। গত প্রভাতে যে ঘরে, যে খানে, যে বিছানায় শুয়ে আছি দেখেছিলেম, আজকার প্রভাতেও সেই ঘরে, সেই খানে, সেই বিছানায় শুয়ে আছি। কেহ নিকটে নাই, একাকিনী আছি। পাঠক মহাশয়কে শুনাতে পারা যায়, রাত্রিকালে এমন নূতন ঘটনা কিছুই হয় নাই। ঠাকুরবাড়ী থেকে ফিরে এসে, মঙ্গলাতে আমাতে আমারই এই শয়ন ঘরে প্রবেশ করি, রাত্রি তখন একপ্রহর অতীত। মঙ্গলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার বিছনার কাছে ব'সেছিল। আমি শুয়েছিলেম। ফুল ঢাকা সেই বীরপুরুষটী নিশ্চয়ই আমার চেনা মানুষ; বীরপুরুষের মুখের কথাগুলিকে যুদ্ধাস্ত্র ক'রে, সেই কথা স্বীকার করাবার জন্যে, মঙ্গলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছিল। আমি চিনি, এই কথাটী আমার মুখে বলাবার জন্যে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জেদাজেদি ঝুলোঝুলি ক'রেছিল। আমি শুয়েছিলেম,—চক্ষু বুজে শুয়েছিলেম;—ঘুম হয় না,—যার মনে একটা কোন দুশ্চিন্তা জাগে, তারই চক্ষে ঘুম আসে না; আমি ত শতমুখী চিন্তার অগ্নিকুণ্ড-বাসিনী, ঘুম আমার কাছে অপরিচিত, মাঝে মাঝে একবার একবার একটু একটু আবল্য আসে,—

নিদ্রা বলা যায় না, তন্দ্রা বলা যায় না, জাগন্ত্ও বলা যায় না, আচ্ছন্নতা। সেই আচ্ছন্নতার ভিতর কত রকম বিকট বিকট স্বপ্ন দেখি। যখন শয়ন করি, ঘরে তখন আলো থাকে না; কিন্তু আমি যেন এক—একবার দেখি, ঘর আলোময়! সেই আলোর ভিতর যেন কোন মানুষের ছায়া, পা টিপে টিপে আমার বিছানার দিকে এগিয়ে এগিয়ে আস্‌চে। এক একবার মনে হয়, ঘর যেমন অন্ধকার, তেম্‌নি অন্ধকারই আছে। সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে প্রকাণ্ড একখানা মুখ, প্রকাণ্ড একখানা হাত বাহির ক'রে, আমার গলা টিপে ধ'রেচে। এক একবার দেখি, যমদূতের মত দুটো কাল মানুষ, বেলা দুই প্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রে একটা ত্রিপান্তর মাঠ দিয়ে, আমাকে হিড়্‌ হিড়্‌ ক'রে টেনে নিয়ে চ'লেছে। আতঙ্কে আমি আঁৎকে উঠি! গত রাত্রেও শুয়ে শুয়ে চক্ষু বুজে ঐ রকম এক একটা বিভীষিকা দেখ্‌ছি,—জয়মঙ্গলা চুপি চুপি কখন উঠে গেছে, কিছুই জান্‌তে পারি না। প্রভাতে আমি একাকিনী। ভেবেছিলেম, হয় ত থাক্‌বে, কিন্তু ছিল না; নাই—আমি একাকিনী। দুঃখের কথা যতই বলি, চিরদুঃখিনী কি না,—দুঃখের কথা যতই বলি, ততই আরও বেশী দুঃখ মনে আসে। সূতিকাঘরে ভূমিষ্ঠ হবার দিন থেকে, গত রাত্রি পর্য্যন্ত, যতগুলি রাত্রি আমার মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে, মিলিয়ে দেখ্‌লে তার মধ্যে বহু রাত্রিই আমার ঐ রকম অনিদ্রায়, বিভীষিকা দেখে দেখেই কেটেছে, ঐ রকমই কাটে।

প্রভাত আমার নূতন নয়। প্রভাতে আর অন্য কোন

নূতন ভাবনা নিমন্ত্রণে এলো না, কিন্তু পৃথিবীর একটা আশ্চর্য্য খেলা বড় চমৎকার! যে দিন কোন নূতন ভাবনা, নূতন প্রত্যাশা মনে, জ্ঞানে, কল্পনাপথেও আনা যায় না, সেই দিন যেন অভাবনীয়রূপে, অভাবনীয় ঘটনায়, এক একটা অকস্মাৎ নূতন ঘটনা ঘোটেই ব'সেছে। বেলা হ'লো, সূর্য্যদেব আরক্ত-মূর্ত্তি পরিত্যাগ ক'রে, তেজোময় রজত-কিরণে শীতল পৃথিবীকে উত্তপ্ত ক'র্‌বার উপক্রম ক'র্‌লেন। জয়মঙ্গলা এলো না। আমি শয্যা পরিত্যাগ ক'ল্লেম। বারাণ্ডায় এলেম, বেরুলেম্; দেখ্‌লেম, অন্য মনস্কে ছাই ভস্ম কত কি ভাব্‌লেম, জয়মঙ্গলা এলো না। বেলা প্রায় চার্‌দণ্ড। ক্রমশই আমি চঞ্চল হোতে লাগ্‌লেম। একবার চঞ্চল হোয়ে ঘরে যাই, একবার ছুটে বাহিরে আসি, একবার আস্তে আস্তে বারাণ্ডায় বেড়াই, একবার দৌড়ে গিয়ে সিঁড়ির দরজায় দাঁড়াই। এই রকমে আরও দু দণ্ড কেটে গেল। দিনের বেলা আমার চক্ষে কতই যেন অন্ধকার! এইবার বোধ হয় চাঁদ উঠ্‌বে। শেষবার সবে আমি সিঁড়ির দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, বেলা প্রায় এক প্রহরের কাছা-কাছি, সিঁড়িতে জয়মঙ্গলার উদয়। জয়মঙ্গলা হাসিমুখী, জয়মঙ্গলা যেন চাঁদ! জয়মঙ্গলা সহাস্যমুখে, চঞ্চলপদে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আস্‌ছে। ডান হাতখানি সন্তর্পণে মুঠো করা। কাছে আস্‌বার তিন চার্‌টে সিঁড়ি বাকী থাক্‌তে থাক্‌তে, আহ্লাদে মুখ ঘুরিয়ে জয়মঙ্গলা হাস্‌তে হাস্‌তে ডেকে ডেকে আমাকে ব'ল্‌লে, "ওরে! কাল রাত্রের সেই বীরপুরুষটা পালিয়েছে!" ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে তিন লাফে জয়মঙ্গলা ছুটে আমার কাছে এলো,

সিঁড়ির মাথার উপরে দুজনে আমরা মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়ালেম। জয়মঙ্গলা হাস্‌তে হাস্‌তে আবার আরম্ভ ক'র্‌লে। "তুই তাকে যে রকম নাস্তা নাবুদ ক'র্‌লি,—আগে ত লজ্জাবতী লতার মত হুতাশেই শুকিয়ে গেলি, শেষে আবার মুখের উপর শক্ত শক্ত কথাগুলো ব'ল্‌লি, সেই লজ্জাতেই সে পালিয়েছে। রাগ ক'রে পালায়নি,—সত্য ভাই!' সে বড় দুঃখ পেয়েছে! তুমি তাকে চিন্‌তে পার আর নাই পার, সে কিন্তু তোমাকে বড় ভাল বেসেছে। এই দেখ, এরিই মধ্যে চিঠি লিখেছে। দুখানা চিঠি এসেছে! একখানা দাদা লিখেছেন সোমরাজকে, আর একখানা সোমরাজ লিখেছেন আমাকে। এই কথা ব'লে জয়মঙ্গলা ডান হাতের মুঠো খুলে দুখানা চিঠি আমাকে দেখালে। ওদের ঘরের কথা আমাকে যদি না বলে, চিঠি যদি না দেখায়, সে কথা আমি ব'ল্‌ব কেন? দরকারই বা কি? সংসারে কিছুই আমার ভাল লাগেনা। পরের চিঠির খোঁজ খবরে আমার কাজ কি? শুধুই কেবল শুষ্ক কথায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, কি লিখেছে?

জয়মঙ্গলা আমার হাত ধ'রে টেনে, হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্‌লে, "এই দেখ্‌বে এসো। সোমরাজ আমাকে বড় মজার মজার সব কথা লিখেছে; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ত চিঠি পড়া ভাল হবে না, ঘরে এসো।"

আমরা দুজনে ঘরে প্রবেশ ক'র্‌লেম। জয়মঙ্গলা চিঠি দুখানি আমার হাতে দিলে। কাহারো হাতের লেখার উপর চক্ষু দিতে আমার ভয় হয়! চক্ষু বুজে ফিরিয়ে দিয়ে জয়মঙ্গলা-

কেই প'ড়তে ব'ললেম। জয়মঙ্গলা খুব সাবধানি মেয়ে, ছুটে গিয়ে সিঁড়ির দরজায় শিকল দিয়ে এলো। মৃদুকণ্ঠে, ধীরে ধীরে—কেবল আমি শুনি আর আপনি শুনে, ঠিক্ সেই রকম ভাবে জয়মঙ্গলা সেই চিঠি দুখানি স্পষ্ট স্পষ্ট ক'রে প'ড়লে। যাঁরে বলে সোমরাজ, তাঁর লেখা চিঠি খানি প'ড়তে প'ড়তে হেসে হেসে লুটোপুটী খেলে! সোমরাজের চিঠিতে লেখা ছিল :—

"কল্যাণময়ি! শ্রীমতী জয়মঙ্গলা দেবী।

ভগ্নি! হঠাৎ আমি চলিয়া আসিয়াছি, বলিয়া আসিতে পারি নাই। বারাণসীর মহারাজের বাটীতে বড় বড় ওমরাহ লোকের মজলিস্। জমিদারী মহলের নূতন বন্দোবস্তের মীমাংসা। রত্নগড়ের রাজার প্রতিনিধি হইয়া আমাকে এই মজলিসে উপস্থিত থাকিতে হইবে ; কতদিন বিলম্ব হয় বলিতে পারিনা। যত শীঘ্র পারি, যাইবার চেষ্টা করিব। এই কয়দিন তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, তোমার দাদাকে দেওয়ানজীকে পত্র লিখিব। তোমরা কোন প্রকার আশঙ্কা করিও না।

কুঞ্জবালাকে ছাড়িয়া দিওনা। আমার নাম করিয়া কুঞ্জবালাকে বলিও, আমি তাহার কাছে অপরাধী হইয়াছি। কুঞ্জবালা আমাকে চিনিতে পারিল না, সে কেবল আমারই অদৃষ্টের দোষ। কুঞ্জবালার দোষ নয়। কুঞ্জবালাকে বলিও, কুঞ্জবালা আমাকে ভুলিলেও আমি কুঞ্জবালাকে ভুলিব না। কুঞ্জবালাকে যে চক্ষে আমি দেখিয়াছি, সে চক্ষু তুলিয়া না ফেলিলে, কি রকমে কুঞ্জবালাকে ভুলিয়া যাইব, এখান হইতে ফিরিয়া যাইয়া কুঞ্জবালাকে তাহার উপায় আমি জিজ্ঞাসা করিব।

তোমরা সাবধানে থাকিও, তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলাম।”

স্নেহাস্পদ

শ্রীসোমরাজ——

উঃ! ভ্রান্তলোকের ভ্রান্তি চিরদিন সমান! আমাকে উপলক্ষ ক’রে এ চিঠিতে যতগুলি কথা লেখা হ’য়েছে, সব কথাগুলিই মানসের ভ্রান্তি। অক্ষরগুলি পর্য্যন্ত ভ্রান্তি। সে সব কথায় বড় একটা আমি কাণ দিলেম না। ভাল মন্দ কিছুই বোল্লেম না, চিঠি শুনে কেবল এই ফলটুকু পেলেম, সোমরাজের পরিচয়ের কতকটা আভাস লাভ হ’লো। জয়মঙ্গলা আবার এই সময় ঐ চিঠির প্রসঙ্গে, সেই আভাসটুকু ভাল ক’রে ভেঙে দিলে। যিনি সোমরাজ, তিনি জয়মঙ্গলার জ্যেষ্ঠভ্রাতার পরম বন্ধু। দিনকতকের জন্য সোমরাজ এই পুরীর অভিভাবক হ’য়েছেন। পুরীখানি জয়মঙ্গলার পিতার। পিতা নাই, একটীমাত্র সহোদর, সহোদরের নাম ললিতানন্দ সামন্ত। তিনি সস্ত্রীক তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা ক’রেছেন, প্রাণের বন্ধু সোমরাজকে নিজপুরীর রক্ষক রেখে গেছেন।

পরিচয় ত এই রকম বুঝ্‌লেম। যাঁর সঙ্গে জাহাজে উঠে পূর্ব্বে আমি এই পুরীতে এসেছিলেম, তিনিই ললিতানন্দ। উঃ! প্রাণ কেন এমন করে! ললিতানন্দ সস্ত্রীক তীর্থদর্শনে গেছেন। সস্ত্রীক! মন কেন বিচলিত হয়!

প্রসঙ্গটা চাপা পড়াই ভাল। এক চিঠির প্রসঙ্গে অনেক বাজে কথা এসে প’ড়েছে। আমার সম্বন্ধে ও সকল কথা

বাজে কথা হওয়াই ভাল। ললিতানন্দের চিঠিতে কি কি কথা লেখা আছে, সেই গুলি এইখানে পাঠক মহাশয়কে জানাই ;—

"সুহৃদ্বর!—

শ্রীযুক্ত সোমরাজ সিদ্ধেশ্বর।

প্রাণপ্রতিম মিত্রবরেষু।

মিত্রবর! আমরা শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। প্রাণাধিকা জয়তারা আমাদের সঙ্গে আসিবার নিমিত্ত অনেক কাঁদিয়াছিল, শীঘ্র আসিব বলিয়া প্রবোধ দিয়া আসিয়াছি; কিন্তু দেখিতেছি, ফিরিয়া যাইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে। অতএব তাহাকে লইয়া আসা আমার ইচ্ছা। কিন্তু তোমার মিত্রাণী এক সঙ্গে তিনটীকে লইয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত। দুইজন বিশ্বাসী ব্রজবাসী পাঠাইতেছি, ইহাঁরা আমাদের বাড়ীতে অনেক-বার গিয়াছেন. ইহাঁদের সহিত তাহাদের তিনটীকে পাঠাইয়া দিও। তোমার নিজের মন প্রত্যয়ের জন্য বরং একজন অপর স্ত্রীলোক সঙ্গে দিও। যেরূপ যান বাহনের সুবিধা হয়, তুমিই তাহার ব্যবস্থা করিও। ইহাঁরা তীর্থপথের পাকা লোক, তোমার উপদেশমত ইহাঁরাই সমস্ত জোগাড় করিয়া লইতে পারিবেন। পাঠাইতে বিলম্ব অথবা অন্যমত করিও না। ইহাঁরা কাজের লোক, বিলম্ব হইলে কার্য্য ক্ষতি হইবে। তোমার মিত্রাণী ঠাকুরাণীও হাঁপাইয়া সারা হইবেন।

জগদীশ তোমার মঙ্গল করুন্। চিরভার তোমার, আপাততঃ কিঞ্চিৎ ভার লাঘব করিলাম। ইতি—

তোমার—শ্রীললিতানন্দ।

এ পত্র পেয়ে জয়মঙ্গলার আহ্লাদ হোলো। যাঁর নামে পত্র, তিনি উপস্থিত নাই। তিনি পত্র লিখ্ছেন, ফিরে না আসা পর্য্যন্ত দেওয়ানজীর অধীনে থাক্‌তে হবে, দাদা লিখ্‌ছেন, বৃন্দাবনে যেতে হবে। কোন্ কথাটা বড় ? জয়মঙ্গলা একটু চিন্তা ক'রে স্থির কোল্লে, দেওয়ানজীকে বোলে দাদার কথাটা বড় কোল্লে, সোমরাজকে ছোট করা হবে না। সোমরাজ দেওয়ানজীকে চিঠি লিখ্ছেন, সে বিলম্ব জয়মঙ্গলার সইল না। যে লোক সোমরাজের পত্র এনেছিল, সে লোক চ'লে গেছে, ব্রজবাসীরা অপেক্ষা ক'র্‌ছে, আজই রওনা হওয়া জয়মঙ্গলার ইচ্ছা।

দেওয়ানজী নিত্য নিত্য এক একবার বাড়ীতে এসে দেখা করেন, সেই অবসরটুকু মাত্র অপেক্ষা।

জয়মঙ্গলা একবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জয়লক্ষ্মী আর জয়তারা কোথায়, আমি কিছুই জানি না। প্রায় দুই দণ্ড পরে জয়মঙ্গলা ফিরে এলো। আমাদের নিত্যক্রিয়া স্নান আহার যথাসম্ভব সারা হোল। সেই দুটী ভগ্নীও একটু বিলম্বে হাস্‌তে হাস্‌তে আমাদের কাছে দেখা দিলে। আর সেই যোগিনী—জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লেম, যোগিনী নাই। যোগিনী একস্থানে থাকে না, বাতাসবিহারী জীবকুলের মত শূন্যে শূন্যে উড়ে বেড়ায়। যখন ইচ্ছা হয়, হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ে।

যোগিনী এখন নাই। জয়মঙ্গলা ইতিমধ্যে দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা ক'রে, পত্র দেখিয়ে, ব্রজবাসী দেখিয়ে, অনুমতি

হাত ক'রেছে। অপরাহ্লে যাত্রা করা অপরামর্শ ব'লে দেওয়ানজী না কি প্রথমে একটু আপত্তি ক'রেছিলেন, ব্রজবাসীরা সাহস ক'রে অভয় দেওয়াতে, সে আপত্তি ঘুচে গেছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যাত্রা।

আমি তবে কোথায় থাকি? এ ভাবনা জয়মঙ্গলাকে জানাতে হোল না। তিন ভগ্নীতেই একমতে স্থির কোল্লেম, আমিও যাব। আমারও মনে মনে ইচ্ছা হ'য়েছিল, দিনকতক বৃন্দাবনে গিয়ে জুড়াব। সেখানে আর দস্যুচক্র শীঘ্র সন্ধান ক'রে ধ'র্‌তে পার্‌বে না।

দেওয়ানজী নৌকা ক'রে দিলেন। তীর্থপথ জানা শোনা, বয়োধিকা একটী চতুরা স্ত্রীলোককে সহচারিণী ক'রে দিলেন, আমরা বেরুলেম। চিঠি দুখানি জয়মঙ্গলার আঁচলেই বাঁধা থাক্‌লো। একমাত্র দেওয়ানজী সেই বিজন পুরীর রক্ষক থাক্‌লেন।

একাদশ তরঙ্গ।

কুরঙ্গিণী ফাঁদে।

আমরা বেরুলেম। জয়মঙ্গলা আপনাদের যথাসম্ভব সম্বল-পত্র সঙ্গে ক'রে নিয়েছে। আমার সম্বলপত্রের মধ্যে কেবল আমি, আর আমার অদৃষ্ট। আমরাও নৌকা আরোহণ

ক'ল্লেম। কোথায় যাই, দেখ্‌তে পার্‌বেন না ব'লেই যেন, সূর্য্যদেব অস্তাচলের পেছনে লুকালেন। সন্ধ্যা হোল।

ভরা সন্ধ্যাকালে দাঁড়ি মাঝিরা আমাদের নৌকা খুলে দিলে। ব্রজবাসীরা নৌকার ছত্রীর উপর পা ঝুলিয়ে বোস্‌লো। ভিতরে আমরা পাঁচটী মেয়ে মানুষ।

নৌকা খানিকদূর গিয়েছে। আন্দাজ বড় জোর এক ক্রোশ কি দেড় ক্রোশ। একজন ব্রজবাসী তাড়াতাড়ি সদর্পে লাফিয়ে প'ড়ে দাড়ি গোঁফ ফুলিয়ে সক্রোধগর্জ্জনে নৌকার দাঁড়ি মাঝির সঙ্গে ঘোরতর কলহ আরম্ভ ক'র্‌লে। "তোদের নৌকা চলে না, তোদের নৌকায় যাব না, তোদের নৌকায় আট দাঁড়, আমাদের ষোল দাঁড়ের হুকুম, তোরা আমাদের তুলে দে, আমরা এখনি ময়ূরপঙ্খীর মত ভাল নৌকা ভাড়া ক'র্‌ছি।" দ্বিতীয় ব্রজবাসীও একলম্ফে তাদের সম্মুখে গিয়ে ঐ রকমে হেঁকে হেঁকে ঐ সকল বাক্যের প্রতিধ্বনি ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

দাঁড়িরা এদিকে রাগে রাগে ফুলে ফুলে, দাঁতে দাঁতে ওষ্ঠ দংশন ক'রে, জলের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে প'ড়ে, প্রাণপণ শক্তিতে জোরে জোরে দাঁড় টান্‌তে আরম্ভ কোল্লে। মাঝি ওদিকে গদিয়ানের মত হাল ধ'রে ব'সে আপনা আপনি গজ্‌ গজ্‌ ক'রে কি বোক্‌তে লাগ্‌লো। গণ্ডগোলে যোগ দিলে না।

নৌকা থামে না, তীরের দিকেও আসে না। একজন ব্রজবাসী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, আস্ফালন ক'র্‌তে ক'র্‌তে, ঝুপ্‌ ক'রে জলে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়্‌লো। নৌকার কাছি ধ'রে হিড়্‌ হিড়্‌ কোরে কূলের দিকে টান্‌তে আরম্ভ কোল্লে। "ঘাল্‌ হবে—ঘাল্‌

হবে, ডুবে যাবে—ডুবে যাবে" বার বার এই কথা বোলে, দাঁড়ি মাঝিরা চীৎকার শব্দে জল কাঁপাতে লাগ্‌লো। কাছিটানা ব্রজবাসী সে সব কথায় ভ্রুক্ষেপও কোল্লে না। নৌকাখানা নাচ্‌তে নাচ্‌তে, দুল্‌তে দুল্‌তে কিনারায় গিয়ে লাগ্‌লো। দ্বিতীয় ব্রজবাসীও এক লাফে ডাঙ্গায় গিয়ে দাঁড়ালো। "নেমে এসো তোমরা, উঠে এসো তোমরা, এ বেটাদের অচল কাঠের লা, এ লা চ'ল্‌বে না।" দাঁড়ি মাঝিরা কিছুতেই আমাদের নাম্‌তে দিবে না, ব্রজবাসীরাও ছাড়্‌বে না, গণ্ডগোল আরও বেড়ে উঠ্‌লো। ব্রজবাসীদের হাতে লাঠী থাকে, ইহাদেরও লাঠি ছিল, গায়ে জোরও বেশী। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দাঙ্গার উপক্রম হ'য়ে উঠ্‌লো। "আমার লায়ে এসো—আমার লায়ে এসো" এই কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে, আর একখানা ঝাঁপফেলা নৌকার ভীষণ কৃষ্ণকায় একজন দীর্ঘাকার বলবান্‌ মাঝি, আমাদের নৌকার দিকে ছুটে এলো। সঙ্গে সঙ্গে আরও চার পাঁচজন অনুবল দাঁড়ি—প্রকৃত দাঙ্গার উপক্রম। বেগতিক দেখে, সাবেক নৌকার দাঁড়ি মাঝিরা অগত্যা নিরস্ত হোল। বড় ব্রজবাসী একে একে আমাদের হাত ধোরে নামিয়ে, বাঁকামুখে সেই নৌকার উপর ঝনাৎ ক'রে দুটো টাকা ফেলে দিলে। একে একে আমাদের হাত ধোরে ধোরে নূতন নৌকায় তুল্লে। সেই নৌকায় উঠেই হঠাৎ আমার ডান চক্ষু নেচে উঠ্‌লো। নৌকার ভিতর যেন আগুনের ফোয়ারা জ্ব'ল্‌ছে, এম্‌নি বোধ হ'তে লাগ্‌লো। কারণ কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না, কিন্তু প্রাণ যেন ধড়্‌ফড়্‌ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। মন যেন কেবল অমঙ্গল

গাইতে লাগ্‌লো। সখীদের মুখপানে চেয়ে দেখ্‌লেম। ভাবে বুঝ্‌লেম, তারা আমার মত বিপদের ভাবনা ভাব্‌ছে না। যে স্ত্রীলোকটী সঙ্গিণী হ'য়ে এসেছে, তার মুখেও কোন রকম ভয়ের লক্ষণ নাই। কেবল আমারই প্রাণ যেন বিপদ্‌সাগরে ভাস্‌ছে।

সত্যই এ নৌকায় ষোল দাঁড়। দাঁড়িরা যেন মদমত্ত হাতির মত মরিয়া হোয়ে, ঝপাঝপ্ শব্দে দাঁড় টান্‌ছে। নৌকাখানা যেন তীরের মত ছুটেছে। চারিদিকে ঝাঁপ ফেলা বন্ধ খোপের ভিতর আমরা লুকিয়ে ব'সে আছি। কেহই আমাদের দেখ্‌তে পাচ্ছে না। ব্রজবাসীরা নিস্তব্ধ হোয়ে ছাতের উপর ব'সে আছে। নৌকা সন্ সন্ ক'রে ছুটেছে! রাত্রি প্রায় এক প্রহর।

কোন্ দিকে যাচ্ছে, কোন্ পথ ধ'রেছে, আমরা কিছুই জানি না। নদীটার এখানে দুই দিকে দুই শাখা। বামের দিকে আমরা ভাস্‌ছি, এইরূপ অনুভব ক'রে আমাদের সেই নূতন সঙ্গিনী দুই হাত দিয়ে এক ধারের ঝাঁপ একটু সরালে। এদিক্ ওদিক্ উঁকি মেরে চেয়ে চেয়ে যেন কি সন্দেহ ক'রে, চীৎকারস্বরে ডেকে ডেকে বোল্লে, "ওগো! তোমরা এদিকে কোথায় যাও? এ পথ কেন? পথ ভুলেছ না কি? ডান দিক্ ধর না!"

কেহই কথা কইলে না। দাঁড়িরা বরং আরও জোরে দাঁড় টান্‌তে লাগ্‌লো। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আহ্লাদস্বরে গান আরম্ভ কোল্লে। আমাদের সঙ্গিনীটী ক্রমাগতই চেঁচাচ্ছে। "ওগো এ পথ নয়, ও পথ ধর।" যেন কেঁদে মিনতি কোরে বার বার ঐ সব কথাই ব'ল্‌ছে। যেন কতই ভয় পাচ্ছে,—কেন ভয়

পাচ্চে, তা তখন বুঝ্‌তে পারি নাই। কিন্তু তার ভাব-ভঙ্গী দেখে বুঝেছিলেম, ভয় পাচ্ছে। যেন বাঘের মত নৌকার ছাতের উপর ঝুঁকে প'ড়ে, মাঝি একটা বিকট চীৎকার কোরে ধমক্ দিলে, "ভাল মানুষের মেয়ে!" থতমত খেয়ে মুখখানি গুটিয়ে নিয়ে স্ত্রীলোকটী নৌকার ভিতর ছট্‌ফট্ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। নৌকা ক্রমাগতই সেই দিকে চ'লেছে। স্ত্রীলোকটী আর বেশীক্ষণ তত চঞ্চল হোয়ে নৌকার ভিতর তিষ্ঠিতে পার্‌লে না। দাঁড়িরা যে দিকে বোসে দাঁড় টান্‌ছিল, সচঞ্চলে সেই দিকে গিয়ে, ছুটে বেরুলো। চীৎকারস্বরে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, "থামা নৌকা, থামা নৌকা, পথ আমি চিনি, কোথায় তোরা নিয়ে যাস্? আমি সব জানি, ওদিকের দুধারে কেবল বন জঙ্গল। শুনেছি, সব বনের ভিতর ডাকাত থাকে, তোরা যদি——"

রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে হাল গাছটা ফেলে রেখে, এক লাফে নৌকার ছাত ডিঙ্গিয়ে রক্তমুখ মাঝি এসে আমাদের মাঝ্‌-খানে দাঁড়ালো। বিশাল বাহু বিস্তার কোরে, মোচ্চি পাকিয়ে, গ'র্জ্জে গ'র্জ্জে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, "ইচ্ছা হ'চ্চে, এক কিলে মাথাটা গুঁড়ো ক'রে দিই—দে মাগীকে জলে ঠেলে ফেলে, দে ফেলে দে, বেঁধে ফ্যাল্, যেন সাঁৎরাতে না পারে। বেটী বোলছে ডাকাত, ডাকাত কে রে বেটী? ডাকাত তোর বাপ্, ডাকাত, ডাকাত, ডাকাত। আচ্ছা, তাই যেন হোলো, এরা সব যদি ডাকাতই হয়, তোদের সব গুলোকে যদি গলা টিপে মেরেই ফেলে, ঝুপ্ ঝুপ্ কোরে সত্য সত্য যদি জলে ফেলেই দেয়, তাহ'লে তোর্ কোন্ বাপে রক্ষে করে?"

আমার ত প্রাণ উড়ে গেল! গুর্ গুর্ কোরে লোকের বুক কাঁপে, আমার ত ঢেঁকি প'ড়্‌তে লাগ্‌লো! ভগ্নী তিন-টীরও মুখ শুকিয়ে গেল। তাদেরও ভয় হ'লো; কিন্তু আমার মত তত নয়। আমার অদৃষ্টে যে কেবল ডাকাতের সঙ্গেই দেখা করায়, সেইজন্যই আমার বেশী ভয়। এখানা কি তবে ডাকাতের নৌকা? এরা কি তবে সব ডাকাত? উঃ! হ'তেও পারে, হ'তেও পারে! এ নৌকায় যে আমি উঠেছি,—আমি উঠেছি ব'লেই বৃন্দাবনের নৌকাখানা ডাকাতের নৌকা হ'য়ে গেল! সত্যই কি এরা ডাকাত? আর তবে সেই ব্রজবাসী দুটী? তারাও কি তবে সেই ডাকাতের চর? না, তা নয়! না, তা নয়! তারা কেন ডাকাতের লোক হবে? চিঠি এসেছে, জয়মঙ্গলা বোল্লে, দাদার লেখা চিঠি। তবে কেমন কোরে ওরা ডাকাত হবে? না হবেই বা কেমন কোরে ভাবি? যদি না হবে, তবে এমন সময় ওখানে চুপ্‌টী কোরে, ঠাণ্ডা হোয়ে ব'সে আছে কেমন কোরে? তাদের গায়েও জোর আছে! তাদের হাতেও ত লাঠী আছে! তারা যদি ভাল মানুষ হয়, তারা যদি আমাদের মত বিপদে প'ড়েছে মনে কোরে থাকে, তবে অমন নির্জ্জীবের মত নিস্পন্দ হ'য়ে বোসে আছে কেন? কতখানাই ভাব্‌ছি! প্রাণ ধড়্ ফড়্ ক'চ্চে! রাত্রিকালে নদীর মাজ্‌খানে কি আবার নূতন বিপদেই বা পড়ি, সেই ভাবনায় তখন আমি যেমন দিশেহারা, নৌকার সঙ্গী-সঙ্গিনীদের মধ্যে কেহই তেমন নয়!

সর্দ্দার মাঝির ব্যাঘ্রগর্জ্জন সমান চ'লেছে। কেবল, "বেটীকে

বেঁধে ফেল্, চল্ বেটীকে নিয়ে চল্, হালের কাছে নিয়ে গিয়ে, গলায় দড়ী বেঁধে টুক্ কোরে ডুবিয়ে মারি। কি বলিস্ মাগী? বল্‌বি আর ডাকাত? যাবি কি জন্মের মত জলে ডুবে? যদি ভাল চাস্, যা নৌকার ভিতর। চুপ্‌টী কোরে মুখটী বুজে গিয়ে ব'সে থাক। ঐ যেমন চার্‌টী ভাল মানুষ ব'সে আছে, নড়েও না, চড়েও না, কথাও কয় না, চেয়েও দেখে না, ঠিক অম্নি কোরে, ভাল মানুষ হোয়ে গিয়ে ব'সে থাক। ফের যদি কথা কবি, ফের যদি উঁকি মার্‌বি, তখনই অম্নি গলা টিপে জলে ডুবিয়ে মার্‌বো। যাও, যাও দিদি লক্ষ্মীটী! এই যে গুটি গুটি যাচ্চে, বেশ মানুষ, বেশ মানুষ, বা তোরা!"

মাঝির শেষকালের আদরের "লক্ষ্মী দিদি" আপাততঃ হয় ত প্রাণের ভয়ে আস্তে আস্তে গুটী গুটী মাথাটী হেঁট কোরে, নৌকার ভিতরে এসে ব'স্‌লো। মাঝির উপদেশ মত চুপ্‌টী কোরেই থাক্‌লো। মনের ভিতর সুস্থির হোতে পার্‌লে না। তার তখনকার ভাবভঙ্গী দেখে, আমি সেটী বেশ অনুভব ক'র্‌তে পার্‌লেম। নৌকাবাহীরা মনের আহ্লাদে কতই যেন নূতন স্ফূর্ত্তিতে, মাতালের মত মত্তগীত গাইতে গাইতে, গাছের ডালের বাদুড়ের মত জলের দিকে ঝুলে ঝুলে, আগেকার চেয়ে দ্বিগুণ বেগে নৌকা চালাতে লাগ্‌লো।

আমার বুকের ভিতর ঝড় হ'চ্চে। বেশী আশঙ্কা, ব্রজবাসী দুজন একেবারে নিস্তব্ধ কেন? মাঝির যে রকম শাসানি দেখ্‌লেম, ভাল মানুষ মাঝি হোলে, নিজের নৌকার সোয়ারির উপর—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের উপর এত দৌরাত্ম্য ক'র্‌তো

না,—পার্‌তো না, ওটা নিশ্চয়ই ডাকাত! ওর কথায়, ওর বিক্রমে, দাঁড়িগুলোর যে রকম আহ্লাদ, তাতেও বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, ওগুলোও ডাকাত। তবেই এখানা ডাকাতের নৌকা! কেবল কথা হ'চ্ছে, ঐ ব্রজবাসী দুজনের। কি রকম লোক ওরা! ওরা কি আগে জান্‌তো, এ নৌকা ডাকাতের? না, হয় ত না জেনেই আগে ভাড়া ক'রেছে, এখন এই রকম জান্‌তে পার্‌ছে। চুপ্‌ ক'রে আছে কেন? দাঁড়ি মাঝিরা দলে পুরু, ওরা কেবল দুটী, হাঙ্গামা হ'লে প্রাণ হারাবে, সেই ভয়েই কি অমন? না, যে দেশে ওদের বাস, সে দেশের লোক ত অত ভয় করে না! তবে ওরা কি? জয়মঙ্গলার দাদার চিঠিতে লেখা আছে, ব্রজবাসী দুটী তীর্থপথের পাকা লোক। এ পথ কি তবে ওরা জানে না? এ পথ দিয়ে কি কখন ওরা যায় নাই? জিজ্ঞাসা করেই বা কে? আমি ব্রজবাসীদের সঙ্গে কথা কইতে পারি, বিশেষ, বিপদের সময় সকলের সঙ্গেই কথা কওয়া যায়,—কইতে হয়, আমি পারি, বেশ পারি, কিন্তু যাই কি ক'রে! আমি ব্রজবাসীদের কাছে ঐ কথা ব'ল্‌তে গেলে, ওরা কি রক্ষে রাখ্‌বে? ডাকাতই হোক্‌ আর যাই হোক্‌, কাজে যে রকম গোঁয়ার, কথা যে রকম জোর জোর, তাতে ক'রে ওরা সব ক'র্ত্তে পারে। যাওয়া কি জিজ্ঞাসা করা, কিছুই হয় না। কিন্তু মন তর্কেছে, ব্রজবাসীরা যে নিতান্ত ভাল মানুষ নয়, মন যেন পুনঃ পুনঃ সেই কথাই ব'লে দিচ্ছে। দাঁড়ি মাঝি যদি ডাকাত হয়, ওরা তবে কখনই বৃন্দাবনের লোক নয়, ওরা ব্রজবাসী নয়, বিপদ্‌,—ঘোর বিপদ্‌! মনের ভিতর

নিশ্চয় অবধারণ ক'র্লেম. ঘোর বিপদ্! মনে মনে ডাক্লেম, বিপদে রক্ষা কর, রক্ষাকালী।

নৌকা তীরবেগে ছুটেছে। আমাদের সঙ্গিণী স্ত্রীলোকটী ঠিক্ কথাই ব'লেছে। নদীর দু ধারেই ক্রমাগতই বন জঙ্গল। চারিদিকের আকৃতি দেখে, স্তম্ভিতভাব দেখে, অনুভব ক'র্ছি, রাত্রি দুই প্রহর ঘেঁসাঘেঁসি। বনের ভিতর দিয়ে নৌকা যাচ্ছে। নদী সে স্থানটায় কম চাওড়া—অত্যন্ত কম চাওড়া। একখানা নৌকা চ'লে গেলে, তার দুপাশে কেবল এতটুকু জায়গা থাকে, দুধারে কেবল দুজন মানুষ সাঁতার দিয়ে যেতে পারে, আর না। বড় বড় গাছের ডালেরা অন্ধকারমূর্ত্তি ধারণ ক'রে, নদীর উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়েছে। এক এক জায়গায় নৌকার ছাতের সঙ্গে আট্‌কে গিয়ে, খানিকদূর পর্য্যন্ত খড়্ খড়্ খড়্ সড়্ সড়্ সড়্ শব্দ হ'চ্ছে। দাঁড়িদের কাছে একটা হাতলণ্ঠনে আলো ছিল, সেটা নিবে গেছে,—নিবে গেছে, কি নিবিয়ে ফেলেছে, তারাই জানে। নৌকা ঘোর অন্ধকার। ভিতরে বাইরে যে দিকে চেয়ে দেখি, সেই দিকেই অন্ধকার! ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার! গাছ পালা র'য়েছে, বোধ হয় যেন রাক্ষস দাঁড়িয়ে আছে! জল স্থল কেবল অন্ধকার! আমি যে তখন কি হ'য়ে প'ড়্লেম, কোন রকম মানুষের কথায়, কোন রকম মানুষের ভাষায় সে অবস্থা আমি একজনকেও বুঝিয়ে দিতে পারি না। ভগ্নী তিনটী ত প্রতিমার মত নীরব। মাঝির তাড়্‌নি খেয়ে অবধি সেই চঞ্চলা স্ত্রীলোকটীর মুখেও চুঁ শব্দটীও নাই। আমার মুখেই কি আছে? আমি কেবল ভয়ের সাগরে আর ভাবনার

সাগরে ডুবে আছি। যত রকম ভাব্‌না আমার বুকের ভিতর ঢেউ খেলাচ্চে, এই নৌকা, এই নদী, এই জল, আর এই অন্ধকার মনের মত সমস্ত ভাবনাই অন্ধকার।

নৌকা নক্ষত্রবেগে ছুটেছে। তত সঙ্কীর্ণ স্রোত, তত গাছ পালার বাধা, তত ঘোর অন্ধকার, নৌকার গতির বিরাম নাই। রাত্রি দুই প্রহর, পৃথিবী ঘুমন্ত, প্রকৃতি নিস্তব্ধ, চারি-দিকের বন নিস্তব্ধ! আমাদের সেই বিপদ্, সেই দুর্য্যোগের সময়কে উৎসবের যোগ মনে ক'রে,—গভীর নিশিথের সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে, দাঁড়িরা ঘোর-গম্ভীর-হুহুঙ্কারস্বরে উল্লাসের গীত গাইছে। সেই সকল বিকট শব্দ, আর ঘন ঘন দ্রুত-নিক্ষিপ্ত ষোলটা দাঁড়ের ঝপাঝপ্ ঠকাঠক্ শব্দের সঙ্গে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর খর কল্ কল্ শব্দ ভিন্ন, চারি ধারের সমস্ত সহর ঘুমন্ত। আমার বুকের ভিতর হাজার হাজার ভাবনা কেবল জাগন্ত।

সাঁ সাঁ কোরে আরও খানিকদূর গিয়ে নৌকাখানা একটু বেঁক্‌লো, যত জোরে যাচ্ছিল, তার চেয়ে যেন একটু কম্‌লো। উজান ঠেলে যাচ্চে। আগেই ব'লেছি, এ নদী অবিরত দক্ষিণ-বাহিনী। নৌকাখানা উত্তরমুখে যাচ্ছিল, সেই জায়গায় একটু বেঁকে দাঁড়ালো। গতিতে বুঝ্‌লেম, পশ্চিমদিকে মুখ ফিরালে। সেখানেও হয় ত দুই দিকে দুই শাখা। নৌকা পশ্চিমমুখী হোল। অনুমানে বুঝ্‌লেম, ছায়া-ঝাপ্‌সায় একটু একটু দেখ্‌তেও পেলেম, পশ্চিমের স্রোতটা আরও সঙ্কীর্ণ। এক এক জায়গায় ঘর্ ঘর্ ক'রে শব্দ হয়, নৌকার গায়ে ডাঙ্গা ঠেকে, ডাঙ্গার উপর অন্ধকার বন। নৌকার আর দ্রুত-

গতি নাই, এক একবার থাম্‌ছে, আর একটু একটু চ'ল্‌ছে। কেন সে দিকে যাচ্ছে, জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার মুখ নাই। আপত্তি ক'র্‌লেই প্রাণ শঙ্কট। সকলেই চুপ্‌ চাপ্‌। ব্রজবাসীদের উপর ক্রমশই আমার সন্দেহ বাড়্‌লো। এ ত বৃন্দাবন যাওয়া নয়, বাঘের মুখে প্রবেশ ক'র্‌তে চলেছি। সেই ডাকাত এরা। আর নিস্তার নাই। যে রকম অন্ধকার, যে রকম ছোটখাল, যে রকম কাছে ডাঙ্গা, পালাবার উপায় থাক্‌লে বেশ পালান যেতো। চুপি চুপি উঠে একটা ঝোপের ভিতর খানিকটা ব'সে থাক্‌তেম্‌, নৌকাখানা এগিয়ে গেলে, যা হয় একটা উপায় হোত। একা ত নয়, কি ক'রেই বা হয়, তাতে আবার ঝাঁপ ফেলা। পালাতে হোলে দাঁড়ি-লোক গুলোর সম্মুখ দিয়ে পালাতে হয়। সে আবার ডেকে বিপদ্‌ আনা। সে সঙ্কল্প আস্‌বার নয়, তবু এলো। এলো আর গেল। হতাশ হোয়ে জড়ের মত বোসে থাক্‌লেম।

নৌকা বড় জোর আর ক্রোশ খানেক এগুলো, আর গেল না। দাঁড়িগুলো সব হুস্‌ হাস্‌ ক'রে শিস্‌ দিয়ে ঠকান্‌ ঠকাস্‌ ক'রে দাঁড়গুলো ফেলে, হাত উঁচু ক'রে হাইতুলে আলিস্যি ভেঙে, ঘোর-ঘটার হাসি হেসে সারি সারি জুসায় তিনসার হোয়ে ব'স্‌লো। মাঝিও ওদিকে হনূমানের মত লাফ দিয়ে, তাদের দলের মাঝখানে এসে প'ড়্‌লো। যা ভাব্‌লেম, তাই। যারা ব্রজবাসী ব'লে পরিচয় দিয়েছিল, তারা তখন পাগ্‌ড়ী খুলে, লাঠি ফেলে, খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে সেই দলের সঙ্গে যোগ দিলে। মদ খেলে, মদ তারা

সঙ্গে ক'রেই এনেছিল, কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল, সকলে মিলে সেই সব মদ খেলে। বার বার মদ ঢাল্বার শব্দ, ঘোঁড়া ডাকার মত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাসি, বিকট আস্ফালনে মুখে মুখে চটাচটি, পাব্ড়ি ভাঙ্গা এলো মেলো গান, এই সকল লক্ষণেই আমি বেশ বুঝ্তে পা'র্লেম, সকলে মিলে মদ খেলে। বড় একটা মাতাল হোল না, পরামর্শ আরম্ভ ক'র্লে। আম্রা শুন্তে পাব ব'লে চুপি চুপি পরমার্শ। তারা আমাদের ভয় দেখিয়েছে, ভয়ে আমরা হয় ত হতজ্ঞান হোয়ে আছি, শুন্তে পাব না, এটা হয় ত তারা ভেবেছিল। ভেবেও তবু চুপি চুপি পরামর্শ। মাতালের চুপি চুপি, অন্য চুপি চুপির চেয়ে তবু একটু বড় বড়। আমার কাণ সেই দিকেই প'ড়ে আছে। চুপি চুপি কথাগুলোও আমি ধ'র্তে পা'র্লেম। দুই একটা সঙ্কেতের কথাও তারা বলাবলি ক'র্লে তাও আমি বুঝ্লেম। ডাকাতের হাতে ধরা প'ড়ে, অনেকবার তাদের আমি অনেক কথা শুনেছি কি না, গোটাকতক সাদা সাদা সঙ্কেত কথা আমি শিখে গিয়েছি। পরামর্শগুলো সব আমি বুঝ্লেম, আমার বুকে যেন পাহাড় চাপা প'ড়্লো !

পরামর্শ তাদের হোয়ে গেল। শেষকালে একজন ফুস্ ফুস্ কোরে ব'ল্লে, "মাগীটার কি করা যাবে ?"

আর একজন ব'ল্লে "গলাটিপে জলে ফেলে দেবে আর কি ক'র্বে।"

তৃতীয় ব্যক্তি তাচ্ছল্যস্বরে ব'ল্লে, "না, না, সেটা কত-ক্ষণের কাজ ! মনে ক'র্লেই পারা যাবে। সেখানে গিয়ে

যদি গোলমাল ক'রে, ডালকোত্তা দিয়ে খাইয়ে দেবে। নিয়ে চল্ এক সঙ্গেই সব কটাকে বেঁধে নিয়ে চল্।"

আর একজন যেন ভঙ্গী ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্লে, "বেঁধে নিতে হবে ?"

"হবে না ?"

যে ব্যক্তি বেঁধে নিতে ব'ল্‌ছে, ফুস্ ফুঁস্ কথা ভুলে গিয়ে সে একটু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ব'ল্‌লে, "হবে না ? অন্ধকারে যদি একটা স'ট্‌কে প'ড়ে ?"

"স'রে প'ড়্‌তে আর হয় না। এতগুলো পাহারা, এতগুলো চক্ষু, এর ভিতর থেকে——"

"ছোট ছোট কটা বরং থাক্। ওদের আমরা হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যাব। ঐ বড় মাগীটাকেই বাঁধ। ওমাগী ভারি ধড়িবাজ। মাগী বলে কি না আমরা পথ ভুলেছি, বাঁধ মাগীকে।"

মাতালেরা সকলেই ধড়্‌মড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। চক্ষের নিমিষে একটা হুলস্থূল প'ড়ে গেল! আমরা পাঁচটাতেই আতঙ্কে একটা অস্ফুট চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেম! একটা লোক একগাছা রসি হাতে ক'রে, গুড়িমেরে ছত্রীর ভিতর ঢুকে প'ড়্‌লো। সত্য সত্যই আমাদের নূতন সঙ্গিনীটাকে বেঁধে ফেল্‌লে। সে বেচারা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌লো! আমরাও চারটীতে জড়াজড়ি ক'রে ডাক্‌ছেড়ে কাঁদতে লাগ্‌লেম। ভাল ব্রজবাসীর সঙ্গে, ভাল বৃন্দাবনে যাচ্ছি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

ডাকাতেরা গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লো। "চেঁচা চেঁচা, যত

পারিস্ চেঁচা! এ অঞ্চলে এত রাত্রে চেঁচিয়ে ম'রে গেলেও জনপ্রাণী তোদের রক্ষে ক'র্‌তে আস্‌বে না। চার ক্রোশের ভিতর লোক নাই। এ ত আমাদের রাজত্ব। মনে ক'র্‌লে আমরা তোদের মুখ বেঁধে ফেল্‌তে পা'র্‌তেম, কিন্তু কিসের ভয়? ওঠ্ তোরা, আয় আমাদের সঙ্গে! কাঁদ্‌লে আর কি হবে? সেখানে বেশ সুখে থাক্‌বি। লক্ষ্মীছেলের মত গুড়্ গুড়্ ক'রে চ'লে আয়!”

নৌকাখানা সেখানে প'ড়ে থাক্‌লো। ডাকাতেরা আমাদের শেয়াল কুকুরের মত, সেই অন্ধকার বনের ভিতর দিয়ে, টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে চ'ল্‌লো। আমরা যেন বাতাসের ভরে, মরার মত, তাদের হাতের সঙ্গে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে চ'ল্‌লেম।

দ্বাদশ তরঙ্গ।

—*—

পাতাল পুরী।

সকাল হয়েছে। আমি কতকগুলো উস্‌কো খুস্‌কো পাথরের উপর শুয়ে প'ড়ে আছি। চারিদিকে উস্‌কো খুস্‌কো দেওয়াল; যেন একটা ঘরের মত। কোথাকার ঘর, কোথায় এসেছে, কিছুই জান্‌তে পাচ্চি না। অন্ধকার বনের ভিতর দিয়ে, ডাকাতেরা আমাদের হিড়্ হিড়্ কোরে টেনে এনেছে; আমরা পরিত্রাহি চীৎকার ক'রেছি, কেবল এই পর্য্যন্তই মনে

আছে। তার পর কি হ'য়েছে, কোথায় এনেছে, জ্ঞান ছিল না—অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছিলেম। মনে মনে বুঝতে পারছি, প্রভাত হবার একটু পূর্ব্বেই চৈতন্য হ'য়েছে।

যেখানে প'ড়ে আছি, সেটা যেন একটা ঘর,—ঠিক্ ঘর নয়, দেয়ালের গায়ে সব উঁচু উঁচু পাথর কাটা,—পাথরের কোথাও যেন হাঁ কোরে র'য়েছে, কোথাও যেন দাঁত বার কোরে র'য়েছে,—ভয় দেখাচ্চে। মনে ক'র্‌লেম, পাহাড় কেটে কেটে ডাকাতেরা এই রকম ছোট ছোট খুব্‌রি খুব্‌রি ঘর ক'রেছে। সূর্য্যের আলো, আকাশের বাতাস ভাল কোরে প্রবেশ ক'র্ত্তে পার্‌ছে না। সব যেন থম্‌থমে! কোথায় এনেছে? বোধ হয় নীচে সুড়ঙ্গ, এই সুড়ঙ্গের ভিতরেই ডাকাতদের রক্ষাগড়। আগে আগে যে সব জায়গায় আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, ভয়ঙ্কর করালনিবাস নরককুণ্ড হ'লেও এত ভয়ঙ্কর নয়! এবার বড় শক্ত জায়গায় এনেছে! এবার আর উদ্ধার পাবার উপায় নাই!

ঘরটার দরজা নাই। একটা দিক্ প্রায় দেড় হাত কি দু হাত ওসার পাহাড় কাটা খোলা খাঁ খাঁ ক'র্‌ছে; সেখানেও কোন পাহারা নাই। যেখানে আমি প'ড়ে আছি, ভয়ে ভয়ে এদিক্ ওদিক্ চক্ষু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখ্‌লেম, কোনখানেই কেউ দাঁড়িয়ে নাই। দেখে কি আমার মনে সাহস হ'লো? হা কপাল! সাহস কি কখনও এ গুহার ভিতর আস্‌তে পারে! যদি পারে, ঐ সকল ভীষণ দস্যুদলের বুকের ভিতরেই এসেছে,—তাদেরই বুকের ভিতর বাসা ক'রে র'য়েছে। একটু

একটু যদি আমার আসে, তা হ'লেই বা কি? সে সাহস নিয়ে আমি কি ক'র্ব্বো? পালাব। কোথায় পালাবো? এখানে পাহারা নাই; বাহিরে নিশ্চয়ই আছে; বাহিরেই তারা সব আড্ডা কোরে আছে। আরও, আমাদের সেই সঙ্গিনীটীকে ভয় দেখিয়ে ব'লেছিল, "ডালকোত্তা দিয়ে খাওয়াব" ডাল-কোত্তাও পাহারা আছে। পালাবার পন্থা কোথা? সে উপায় নাই!

আমি কি এখন এই হ'লেম? আমার ভাবনাই কেবল ভাবতে লাগ্‌লেম। তাহারা সব কোথায় গেল? যাহারা আমাকে তত ভালবাস্‌লে, বাড়ীতে এনে আশ্রয় দিলে,—কাদের বাড়ী আগে জান্‌তেম না, এখন জেনেছি বাড়ী তাদে-রই, তারা সব কোথায় গেল? তাদের কি এখানে এনেছে? না, আর কোথাও সরিয়ে ফেলেছে? ডাকাতেরা কেবল আমাকেই চায়, আমাকেই ধরে; তবে কেবল একটা উপলক্ষ ক'রে, বৃন্দাবনের নাম ক'রে চিঠিখানা নিয়ে গিয়েছিল; সেটা কেবল আমাকেই ধ'র্‌বার জন্যে। তাদের কি তবে ছেড়ে দিয়েছে? না, ছেড়ে দেবার হ'লে নৌকাতেই ছেড়ে দিত। এনেছে, ঠাঁই ঠাঁই হয়ত তফাৎ তফাৎ কোরে রেখেছে। তারা যে এখন কোথায় আছে, কি ভাব্‌ছে, কি ক'র্‌ছে, এই কথাগুলি মনে ক'রে, প্রাণটা আমার ধড়্ ফড়্ ক'রে উঠ্‌লো। শুয়ে শুয়ে হাপুস নয়নে কাঁদ্‌লেম। উঠে ব'স্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লেম, পার্‌লেম না; সর্ব্বশরীরে বেদনা,—দারুণ বেদনা; সর্ব্বাঙ্গ যেন পাকা ফোঁড়া। গায়ের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, বনের কাঁটায় পাতায়, ঠাঁই ঠাঁই

সব ছোড়ে গিয়েছে, রক্ত পোড়েছে। ধূলোকাদায় লুটোপুটী খেয়ে, যেন ভূত সেজে র'য়েছি। বেঁচে আছি কেন? যিনি এ সংসারে আমাকে কেবল বিপদের শিকার কোরে পাঠিয়েছেন, তিনিই সে কথা ব'লতে পারেন।

উঠে ব'সতে পারলেম না। পাশ ফের্‌বার চেষ্টা পেলেম, সে চেষ্টাও বিফল! তাতে বরং আরও কাঁটা কাঁটা পাথরগুলো পট্ পট্ কোরে গায়ে ফুট্‌তে লাগ্‌লো। মাথাটা একটু উঁচু কোরে একবার সেই খোলা পথটার দিকে চেয়ে দেখ্‌ছি, কেহ কোথাও নাই। বেলা কতখানি হ'য়েছে, তাও জান্‌তে পার্‌ছি না। আরও দু তিন দণ্ড সেই রকমেই গেল। তার পর চেয়ে দেখি, একটা বিকটাকার কালো মুস্‌কো জোয়ান, গোটাকতক শুক্‌নো শুক্‌নো ফল আর এক মালা জল হাতে কোরে আমার সেই কয়েদ-গুহার ভিতর এসে উপস্থিত হ'লো। সেই গুলো আমার এক পাশে রেখে, আমার হাতের কাছে এসে ব'স্‌লো। সামর্থ নাই, তবু কষ্টেস্থষ্টে হাতখানা আমি বুকের দিকে সরিয়ে নিলেম। লোকটার মুখপানে একবার চেয়ে দেখ্‌লেম, বেশ চিন্তে পাল্লেম। প্রাণ উড়ে গেল। লোকটা আমাকে ব'ল্লে, "ওঠ্! খা, জল খা!"

দর্ দর্ ক'রে আমার চক্ষে জল প'ড়্‌তে লাগ্‌লো! তখনকার যে ভয়—সকলেই বুঝতে পাচ্চেন, সে ভয়ে কণ্ঠরোধ হয়, কথা কইতে পারা যায় না। আমি কিন্তু শ্বাস টেনে টেনে গুটিকতক কথা কৈলেম। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'ল্লেম, কেন আর আবার মরার উপর খাঁড়ার ঘা! আমার কি আর ক্ষুধা তৃষ্ণা

আছে? তোমরা কি তা রেখেছ? বার বার কেন তোমরা আমাকে এ রকম যন্ত্রণা দিচ্চ? তোমার পায়ে ধরি,—তুমি যদি মানুষ হও, তোমার প্রাণে যদি কিছুমাত্র দয়া ধর্ম্ম থাকে, তুমি যদি কোন ঠাকুর দেবতা মানো, সেই ঠাকুর দেবতার দিব্বি; সত্য ক'রে বল, তোমাদের মতলব কি? কেন আমাকে দোগ্ধে দোগ্ধে মার?

চক্ষু পাকলো কোরে লোকটা যেন সাপের মত গোজ্জে উঠ্‌লো। "খেতে হয় ত খা, না হয় ত এই সব থাক্‌লো। আমরা এখন অনেক কাজে ব্যস্ত। তুই আমাদের গুরুকন্যা নোস্। খাও খাও ক'রে ধন্না দিতে পারি না।"

কে তোমাকে ধন্না দিতে বলে? আমি তখন একটু সতেজ-স্বরে ব'লে উঠ্‌লেম, 'কে তোমাকে ধন্না দিতে বলে?' কিছুই আমি খাব না। মিনতি ক'রে ব'ল্‌ছি, তোমরা আমাকে মেরে ফেল! সব আপদ্ চুকে যাক্! তাদের কিন্তু ছেড়ে দিও। তাদের সব কোথায় রেখেছ?

"তোর্ কাছে বুঝি আমি নিকেশ দিতে এসেছি? তোর্ বুঝি হুকুমের চাকর আমি? কোথায় রেখেছ, ছেড়ে দিও; উঃ! আমরা যেন তাঁবেদার! তোর্ সে সব কথায় দরকার কি? যদি তোর্ কেহ অন্তরঙ্গ থাকে, আমাদের সর্দ্দারের হুকুম মত টাকা দিয়ে খালাশ কোরে নিয়ে যাবে। এখন তুই এ সব খা!"

আবার আমি কাতর হ'য়ে ব'ল্লেম, "ওগো! তাদের সঙ্গে সব গহনা পত্র আছে, তাই তোমরা নাওগে; তাদের ছেড়ে

দাওগে! আমাকে খালাশ ক'র্‌বার লোক নাই; আমার কপালে যা থাকে, তাই হবে!' বড় বড় ছুপাটী দাঁত বার কোরে ভূত প্রেতের মত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, হেসে হেসে ডাকাতটা ব্যঙ্গ কোরে ব'ল্লে, "হিসাব শিখিয়ে দিচ্চেন, গয়না পত্র আছে। গয়না পত্র আছে তা তোর্ কি? সে সব কি তাদের? সে সব আমাদের। সে সব কোন্‌কালে আমাদের সর্দ্দারের সিন্দুকে উঠেছে। যাকে আমরা ধরি, তার সঙ্গে জিনিস পত্র, ধুলি-গুড়ি যা কিছু থাকে, আগেই আমরা সে সব দখল করি; তার পর খালাশী পণের টাকা নগদ পেলে, দয়া ক'রে ছেড়ে দিই, না হয় ত সাত পাহাড়ের জল খাইয়ে অন্ধকূপের ভিতর প'চিয়ে প'চিয়ে মারি!"

আমার তখন চক্ষের জল শুকিয়ে গেল! প্রাণের আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে, যথাশক্তি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উত্তেজিত স্বরে ব'ল্‌লেম, "কেন, প'চিয়ে প'চিয়ে মার্ব্বে কেন? এখনি টাট্‌কা টাট্‌কা আমাকে মেরে ফেল না! তোমাদের আমি ভয় করি না। জান তোমরা আমার মনের কথা? যার প্রাণের ভয় নাই, তার আবার কারে ভয়? তুমি আমার যম হও, এখনি মেরে ফেল! তোমাদের হাতে যদি প্রাণ না যায়, তোমাদের এই গিরিগুহার ভিতর না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে আমি আপনার প্রাণ আপনি বাহির ক'র্ব্বো!"

লোকটা অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, লাফিয়ে লাফিয়ে, পা ঠুকে ঠুকে, কর্কশগর্জ্জনে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, "পালাবি বুঝি? বার বার যেমন ফিকির ফন্দী খাটিয়ে, আমাদের এতগুলো লোকের

চক্ষে ধূল দিয়ে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ক'রে পালিয়ে গেছিস্, এবারও বুঝি সেই রকম মতলব ক'রেছিস্? এবার বাঘের মুখে, বাঘের গর্ভে পুরেছি, প্রাণে তোর্ ভয় আছে কি না, এইবার দেখাব। এইখানেই তোর্ বৃন্দাবন প্রাপ্তি হবে। থাক্ তুই! আস্‌ছি আমরা এখনই। দেখাচ্চি এখনই মজা!" দম্ভে দম্ভে এই সব কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে, লোকটা লাফে লাফে গোর্জ্জে গোর্জ্জে গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। গুহার মুখের কাছে গিয়ে, অসুরের মত রক্তচক্ষে দাঁত খামাটী ক'রে আমার দিকে একবার বিকট কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে গেল।

আমার প্রাণটা ঝাঁৎ ক'রে উঠ্‌লো! বাহিরের দিকে একটু তফাতে তফাতে ঘেউ ঘেউ রবে গোটাকতক কুকুর ডেকে উঠ্‌লো। আবার কোন নূতন বিপদ এখনই আস্‌বে, মুহূর্ত্তের জন্য সে ভাবনাটা, সে ভয়টা একেবারেই আমি ভুলে গেলেম। এই 'অন্ধকূপের ভিতর আমার বৃন্দাবন প্রাপ্তি হবে' উঃ! কি নির্ব্বোধের কর্ম্মই ক'রেছি! জয়মঙ্গলা—অত বুদ্ধিমতী জয়-মঙ্গলার মনেও কি সে সন্দেহটা একবারও উদয় হয় নাই? আমি যেন নানা ভয়ে, নানা বিপদে, নানা দুর্ভাবনায় হতবুদ্ধি, আমারই যেন মতিস্থির হয় না; জয়মঙ্গলার ত তা নয়? জয়মঙ্গলা সেটা বুঝ্‌তে পাল্লে না? উঃ! কি সাংঘাতিক কুচক্রের সৃষ্টি! বারাণসীর দরবার, বৃন্দাবনের আহ্বান, ব্রজ-বাসীর আসা, কাণ্ডই মিথ্যা; সমস্তই ভোজবাজী! চিঠি যদি যথার্থই হবে, কাশী থেকে সোমরাজ যদি যথার্থই চিঠি লিখ্‌বে, বৃন্দাবন থেকে জয়মঙ্গলার দাদা সত্যই যদি ভগ্নীকে নিতে

চিঠি লিখে লোক পাঠাতেন, তবে দুখানা চিঠি, দু জায়গা থেকে, ঠিক্ এক দিনে, এক সময়ে, এক জায়গায়, এক বাড়ীতে এসে উপস্থিত হওয়া, কত বড় অসম্ভব আশ্চর্য্য কথা! নৌকায় উঠ্‌বার আগে একবারও সেটা কাহারও মনে আসে নাই। এখন সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি। একটা চলিত কথা আছে,—'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে;' বিপদ্ ঘ'টেছে, বিপদের মুখে এসে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়েছি; রক্ষা পাবার আশা ভরসা ফুরিয়েছে; এমন অসময় তত বড় গুপ্তচক্রের আসল সূত্রটা আমার মনের মধ্যে জেগে উঠ্‌লো। উঃ! দুখানাই জাল চিঠি! তিনটে লোক গিয়েছিল, তিন্‌টেই জাল মানুষ! যারা ব্রজবাসী সেজেছিল, তারা ত নিশ্চয়ই এই দলের ডাকাত! যে লোকটা কাশী থেকে এসেছে ব'লেছিল, তাকে আমি দেখি নাই, সেটাও এদেরই লোক। ডাকাতের দলে সব রকম ফন্দীবাজ ধড়ীবাজ লোক্ থাকে। ডাকাতেরাই সেই চিঠি দুখানা নিয়ে গিয়েছিল। দাদার হাতের লেখা জয়মঙ্গলা চেনে, তবু ধ'র্‌তে পারে নাই; ঠিক্ ঠিক্ জাল ক'রেছে! ধাঁদা লাগিয়ে দিয়েছে! এবারকার এ চক্রটা বড়ই হুসিয়ারিতে পাকিয়েছে। এ চক্র ভেদ ক'র্‌বার কোন সম্ভাবনাই ত দেখ্‌ছি না। সোমরাজও কিছু জান্‌তে পাচ্চেন না, বৃন্দাবনবাসী ললিতানন্দও অন্ধকারে র'য়েছেন, আমরা যে এখানে এসে প'ড়েছি, তাঁরা বাটীতে এসে উপস্থিত হ'লেও, কোন সূত্রে, কোন প্রকারে এ কথার ছন্দাংশও জান্তে পার্‌বেন না। উপায় কি হয়? আমার নিজের ভাগ্যের জন্য আমি ভাবছি না। এ প্রাণ ত যেতেই ব'সেছে! গেলেই ত

আমি বাঁচি। ভাবনা কেবল সেই চার্‌টী প্রাণীর জন্য তাদের গতি কি হবে? পৃথিবীর উপর আড্ডা হ'লে কোন না কোন সূত্রে সন্ধান পেলেও পেতে পার্‌তো। কিন্তু এটা ত তা নয়! গতিক দেখে বুঝ্‌তে পার্‌ছি, পাহাড়ের নীচে গুহা, গুহার ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ কাটা; সুড়ঙ্গের ভিতর এই অন্ধ-কূপ; পাতালপুরী, এ সন্ধান পায়, কার সাধ্য! এ জন্মে আর কাহারও সঙ্গে দেখা হবে না! এই ভয়ঙ্কর দস্যুপূর্ণ অন্ধকার পাতালপুরীতে ডাকাতে মেরে না ফেল্লেও অনাহারে, কঠোর যন্ত্রণায় পাঁচটা প্রাণ টুস্‌ টুস্‌ কোরে বেরিয়ে যাবে! ডাকাতের কথার ভাবে বুঝ্‌তে পাচ্চি, খালাসী পণের টাকা পেলেই খালাস দেয়; কিন্তু সে ভাবনা ত মিথ্যা ভাবনা! এই বিজন গহন বনে, দুর্গম পাহাড়ের নীচে, অন্ধকার পাতালপুরীতে আমরা কয়েদ; এখানে সন্ধান কোরে আমাদের খোলসা ক'র্ত্তে কে আস্‌বে?

ভাবনা কতদূর যায়? সমুদ্রের কুল আছে, সমুদ্রের পার আছে, আমার মত দুর্ভাগিনীর শতমুখী সহস্রমুখী এ দুর্ভাবনা-সাগরের কুল কিনারা নাই; তবে ভগবান্‌ যদি কৃপা কোরে দিন দেন, মা কালী যদি মুখ তুলে চান্‌, তবেই এ যাত্রা এ বিপদে রক্ষা হবে; তা নইলে এই বন্ধন দশাই জন্মশোধ!

কিছুই খেলেম না। ডাকাতের ছোঁয়া ফল-জলের দিকে চেয়েও দেখ্‌লেম না। শরীরে শক্তি নাই, উঠ্‌তেও পাল্লেম না। নিরন্তর দুর্ভাবনাকে সহচরী কোরে জড়ের মত, সেই খণ্ড খণ্ড পাষাণের উপর পাষাণ হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌লেম!

একাদশ তরঙ্গ।

সত্য না ইন্দ্রজাল্?

তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেল। সখী তিনটী কি ক'চ্চে, কোথায় আছে, নূতন সঙ্গিনীটীকে বেঁধে এনেছে, তাকেই বা কি ভাবে রেখেছে, কোন সংবাদ নাই। আমি সেই অন্ধকূপে একাকিনী! একবার একবার একটু একটু উঠ্‌তে পারি, উঠি, বসি, দাঁড়াই আবার শুই। এই ক'রে রাতদিন কাটে। মাঝে মাঝে ডাকাত আসে। একটা লোকই বার বার আসে না, এক একবার এক এক রকম নূতন মূর্ত্তি! কিছু কিছু খাবার সামগ্রী রেখে যায়, ধোম্‌কে ধোম্‌কে গর্জ্জন কোরে কোরে শাসায়, আমি এক একবার কাকুতি মিনতি করি, মুক্তি ভিক্ষা করি, এক একবার অন্তদিকে পাশ ফিরে মুখ বুজে, চুপ্ কোরে থাকি; ডাকাতের দিকে চেয়েও দেখি না। খাবার সামগ্রী স্পর্শ ই করি না। এই রকমে কত দিন কাটে। তিন দিন তিন রাত কেটে গেছে; চার দিনের দিন সন্ধ্যার পর একটা ডাকাত এলো, একখানা খাপখোলা তলোয়ার হাতে কোরে এলো। এসেই আমার পাশে হাঁটু গেড়ে ব'স্‌লো! রাগের লক্ষণ দেখা গেল না, কাট্‌বে বোলে তলোয়ার খানও তুল্লে না। গোঁফ চুঁওরে, বুক ফুলিয়ে, লোকটা কেমন এক

রকম ব্যঙ্গস্বরে ব'ল্লে, "কি গো বৃন্দাবনবাসিনি! রাধাকৃষ্ণের দোল দেখ্‌ছো? আছ কেমন? চিন্তে পারবে আমাকে?" তাকে দেখেই আমি চক্ষু বুজে ছিলেম। শেষের কথাটা শুনে একবার চেয়ে দেখ্‌লেম; দেখেই আবার চক্ষু বুজ্‌লেম! লোকটা আবার ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, "উঃ! এক রত্তি ছুঁড়ী, পেটে পেটে কতই বুদ্ধি! কতই চালাকি, কতই দাগাবাজী, হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুমি মনে কর, তুমিই ফন্দী ফিকির জান, তুমিই পালাবার পন্থা জান, তুমিই সকলকে ফাঁকি দিতে পার, আর কেহই কিছু পারে না, আর কেহই কিছু জানে না। এইবার দেখ মজা! এই আমাদের নূতন বৃন্দাবন। এখানে রাধা-কৃষ্ণের নিত্য নূতন খেলা, এখানে কত রকম রাধাকৃষ্ণ দেখ্‌তে পাবে। দিন ক্ষণ ভাল মিলে গেলে, তুমিও একদিন হয় ত কুঞ্জবিহারিণী শ্রীমতী রাধা হবে। কেমন, সাধ হয় কি? বুঝ্‌তে পাল্লে আমার কথা? আহা কতই যেন ভাল মানুষটী! মুখে একটীও রা নাই, সত্যই যেন বৃন্দাবনের রাধিকা!"

একটীও কথা কইলেম না, একটী বারও চক্ষু মিলে চাইলেম না। মনের ভিতর গুমুরে গুমুরে পুড়্‌তে লাগ্‌লেম, বুকের ভিতর গুমে গুমে আগুণ জ্ব'ল্‌তে লাগ্‌লো। 'থাক তুমি বিরহিণী, আমরা তোমায় দূতী হ'য়ে মথুরায় কৃষ্ণ আন্‌তে চ'ল্লেম।' ফুক্‌রে ফুক্‌রে হেসে হেসে কথায় কথায় থেমে থেমে ঐ রকম ঠাট্টা বিষ ঝেড়ে, ডাকাতটা যেন তলোয়ার হাতে কোরে নাচ্‌তে নাচ্‌তে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যা হোলে ডাকাতেরা আমার ঘরে একটা আলো রেখে যায়, কিম্বা যে লোকটা খাদ্য সামগ্রী

আনে, সেই লোকটাই আলো হাতে ক'রে আসে। যাবার সময় নিয়ে যায় না, রেখে যায়;—কেন যে সে টুকু অনুগ্রহ, তাদের মনের কথা তারাই জানে। কোন্ কোন রাত্রে খানিক গৌণে আলোটা আমি নিবিয়ে ফেলি। যে রাত্রে আলস্য বোধ হয়, সে রাত্রে আর উঠি না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আলো জ্বলে। যে রাত্রের কথা আজ্ ব'লছি, সে রাত্রে আলো ছিল। লোকটা যখন এলো, তখনও ছিল, যখন চ'লে গেল, তখনও ছিল। লোকটা যখন প্রবেশ করে, তখন একবার তার মুখখানা দেখেছি, মাজখানে যখন আর একবার চাই, তখনও তার হাত, পা, মুখ, চক্ষু, মাথার চুলগুলো পর্য্যন্ত সমস্তই একবার দেখেছি।

লোকটা আর কেহই নয়, যে দুজন সে দিন ব্রজবাসী সেজে চিঠি নিয়ে, আমাদের আন্তে গিয়েছিল, তাদেরই মধ্যে একজন। তারা যে ব্রজবাসী নয়, নৌকাতেই সেটা বুঝেছিলেম। এখন সেই বিশ্বাসটাই দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়াল, বিশ্বাসঘাতক! লোকটা বেরিয়ে গেল। ঘরে আলো থাক্‌লো। গুহায় প্রবেশ ক'রে অবধি নিত্য আমি যে রকম আহার করি, সে রাত্রেও সেই রকম আহার ক'র্‌লেম। জাল চিঠি, জাল মানুষ, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার আগাগোড়া চিন্তা ক'র্‌তে লাগ্‌লেম। সাঁ সাঁ ক'রে রাত্রি এগুতে লাগ্‌লো। আমার পক্ষে সাঁ সাঁ করা জান্‌তে পারা গেল না,—বিপদের দিন, বিপদের রাত্রি, অতিশয় দীর্ঘ হয়—সেই চার দিন আমার পক্ষে যেন কতই চার দিন বোধ হ'চ্ছে। রাত্রি কিন্তু ক্রমশঃই গভীর

হ'য়ে আস্‌ছে ;—আমার দুশ্চিন্তাও ক্রমাগত গভীর ! দিন যেন কতই দীর্ঘ। রাত্রি যেন কতই দীর্ঘ, কোন্ সময়ে কত বেলা কত রাত্রি একবারও ঠিক্ নির্ণয় ক'র্‌তে পারা যায় না ; তথাপি তখন যেন অনুমানে বুঝ্‌লেম, রাত্রি দুপ্রহর। ডাকাতের কুকুরগুলো চতুর্দ্দিকে ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে বেড়াচ্চে ; গুহার ভিতর সেই সব ভয়ঙ্কর ডাক যেন মেঘ-গর্জ্জনের মত অনবরত প্রতিধ্বনি হ'চ্চে, আমি চিন্তাসাগরে ডুবে আছি। উঃ! ডাকাতের কুকুরগুলোও ডাকাত! তাদের চীৎকারগুলোও যেন বড় বড় ডাকাতের বিকট বিকট কুকী! আমার কর্ণের ভিতর সেই সকল বিকট শব্দ প্রবেশ ক'র্‌ছে ;—শব্দগুলো যেন কাণের ভিতর ভোঁ ভোঁ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আমি দরজার দিকে চেয়ে আছি। দুদিকে পাথর কাটা, মাঝখানে ফাঁক, সেই ফাঁকটাকে যদি দরজা বলা যায়, তবে সেই দরজার দিকেই আমি চেয়ে আছি,—সটান চেয়ে র'য়েছি।

ঘরে আলো ছিল। দরজার ফাঁক দিয়ে সেই আলোটা বাহির পর্য্যন্ত একটু একটু ছায়ার সঙ্গে মিট্ মিট্ ক'র্‌ছে। হঠাৎ বোধ হ'লো, সেই ছায়ামাখা আলোর ভিতর দিয়ে বাহিরের দিকে একটা মানুষ ছুটে গেল। লোকটার হাতে অস্ত্র আছে, খাপ খোলা তলোয়ার। যদিও চকিতমাত্র, তথাচ সেই তলোয়ারের গায়ে আলো প'ড়্‌লো,—বিদ্যুৎ যেমন চমকে, সেই রকমে একবার চক্‌মক্ ক'রে উঠ্‌লো, তাতেই আমি বুঝতে পার্‌লেম। ছুটে গেল, কিন্তু মানুষটা আর সেদিকে ফিরে এলো না। কে সে মানুষ? ডাকাত হবে কি? ডাকাতের

কেল্লায় ডাকাত বই আর কে হবে? আর কি হ'তে পারে? কিন্তু একটা খট্‌কা জন্মালো। তলোয়ারে যেমন আলো প'ড়েছিল, মানুটার অঙ্গ-বস্ত্রেও সেইরূপ একটু একটু দীপ্তি লেগেছিল। হীরা-মুক্তায়, সোণার পাতায় আলো প'ড়্‌লে যেমন চক্‌মক্‌ করে, সেই রকম আমি দেখেছি। মানুষটার পোষাকে সব সোণার কাজ করা ঝালর দেওয়া;—মণি-মুক্তার অলঙ্কার পরা। ডাকাতে কি অমন পোষাক পরে? হবেও বা! ঐশ্বর্য্যের ত অভাব নাই, রাত্রিকালে হয় ত কেল্লার ভিতর রাজা সেজে নেচে কুঁদে রাজত্ব ক'রে বেড়ায়। কিম্বা হয় ত—এরা সব বহুরূপী কি না? রাজা সেজে হয় ত বনপথে কোন রাজা রাজড়ার সঙ্গে মিলে মিশে, ছলে-কলে-কৌশলে শেষকালে মনের মত ডাকাতি করে। তাই হয় ত ঠিক্ হবে। এরা বহুরূপী, তার প্রমাণও আমি অনেক পেয়েছি। নূতন সাক্ষী, সেই দুজন জাল-সাজা ব্রজবাসী। যে লোকটা ছুটে গেল, সেটা হয় ত বহুরূপী দলের রাজা-সাজা ডাকাত!

অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে থাক্‌লেম, সে লোক আর ফিরে এলো না। রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর হয়। কোনদিকে কিছুই সাড়া শব্দ পেলেম না। কুকুরগুলো ডাক্‌ছিলো, থেমে গেছে। স্বপ্ন নয় ত? জাগন্ত মনে কি স্বপ্ন আসে? আমি জাগন্ত আছি ত? চক্ষুকে বিশ্বাস হয় না। হয় ত আমি ঘুমিয়েছি, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছি, চক্‌মক্‌ কোরে মানুষ ছুটে গেল। আমি জেগে আছি কি না, চেয়ে আছি কি না, বিশ্বাস্ ক'র্‌ত্তে পাল্লেম না; ধড়্‌মড়িয়ে উঠে ব'স্‌লেম। চক্ষে হাত

দিয়ে দেখ্‌লেম, জাগন্ত কি ঘুমন্ত। দুই হাতে ভাল কোরে চক্ষু মার্জ্জন কোল্লেম। দুই হাতে দুই চোকের দুটো পাতা টেনে ধ'রে চোচাপটে সেই দরজার দিকে চাইলেম। কিছুই দেখ্‌তে পেল্লেম না। মানুষ ছুটে যাবার কথাটা জাগন্ত অবস্থাতে স্বপ্ন ব'লে মনের ভিতর চাপা দিয়ে ফেল্লেম।

আবার ঘুমুলেম। ঘরে আলো আছে, সময়ের অনুমান,—যখন স্বপ্ন দেখি, তখন মনে হ'য়েছিল, রাত্রি দুই প্রহর; তার পর যতখানি সময় গেছে, তাতে একবার ভেবেছি, প্রায় আড়াই প্রহর; এখনকার আন্দাজে আড়াই প্রহর অতীত। দুরং হোক্ মিথ্যা ভাবনা আর ভাব্‌বো না;—সত্য ভাবনাতেই দেহ-প্রাণ অবসন্ন, মিছা ভাবনা আর বাড়ানো কেন? চক্ষু বুজ্‌লেম। নিদ্রার জন্য চক্ষু বুজ্‌লেম না; দিবারাত্রি যে কাজ আমি করি, সেই কাজের জন্যই বুজে থাকা। রোগীর চক্ষে নিদ্রা নাই, শোকীর চক্ষে নিদ্রা নাই, অনুতাপীর চোখে নিদ্রা নাই, যোগীর চক্ষে নিদ্রা নাই, বিপদের চিরসঙ্গিনী আমি,—আমার চক্ষে ও নিদ্রা নাই।

অনুমানে আরও চারি দণ্ড অতিবাহিত। চক্ষু বুজে নিসাড় হ'য়ে প'ড়ে আছি, অকস্মাৎ কে যেন আমার বুকের মাঝখানে একটা আঙুল ঠেকালে। আতঙ্কে চম্‌কে উঠে, অস্ফুট চীৎকারে থাড়িমাড়ি খেয়ে আমি চক্ষু মিলে চাইলেম, অন্ধকার! আলো দেখে, চক্ষু বুজেছিলেম, চেয়ে দেখি, অন্ধকার! আপনা আপনি নিবে গেছে কিম্বা বদ্ মতলবে কোন লোকে এসে

নিবিয়ে দিয়েছে, আকস্মিক ভয়ে, সেটা তখন ভাবনা ক'র্‌বার সময় হোল না। ডাকাতের সাক্ষাতে একবার আমি বোলেছি, বিপদ্‌কে ভয় করি না। ডাকাতকে আমি ভয় করি না। কিন্তু সে কথাটা এখন মিথ্যা হোল।' কে একজন আমার বুকের উপর হাত দিয়েছে,—ঘর অন্ধকার! স্বভাবতঃই আমার বুকে ভয় এলো। সে এক রকম ভয়, আর এ এক রকম ভয়! অন্ধকারে ডাকাতের গুহায়, অন্ধকার-লোকের অঙ্গুলিস্পর্শে আমার প্রাণের সে ভয় তখন আর এক রকম। এ ভয় চুপ্ ক'রে থাক্‌বার ভয় নয়,—কথা কটা পাঠক মহাশয়কে ব'ল্‌তে যতক্ষণ গেল, ততক্ষণের অনেক আগে সভয়ে আমি কথা কইলেম। সে রকম ভয়ে কণ্ঠরোধ হয়, শ্বাস রোধ হ'য়ে আসে, দম আট্‌কায়, আমারও প্রায় সেই দশা। উঠ্‌তে পাল্লেম না, পাশ ফির্‌তে পাল্লেম না, একখানি হাতও নাড়্‌লেম না, তেম্নি ভয়ে শুয়ে-শুয়েই অস্ফুট-কম্পিত মৃদুকণ্ঠে একটীবার জিজ্ঞাসা ক'ল্লেম, "কে?"

উত্তর পেলেম না। যার আঙুল, সে কথা কইলে না। আঙুল কিন্তু তখনও আমার বুকে! আবার আমি সেই রকম স্বরে সেই রকমভাবে, কেঁপে কেঁপে ব'ল্‌লেম, "যে হও তুমি, যদি দুষ্ট মতলবে এসে থাক, দুই তিন চক্ষু পালটের পর, আমাকে আর জীবন্ত দেখ্‌তে পাবে না, কথা কও! মনের মতলব প্রকাশ কর।" 'চুপ্!' একটী অতি ক্ষীণস্বরে এই সংক্ষিপ্ত উত্তর পেলেম। যতটা ভয় হ'য়েছিল, একটু যেন কম হ'লো। তথাপি আমি মনের সংকল্পে আবার ব'ল্‌লেম, "চুপ ত আমি হ'য়েই

আছি। যদি কোন দুষ্ট মতলবে এসে থাক, একটু পরে জন্মের মতই চুপ দেখ্‌বে।"

সেই স্বর—সেই, ক্ষীণস্বর, যেন একটু আশ্বাস প্রদানের ইঙ্গিতে ধীরে ধীরে ব'ল্‌লে, "আমার সঙ্গে আস্‌বে ?"

দুইবারের স্বর শুনে, মনে মনে আমি বুঝ্‌তে পা'র্‌লেম, স্ত্রীলোক। বুক লাফাচ্ছে, সেই বুকে নূতন লোকের আঙ্গুল, আতঙ্ক ত হ'তেই পারে। তথাপি মনে যেন একটু আশ্বাস পেলেম। স্ত্রীলোক! অবশ্যই এর প্রাণে কিছু দয়া আছে, যেই কেন হোক না, স্ত্রীলোকের কাছে ততটা শঙ্কটের আশঙ্কা নাই। ডাকাতের আড্ডায় থাকে, ডাকাতের গুপ্ত-দূতী, হৃদয় অবশ্যই অনেকটা খারাপ হ'য়ে এসেছে, তবুও—আমি মনে ভাব্‌লেম, তবুও স্ত্রীলোকের হৃদয় একেবারে দয়ামায়া শূন্য হয় নাই। এটা ভাব্‌লেম কেন? স্বরে বুঝ্‌লেম, নূতন লোক; আমার ভাগ্যভাগিনী অভাগিনী সহচরীদের কণ্ঠস্বর নয়,—তারা বন্দিনী, তারা এখানে এরাত্রে আস্‌বেই বা কেমন ক'রে? ডাকাতের দূতী;—তা ছাড়া আর কে হবে? কে হওয়াই বা সম্ভব। যেই হোক্, স্ত্রীলোক স্থির ক'রে হৃদয় একটু আশ্বস্ত হ'লো। তার জিজ্ঞাসার উপর আমিও জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, "তোমার সঙ্গে কোথায় যাব?"

স্বর উত্তর ক'র্‌লে, "আমি তোমাকে উদ্ধার ক'র্‌তে এসেছি।"

"কে তুমি?"

"বিন্ধ্যাচল।"

"তাতে কি বুঝ্‌ব?"

"সেই পর্ণকুটীর।"

"তাতেই বা কি?"

"চুপি চুপি কথা কও। পর্ণকুটীরে আমার তিনটী শিষ্য।"

বিস্ময়ে, আনন্দে, চমকিত হোয়ে চঞ্চল স্বরে আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, "আপনি কি তবে সেই যোগিনী?"

"চিনেছ?"

আবার আমি চঞ্চল হোয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, "আপনিই কি তবে দীপ নির্ব্বাণ ক'রেছেন?"

"হাঁ।"

"কেন?"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে অদৃশ্য যোগিনী চুপি চুপি আমার কাণে কাণে ব'ল্‌লেন, "ডাকাতগুলো সব ঘুমিয়েছে, সবগুলো মাতাল হ'য়েছে, রাত্রের মধ্যে তাদের আর ঘুম ভাঙ্‌বে না, এই বেলা চল পালাই। পা টিপে টিপে, চুপি চুপি আমার সঙ্গে এসো। যে দিকে আমি যাব, সেই দিকে চেয়ে, চেয়েই তোমরা আমার সঙ্গে এসো। পেছন দিকে ফিরে চেওনা, এসো উঠে, বিলম্ব ক'র্‌বার সময় নেই, শীঘ্র! শীঘ্র!!"

তত যে অবসন্ন, বিদ্যুতের মত আমি উঠে ব'স্‌লেম, যেন শত হস্তীর বল এলো। ভগ্ন হৃদয় সহসা যেন কতই সাহসে পরিপূর্ণ হ'ল। এককালে বিদ্যুৎবেগে চঞ্চলচরণে উঠে দাঁড়ালেম। ব্যগ্রকণ্ঠে যোগিনীকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, "তারা সব কোথায়?"

যোগিনী চুপি চুপি উত্তর ক'র্লেন, "আগে তুমি, তার পর তারা।"

কি অনুগ্রহ! অপরিচিতা যোগিনীর অকস্মাৎ ততখানি দয়া আমার উপর। কি অশ্চর্য্য! ভাব ত এখনও কিছুই স্থির ক'র্তে পার্ছি না! এ সব কি সত্য না ইন্দ্রজাল? তথাপি মনে মনে আহ্লাদ। আহ্লাদে যেন আত্মবিস্মৃত হ'য়ে, আলো জ্বাল্বার কথাটা উচ্চারণ ক'র্ছিলেম, 'হাবা মেয়ে' ব'লে যোগিনী হাস্য ক'ল্লেন। সেই শুষ্ক-শুষ্ক দীর্ঘ অঙ্গুলী পরিবেষ্টন ক'রে আমার একখানি হাত ধ'র্লেন। পায়ে পায়ে অগ্রবর্ত্তিনী হয়ে চকিত-চঞ্চলস্বরে ব'ল্লেন, "এসো, বাহিরে কিন্তু আর একটাও কথা ক'য়োনা।"

অন্ধকারে-অন্ধকারে অন্ধকূপ থেকে বেরুলেম। আমার সেই কয়েদ গুহার মুখের বাহিরে প্রায় দশ হাত তফাতে এসে একটা সুড়ঙ্গ-পথ পাওয়া গেল। আমারে সেই সুড়ঙ্গ-মুখে দাঁড় করিয়ে, যোগিনী একটু সঙ্কেতস্বরে ব'ল্লেন, "দাঁড়াও এই খানে। কোন ভয় নাই, চকিতমাত্রেই আমি ফিরে আস্‌ছি। সাবধান! পেছন ফিরে চেয়ে দেখোনা, সুড়ঙ্গের উপর দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক। পেছন ফিরে চেয়ে দেখো না। দোহাই বিন্দুবাসিনী!"

যোগিনী অদৃশ্য হোলেন। আমিও এক রকম অদৃশ্য। একে ত অন্ধকারে ঢাকা, সুড়ঙ্গ-পথ অন্ধকার, তার উপর আবার সুড়ঙ্গের মুখ থেকে ভিতরে গিয়ে প্রবেশ ক'রে বিলক্ষণ গা ঢাকা হোয়ে লুকালেম। পেছন ফিরে চেয়ে দেখা নিষেধ,

সেই একটা মনে মনে সংশয়। এ সব কি সত্য না ইন্দ্রজাল ?

যোগিনীর যেমন প্রতিজ্ঞা, তেম্‌নই কার্য্য। জয়মঙ্গলার মুখে যোগিনীর সব গুণ আমি শুনেছি। যোগিনীর মনের ভিতর যে কোন মারপঁ্যাচ খেলেনা, সে কথা জয়মঙ্গলা আমাকে ভাল কোরে বুঝিয়েছে,—সব আমার মনে আছে। সেই বিশ্বাসেই যোগিনীকে আমি বিশ্বাস ক'রেছি,—সেই বিশ্বাসেই এই দস্যুপুরীর ভিতর বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে যোগিনীর সঙ্গে এতদূর আমি এসেছি,—সেই বিশ্বাসেই যোগিনীর আদেশে এই অন্ধকার সুড়ঙ্গ-মুখে একাকিনী আমি দাঁড়িয়ে আছি; কিন্তু পেছন ফিরে চেয়ে দেখা নিষেধ! সেই কথাটা বুকের ভিতর ধুক্ ধুক্ ক'র্‌ছে।

যোগিনী ফিরে এলেন। সঙ্গে আমার ভালবাসা জয়মঙ্গলা জয়লক্ষ্মী, জয়তারা আর আমাদের সেই নূতন সঙ্গিনীটী,—তত অন্ধকারে আমার অন্ধকার হৃদয়ে আহ্লাদে পূর্ণচন্দ্র উদয় হোল। আমার চক্ষে তখন সব অন্ধকার আলোময়!—কথা কওয়া নিষেধ। নির্ব্বাক্ চক্ষের জল ফেলে সহচরীদের আলিঙ্গন ক'র্‌লেম;—নির্ব্বাকে যোগিনীর চরণে প্রণিপাত ক'র্‌লেম। আর কুকুর ডাকে না। আমাদের কল্যাণে কুকুরগুলো পর্য্যন্ত বুঝি মাতাল হ'য়েছে! হওয়াই মঙ্গল!

আমরা সারিবন্দী হ'য়ে সুড়ঙ্গপথে চ'ল্লেম। অগ্রে অগ্রে যোগিনী। যোগিনীর পশ্চাতে আমি, আমার পশ্চাতে তিনটী ভগিনী, সর্ব্বশেষে নূতন সঙ্গিনী। সকলের পক্ষেই পেছন

ফিরে চেয়ে দেখা নিষেধ। সেই নিষেধটা যোগিনী আবার এই সময় সারি গাঁথা সকলগুলিকে শুনিয়ে নূতন আদেশে পাকা ক'রে দিলেন।

আমরা চ'লেছি। সুড়ঙ্গের বাহিরে এসে উপস্থিত হ'লেম। পাহাড়ের চারিধারে, বন জঙ্গল। কোথাও পাহাড়ের উপর দিয়ে, কোথাও বনের ভিতর দিয়ে পথ। সেই পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছি। সে পথের অন্ধকার আরও শতগুণ কালিমাথা। স্ত্রীজাতির মন বড় চঞ্চল, বিশেষ যে কাজটা ক'র্‌বার, কি দেখ্‌বার, কি যে কথাটা শোন্‌বার নিষেধ থাকে, সেই নিষেধটা ভুলে যাওয়ার জন্যে স্ত্রীজাতির মন যেন ছট্‌ফট্‌ করে। আপ্‌নার কথা আমি আপ্‌নিই ব'ল্‌ছি, পেছন ফিরে চেয়ে দেখ্‌বার জন্যে গোড়া থেকে মনটা আমার বড়ই ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছে! হঠাৎ পেছন দিকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ হোল। সকলেই শুন্‌তে পেলে, যোগিনীও শুন্‌লেন, কিন্তু যোগিনী তাতে ভ্রুক্ষেপ ক'র্‌লেন না। যেমন শান্তভাবে অগ্রবর্ত্তিনী হ'চ্ছিলেন, তেম্‌নি অচঞ্চলেই চ'লে যেতে লাগ্‌লেন। পেছন দিকে না চেয়ে, অর্দ্ধ উচ্চকণ্ঠে আমাদের বরং আবার নূতন ক'রে মনে প'ড়িয়ে দিলেন, "পেছন ফিরে চেয়ো না।"

আমি ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ খুব নিকটেই শুন্‌তে পাচ্ছি। যোগিনী কি তবে আমাদের সঙ্গে ভণ্ডামি খেলা খেল্‌লেন? মন ত এমন বিশ্বাস ক'র্‌তে চায় না, তবে এ কাণ্ডখানা কি? সত্য কি এর ভিতর তবে কোন ইন্দ্রজাল আছে? ঘোড়সহর আস্‌ছে, সেটা খুব ঠিক। একজন কি কজন তাও বলা যায় না,

ডাকাত বেরিয়েছে, বিপদ্ আবার নূতন হোয়েছে! এদিকে আমাদের পক্ষে এম্‌নি শক্ত শাসন দেখা দূরে থাক্, কথা কওয়া পর্য্যন্ত নিষেধ। করা যায় কি?

আমি ত আর চক্ষু সাম্‌লে থাক্‌তে পার্‌লেম না। অন্ধকারের ভিতর থেকে টিপি টিপি মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে একবার পেছন দিকে চাইলেম। চেয়েই অম্‌নি 'ডাকাত গো' এই রকম অস্ফুট শব্দ কোরে, আতঙ্কে আঁৎকে উঠ্‌লেম। আছাড় খেয়ে প'ড়ে গেলেম। যোগিনী তাড়াতাড়ি আমার হাত ধ'রে তুল্লেন। ভয়ে বিহ্বল হোয়েছিলেম, সান্ত্বনাবাক্যে চৈতন্য ফিরালেন, কাণে কাণে গুটী দুই গুপ্তকথা ব'ল্‌লেন, আমি শিউরে উঠ্‌লেম।

আমি শিউরে উঠ্‌লেম! আমার অচৈতন্য অবস্থা দেখে আমার সঙ্গিনীরা ক্ষণকালমাত্র চীৎকার ক'র্‌বার উপক্রম ক'রেছিল, যোগিনী তাদের এক রকম ধমক্ দিয়েই থামিয়ে দিলেন। প্রিয়শিষ্য তিনটীর অপেক্ষা আমিই যেন তখন যোগিনীর অধিক স্নেহের পাত্রী, অধিক বিশ্বাসের পাত্রী, অধিক যত্নের পাত্রী হ'য়ে উঠ্‌লেম।

আমি শান্ত হোলেম। যে হয় হোক্, আমি আর পেছন ফিরে চাইলেম না। হঠাৎ আমাদের পেছন দিকে ভয়ানক একটা গণ্ডগোল উঠ্‌লো। চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে জড়িয়ে-জড়িয়ে কথা, জোর-জোর আস্ফালন, পলাতক-পলাতক ব'লে চীৎকার, ধর্-ধর্ মার্-মার্ এই রকম হুঙ্কারধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল। তখন আর পেছন ফিরে চেয়ে দেখ্‌বার নিষেধ থাক্‌লো না।

কিন্তু আমরাই তখন দারুণ ভয়ে আড়ষ্ট, চেয়ে দেখ্‌বার চক্ষু পাব কোথায়? যতটুকু দেখ্‌তে পার্‌লেম, ততটুকুই কেবল মনে হয়।

অন্ধকারের ভিতর যে মূর্ত্তি দেখে আমি আঁৎকে উঠেছিলেম, সে মূর্ত্তি একটী অন্ধকারমাখা অশ্বারোহী মানুষের ছায়া! সুড়ঙ্গের দিক্ থেকে হঠাৎ তিনজন লোক—ডাকাত নিশ্চয় তার আর কথা কি, টোল্‌তে-টোল্‌তে উঠ্‌তে-পোড়্‌তে মদের নেসায় চেঁচাতে-চেঁচাতে আমাদের ধ'র্‌তে আস্‌ছিল। বোধ হয় তাদের তিনজনের নেসা কিছু কম হোয়েছিল, কিম্বা হয় ত শীঘ্র শীঘ্র ছুটে গেছে। যোগিনী যখন মেয়েগুলিকে আন্‌তে গিয়েছিলেন, সেই সময় হয় ত কোন রকমে কিছু জান্‌তে পেরেছিল। তখন হয় ত অসামাল ছিল, উঠ্‌তে পারেনি, এতক্ষণের পর হয় ত একটু সাম্‌লেছে, আন্দাজে-আন্দাজে সেইজন্যই এই দিকে ছুটে আস্‌ছে। সেই যে অশ্বারোহী ছায়া-মূর্ত্তি, সেই মূর্ত্তি তাদের পথ আগ্‌লাচ্চে। অশ্বারোহী অস্ত্রধারী কি না, ডাকাতেরাও কোন অস্ত্র এনেছে কি না, রাত্রিকালে বনের মাঝখানে খুনো-খুনী হবে কি না, অন্ধকারে সেটা আমি কিছুই জান্‌তে পার্‌লেম না।

যোগিনী ক'র্‌লেন কি? তিনি এই সময় আমাদের সব সম্মুখদিকে এগিয়ে দিয়ে,—তত যে বুড়ী তথাপি যেন বীরের মত এক লম্ফে সেই ছায়ামূর্ত্তির পাশে গিয়ে মিশ্‌লেন। তার পর কি হোলো, অন্ধকারে আমি দেখ্‌তে পেলেম না, কেবল ডাকাতদের মাতলামির গলাবাজি, আর সেই ছায়ামূর্ত্তির সদর্প আস্ফা-

শন বাক্যের রবমাত্র শুন্‌তে পেলেম। কথাগুলো সব বুঝ্‌তে পারলেম না।

অনেক্ষণ গেল। যোগিনীও আর ফিরে আসেন না, আমরাও আর এগুতে পারি না, যে জায়গাটায় গোলমাল হোচ্ছিল, খানিকক্ষণ সে জায়গাটা নিস্তব্ধ। কে কোথায় যেন সব চ'লে গেল। খানিকক্ষণ কাহারও কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

এই রকম প্রায় দুই দণ্ড। তার পর দেখি, বড় বড় দুই মশাল জেলে সেই ছায়ামূর্ত্তি আর আমাদের যোগিনী ঠাকুরাণী গজেন্দ্রগমনে আমাদের দিকে চ'লে আস্‌ছেন। ছায়ামূর্ত্তি তখন পদব্রজে। সেই তিনটে মাতাল ডাকাতকে তাদেরই কাপড়ে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে চড়কের চড়্‌কির মত ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে ঘোড়ার পৃষ্ঠে তুলে দিয়েছেন। বলবান্ পাহাড়ী ঘোড়াটী তত বড় তিনটে পালোয়ান পিঠে ক'রে স্বচ্ছন্দে, অক্লান্তগমনে সঙ্গে সঙ্গে চ'লে আস্‌ছে। ছায়ামূর্ত্তি সেই ঘোড়ার লাগামটা ধ'রে আপ্‌নিই টেনে আন্‌ছেন।

ওমা! এ কি! সত্যই না কি ইন্দ্রজাল? ছায়া মূর্ত্তিকে আর ছায়ামূর্ত্তি কেন বলি? মশালের আলোতে সে মূর্ত্তি আমার চক্ষে দিব্য সুপ্রকাশ। ওঃ! তবে সেটা স্বপ্ন নয়! রাত্রি দুই প্রহরের সময় গুহার ভিতর থেকে যে মণিমুক্তা-খচিত অস্ত্রধারী বীরমূর্ত্তিকে চকিতমাত্র ছুটে যেতে দেখেছিলেম, এই মূর্ত্তিই সেই।

দেখে আমার একটু লজ্জা হ'লো। মনে মনে বীরত্বের প্রশংসা ক'রে গৌরবিনী হ'তে লাগ্‌লেম, তত বড় বিপদ্-জীর্ণ

হৃদয়ও যেন বিপুল আনন্দে প্রফুল্ল হোতে লাগ্‌লো; কিন্তু যতই তিনি নিকটে আস্‌তে লাগ্‌লেন, ততই যেন লজ্জা আমাকে চোখোচোখী চেয়ে দেখ্‌তে বারংবার নিবারণ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। না চেয়েও কিন্তু আমি থাক্‌তে পারি না। আড়ে আড়ে এক একবার টিপি টিপি মুখ তুলে চাই, আবার তখনই তখনই চক্ষু বুজে মাথা হেঁট করি।

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ।

সুখের বাতাস।

তাঁরা নিকটে এলেন। ঘোড়ার পিঠের ডাকাতেরা মিট মিট্‌ ক'রে চেয়ে দেখ্‌ছে। আষ্টে-পিষ্ঠে বাঁধন, নড়ন-চড়ন ক্ষমতা নাই, তবুও আমাকে দেখে, সেই মিট্‌মিটে চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে দাঁত খিঁচুতে লাগ্‌লো। আমি তাদের দেখে মনে মনে হাস্‌তে লাগ্‌লেম। সে তিন্‌টে মূর্ত্তি ছাড়া আরও একটা কাপড়ের বস্তার মত বড় পুঁটুলী ঘোড়ার পিঠে ঝুল্‌ছিল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সে স্থানটা নিতান্ত অপ্রশস্ত নয়, নিকটে এসেই, সেই অপরূপ বীরমূর্ত্তি ঐ ঘোড়ার পিঠের চার্‌টে বস্তাই বাঁ হাতে টেনে ধুপ্‌ কোরে নীচে ফেল্লেন। তিন্‌টে বস্তা গোঁ গোঁ ক'রে উঠ্‌লো। প্রকাণ্ড ভারবহনের ক্লান্তি থেকে ঘোড়া একটু বিশ্রাম ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

গোঁ গোঁ করা তিনটে বস্তার প্রতি আমার চক্ষু দুই তিন মুহূর্ত্ত আকৃষ্ট। ধর্ম্মের কর্ম্মই এমনি, ধন্য মা বিন্ধ্যাচলের বিন্দুবাসিনি! মরে যদি গোদা মরাই ভাল। যে তিনটে ডাকাত ধরা প'ড়েছে, তাদের মধ্যে দুটা সেই ব্রজবাসী সাজা জালিয়াৎ দাগাবাজ, আর একটা সেই দেশ বিখ্যাত সর্দ্দার বিশে ডাকাত। হবেই ত! একা আমিই যাদের হাতে সামান্য শেয়াল কুকুরের অসহ্য কষ্ট সহ্য ক'রেছি, আমার মত আরও কত হতভাগিনী,—আরও কত হতভাগ্য নির্ব্বিবাদী নির্দ্দোষী পথিক লোক, যাদের হাতে প্রাণ পর্য্যন্ত শঙ্কটাপন্ন-করে, তেমন সকল দুরন্ত, দাগাবাজ, কালান্তক ডাকাতদের পাপের ফল যদি হাতে হাতে না ফলে, তবে ত ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই মিথ্যা! বেশ হ'য়েছে, যাদের পাপের শাস্তি জগতে লেখা আছে, তাদের সব গ্রেপ্তার করাই যথার্থ বীরপুরুষের কাজ। একেবারে প্রাণে মারা উচিত শাস্তি নয়, যারা মারে তারা উচিত শাস্তি দেয় কিনা, আমি একটী ক্ষুদ্র কীটানুকীট ভিখারিণী বালিকা, সামান্য অবলা স্ত্রীজাতি, রাজপুরুষদের সে তর্কের বিচার ক'র্‌ছি না; যে তিনটা লোক বাঁধা প'ড়েছে, অকারণে আমারে যেমন তারা দ'গ্ধে দ'গ্ধে যন্ত্রণা দিয়েছে, তাদেরও যেন তেম্‌নি দগ্ধানি শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়; আমার মতে—এই ক্ষুদ্র বালিকার মতে সেই রকম শাস্তির ব্যবস্থা করাই সুব্যবস্থা।

অন্ধকার বনপথ এখন আর অন্ধকার নয়। জ্বলন্ত মশালটা, একটা গাছের ডালে বেঁধে রেখে সেই নবপ্রকাশিত বীরপুরুষ, একটু যেন বিশ্রামের অভিপ্রায়েই, শ্রমহর্ষ-মিশ্রিত প্রসন্ন-

বদনে, বনতলে পা ছ'ড়িয়ে ব'স্‌লেন। মুখখানি তখন মশালের আলোতে, একটু একটু আলোদিত রাগে শরৎকালের পদ্মফুলের মত রঞ্জিত দেখাতে লা'গ্‌লো। ডাকাতধরা পরিশ্রমে কপালে, কপোলে, নাসাগ্রে, সারি সারি মুক্তার মত ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিয়েছিল, মশালের আলোতে, সেই ঘর্ম্মবিন্দু গুলি তখন যেন, প্রভাতকালের পদ্মফুলের শিশির বিন্দুর মত শোভা পা'চ্চে, তাতেই বা কত খানি চমৎকার রূপ! সেই মুখখানি, একবার ধীরে ধীরে একটু উঁচু ক'রে, যোগিনীর মুখের দিকে তিনি একবার চাইলেন। যোগিনীও ব'স্‌লেন। আমাদেরও ব'স্‌তে ব'ল্‌লেন, আমরাও সব ব'স্‌লেম। হাত পা বাঁধা ডাকাত তিনটে, একটু তফাতে প'ড়ে থা'ক্‌লো। আর একটা যে বেশী বস্তা, সেটাও থা'ক্‌লো সেইখানে। তখন আর কথা কওয়ার নিষেধ নাই, কিন্তু তখনকার কাণ্ড কারখানা দেখে, আহ্লাদে, উৎসাহে, বিস্ময়ে আমি যেন এককালে পুঁতুল হ'য়ে গিয়েছিলেম। কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার, কিম্বা মুখ ফুটে ভুটী একটী মনের কথা ব'ল্‌বার ক্ষমতা ছিল না। বোধ হয় যেন সংজ্ঞাই ছিল না। সহচরী গুলির অবস্থাও সেই রকম। আমার মত তত দুর না হোক,—হ'তেই পারে না,—কিন্তু তারা চারিটীতে অচলের মত নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ, স্থিরদৃষ্টি।

আমার চক্ষু তখন আর কোন দিকেই স্থির ছিল না। সকলের দিকে এক একবার চাচ্চি, ডাকাতদের পানেও এক একবার কটাক্ষপাত ক'র্‌ছি, যে দিকে সেই সুরঙ্গপথ, বনের

ভিতর সে দিকেও এক একবার চঞ্চল দৃষ্টি ছুট্‌চে, কিন্তু সে সব দৃষ্টি ক্ষণিক। যখন স্থির হোয়ে কোন দিকে চেয়ে থাকি, তখন অনেকক্ষণ কেবল সাগ্রহ দৃষ্টি থাকে অলৌকিক যোগিনীর মুখের পানে,—দৃষ্টিতে আমার কৌতুক আছে, কৌতূহল আছে, আগ্রহ আছে; দৃষ্টির ভাব দেখে যোগিনী সেটী বুঝ্‌তে পাল্লেন;—লম্ফ দিয়ে আমাদের কাছ থেকে তিনি স'রে যাবার পর কোথায় কি রকমে কতক্ষণে কি কি ঘটনা ঘ'টেছিল, সংক্ষেপে সংক্ষেপে একে একে সেই সকল ঘটনার কথাগুলি আমাদের কাছে তিনি আগাগোড়া গল্প ক'র্‌লেন। সেখানে তখন আর কোন রকম আশঙ্কার সম্ভাবনা ছিল না, কথাগুলি তিনি তাড়াতাড়ি ঝড়ের মত সমাপ্ত ক'রে দিলেন না;—সংক্ষেপে বটে, কিন্তু বুঝিয়ে বুঝিয়ে পরিষ্কার ক'রে বর্ণনা ক'র্‌লেন। যোগিনীর মুখের কথাগুলিই আমি এইখানে আমার আপনার কথায় পাঠক মহাশয়কে শুনিয়ে রাখি।

ডাকাতেরা সব মদ খেয়ে টো'লে টো'লে প'ড়েছিল। যে যেখানে প'ড়েছিল, সে সেইখানেই অজ্ঞান! আমাকে সুড়ঙ্গ মুখে রেখে, যোগিনী যখন মেয়েগুলিকে আন্‌তে যান, তখন সকল গুলোই অন্ধকারে এখানে ওখানে অসাড় হোয়ে প'ড়েছিল। এক একটার মুখে এক একবার "উঁ—আঁ—ধর্‌—মার্‌—গয়না" এই রকম প্রলাপ কথা, আর একটা গোঁ গোঁ শব্দ বাতাসের সঙ্গে শোনা যাচ্ছিল। আগেই আমি অনুমান ক'রেছিলেম, ডাকাতেরা সব কটাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রেখেছে;—ঠিক্ তাই। চার ঘরে চার জন। চার ঘর বেড়িয়ে, চারজনকে

উদ্ধার কোরে, যোগিনী যখন বেরিয়ে আসেন, একটা মাতাল তখন যেন একটু মাথা উঁচু কোরে দেখেছিল, অন্ধকারেও যোগিনী সেটী বুঝ্‌তে পেরেছিলেন, ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। বন্দিনীদের ঘরে ঘরে প্রবেশ ক'র্‌বার আগে পাতালদুর্গমধ্যে তিনি একজন লুক্কায়িত ছদ্মবেশী বীরপুরুষের সঙ্গে দেখা করেন। সেই লুক্কায়িত ছদ্মবেশী বীরপুরুষ এখন আমাদের সম্মুখে। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস ফিরে এলো; একটু পূর্ব্বেও স্থির ক'রেছিলেম, গুহামুখে অল্প দীপপ্রভায় যে বীর-মূর্ত্তি চকিতমাত্র আমার চক্ষে প'ড়েছিল, সেই বীরমূর্ত্তিই এই আশুপ্রকাশিত যুবাপুরুষ। এই মূর্ত্তিকেই আমি একটু পূর্ব্বে আমাদের পশ্চাদ্গামী অশ্বারোহী ছায়ামূর্ত্তি ব'লে পরিচয় দিয়ে-ছিলেম। কে ইনি, কোথায় নিবাস, হঠাৎ এ রাত্রে দস্যুদের পাতালপুরীতে কেন আগমন, সে সব পরিচয় পাঠকমহাশয় পরে পাবেন। মেয়েগুলিকে খালাস ক'র্‌বার সময় এই বীরপুরুষের কোন সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই। যোগিনী একাকিনীই সে কার্য্য সাধন ক'রে এসেছিলেন। একটু পরে এই বীরপুরুষ প্রচ্ছন্নভাবে সুরঙ্গপথে বাহির হন। প্রবেশের সময় ঘোড়াটী একটা বনের ভিতর গাছের ডালে বেঁধে রেখে গিয়েছিলেন, বাহিরে এসে সেই অশ্বে আরোহণ ক'রে অন্ধ-কারে ইনি আমাদের পথানুসরণ ক'রেছিলেন, তার পর ডাকাত আসে। ব'লেছি আগে, তিনটে মাতাল চেঁচাতে চেঁচাতে ট'ল্‌তে ট'ল্‌তে এসে বনের ভিতর উপস্থিত হয়। হুড়াহুড়ি বেধে যায়। যোগিনীও সেই সময় ছুটে যান। দেতাল

মাতাল কাবু ক'র্‌তে কতক্ষণ? তাতে আবার একজন প্রবল-পরাক্রম মহাতেজস্বী বীরপুরুষের হাতে;—সহায় আবার অসীম অলৌকিক শক্তিসম্পন্না যোগিনী। নিমেষ মধ্যেই তাঁরা মাতাল তিনটেকে পিছ্‌মোড়ঙ্গা ক'রে বেঁধে ফেল্‌লেন। পা বাঁধ্‌লেন না;—মতলব ছিল, নিয়ে যেতে হবে গুহার ভিতর। কেবল হাত দুখানা পিঠের দিকে মুচ্‌ড়ে নিয়ে গিয়ে, বজ্রবাঁধনে এই বীরপুরুষ সেই দুরন্ত ডাকাতের বুক চড়্‌চড়িয়ে দিলেন। অন্ধকারের ভিতরেও এই বীরপুরুষটী সেই বিখ্যাত বদ্‌মাস্ সর্দ্দারটাকেও চিন্‌লেন। "অসহায়িনী মেয়েদের অলঙ্কার পত্র—সম্বলপত্র কেড়ে নিয়েছিস্, ফিরিয়ে দে!" বারবার এই কথা বোলে গর্জ্জন ক'রে ধোম্‌কে ধোম্‌কে এই বীরপুরুষ সেই সর্দ্দার ডাকাতকে জেদাজেদি ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। বাঁধা কুকুরের উপাসনা ক'র্‌বার দরকার কি? তিনটে বাঁধনের তিন মুখ এক সঙ্গে একখানা কাপড় দিয়ে জ'ড়িয়ে ধোরে এই বীরপুরুষ সেই তিনটে বড় বড় জড়পিণ্ডকে বনের ভিতর দিয়ে এক একটা হেঁচ্‌কাটানে সুড়ঙ্গপথে টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে চ'ল্‌লেন। "জিনিস পত্র ফিরিয়ে দিলে আমাদের ছেড়ে দিবে, কাহারও কাছে এ সব কথা প্রকাশ ক'র্‌বে না," বিশে ডাকাত এই বীরপুরুষের কাছে এই রকম শপথ চাইলে। বীরপুরুষ তলোয়ারের খাপ খুলে সেই বেয়াদবীর উত্তর দিলেন। ডাকাত তখন, তখনই তখনই প্রাণ যায় দেখে, মেয়েদের গহনাগুলি ফিরিয়ে দিতে রাজি হোল,—পাতালের ভিতর যে ঘরটা তাদের লুটের মালের ভাণ্ডার, যোগিনীকে আর বীরপুরুষকে বিশে ডাকাত সেই

ভাণ্ডার-গুহায় নিয়ে গেল। আলো জ্বাল্‌বার উপকরণ যেখানে ছিল, বিশেডাকাত এই বীর পুরুষকে সে সব দেখিয়ে দিলে। ইনি আলো জ্বাল্‌লেন। ঘরটা খালি। ধমক্ দিয়ে ডাকাতকে ইনি ব'ল্‌লেন, প্রতারণা! তখনকার সে অবস্থায় ডাকাতের প্রতারণা থাক্‌বে কেন?—প্রতারণা নয়। বিশেডাকাত পায়ে-পায়ে সোরে-সোরে ঘর্‌টার এক ধারে গিয়ে দাঁড়লো, বীরপুরুষকে সেইখানকার একখানা পাথর তুল্‌তে বোল্লে, তিনি তুল্লেন। পাতালের ভিতর পাতাল! পাথরের নীচে গহ্বর! গহ্বরের ভিতর অনেকপ্রকার দামী দামী জিনিস ঝক্‌মক্ ক'র্‌ছে! বিশে ডাকাতের চক্ষে দর্ দর্ ক'রে জল প'ড়্‌তে লাগ্‌লো! তত শক্ত চড়্‌চড়ে বাঁধন, দুর্গম পথে কাঁটা বনে কাটা কাটা পাথরের উপর তত জোরে টানা হিঁচড়া, কাল সকালে কি হবে, প্রাণের ভিতর তত ভয়, তত শঙ্কটেও—তত যন্ত্রণাতেও ডাকাতের চক্ষে এক ফোঁটাও জল পড়ে নাই, এখন সোণা দেখে কান্না এলো! অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, কর্কশ-ঘর্-ঘর্ স্বরে মায়ামুগ্ধ বিশে ডাকাত শুষ্ক-কণ্ঠে ব'ল্লে "তোমাদের যে কখানা হয় চিনে লও, ঢাকা দিয়ে রাখ! তাদের কাছে নগদ টাকা যা আমি পেয়েছি, তা তোমরা ছুঁয়োনা! ততটা মেহনত ক'রেছি, সেটা কি বিফলে যাবে?" বীরপুরুষ হাস্য কোরে ব'ল্লেন, "তা কেন যাবে! তা ত হবেই, আর কোথায় কি আছে, বল্! আর কখানা পাথর তুল্‌তে হবে, বল্! আর কেন ধনে মায়া বিশ্বেশ্বর? ডাকাতি করা তোমার জন্মের মত ফুরালো। আর কেন মায়া কর, আর কেন চক্ষের জলফেল, বল, কোথায় কি

রেখেছ? এই সময় আমি তোমার একটু উপকার করি। পরকালে তোমার তাতে অনেকটা ভাল হবে, তোমার এই অধর্ম্মের ধন সৎকার্য্যে খরচ হবে, সব আমি চাই না; যে গুলি অলঙ্কার বহু মূল্য, তাই আমি চাই। বাকী সব তোমার থাকবে। আমি তোমাকে প্রাণে মারবো না, বিচারে দিব;—না দিলে অধর্ম্ম হবে, সেই জন্যই বিচারে দিব। পরমায়ু যদি তুমি বেশী এনে থাক, ভগবান্ করুন্ স্বচ্ছন্দে ফিরে এসো;—সৎকার্য্যে মন ফিরিয়ে এই সব ধন আবার এসে ভোগ কোরো। এই বীরপুরুষ সেই ডাকাতের কর্ণে এক সঙ্গে এই এক রকম অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মন্ত্র প'ড়ে দিলেন। ডাকাতের মনে ক্ষণেকের জন্য বৈরাগ্য এলো। গুপ্তধনের সন্ধান নিদর্শনে ডাকাত তখন নিশ্বাস ফেলে মনের কপাট খুলে দিলে। খণ্ডে খণ্ডে ষোলখানা পাথর, এই বীরপুরুষ সেই ষোলটা গহ্বরের মহামূল্য মণিমুক্তা, ভাল ভাল মণিময় অলঙ্কার, অগুন্তি স্বর্ণ-মোহর, একটা বস্তাবন্দী ক'রে নিলেন। এই আমাদের সম্মুখে ডাকাতদের পাশে ঐ সেই বস্তা। সে ঘর থেকে তাঁরা বেরিয়ে এলেন। যোগিনী সঙ্গে সঙ্গে আছেন, কিন্তু মৌনবতী। যে দুজন ডাকাতকে বাহিরে বেঁধে রেখে গিয়েছিলেন, তারা জেগে বোসে আছে। হাত বাঁধা বিশে এসে তাদের কাছে দাঁড়াল। "বাঁধন খুলে দাও, তবে আমরা থাকি" বীরপুরুষের দিকে কট্‌মট্‌ ক'রে চেয়ে বিশে নিজেই বীরপুরুষকে এই কথা ব'ল্‌লে;—ঠিক্‌ যেন হুকুম ক'র্‌লে। বীরপুরুষ হাস্য ক'র্‌লেন, মনে মনে কি ভাব্‌লেন;—যে কটা ডাকাত মাতাল

হোয়ে প'ড়ে আছে, তাদের গতি কি করা যায়? নেশা ছুট্‌লেই ত উঠ্‌বে, সর্দ্দারকে দে'খ্‌তে পাবে না, এ ছুটো সঙ্গীকেও খুঁজে পাবে না, তবেই ত ভয় পেয়ে পালাবে? একান্তই যদি না পালায়, ছড়িভঙ্গ হোয়ে প'ড়্‌বে। করা যায় কি? মনে মনে এইরূপ চিন্তা কোরে রাত্রের মত মাতাল গুলোকে বেঁধে রাখাই স্থির ক'র্‌লেন। সে রাত্রে সেই পাতাল-কেল্লায় ডাকাত বড় বেশী ছিলনা। বাঁধা তিনটেকে ধ'রে সব শুদ্ধ গুস্তিতে এগারজন। তিনটে বাঁধা, আট্‌টা খোলা। বীরপুরুষ সেই আট জনকে উলঙ্গ ক'রে, তাদেরই কাপড়ে তাদের সকল গুলোকে হাতে, পায়ে, গলায়, বড় বড় পাথরের সঙ্গে বেঁধে রাখ্‌লেন। বীরপুরুষের এ কার্য্যে একবারও যোগিনীর কোন সাহায্য আবশ্যক হো'ল না। যোগিনী ব'ল্‌লেন, "বীরপুরুষ একাকী নন, সঙ্গে অনেক অস্ত্রধারী সেনা আছে। তাদেরও সব ঘোড়া আছে। তারাও সব এরই আশে পাশে বনের ভিতর লুকিয়ে আছে। বীরপুরুষের সঙ্গে সোণার মুখ বাঁধা মহিষের শৃঙ্গের এক বাঁশী আছে। সঙ্কেত আছে, সেই বাঁশীর আওয়াজ শুন্‌লেই চকিত মাত্রে তারা সব বংশীধারীর কাছে এসে জুট্‌বে। ঘোড়া ছুট্‌য়েই হোক্, কিম্বা কাঁটাবনে পাঁও দলেই হোক্ বাঁশী বাজ্‌লে তারা আর তিলেক মাত্রও দেরী ক'র্‌বে না;—ছুই তিনবার চক্ষের পলক প'ড়তে না প'ড়্‌তেই বিদ্যুতের মত এসে জুটবে। জুটতও তাই; আবশ্যক হোল না। বীরপুরুষ একাকীই মাতাল গুলোকে বাঁধলেন, বীরপুরুষ একাকীই সেই আগেকার ডাকাত

তিনটেকে আর সেই দৌলতের বস্তাটীকে সুড়ঙ্গ পথে হড়্ হড়্ ক'রে টেনে আন্লেন, উপরে উঠে শেষকালে ঘোড়ার পিটে চাপালেন।” তার পর আমাদের কাছে এলেন। আমরা সেই বনের মাঝ খানেই ব'সে আছি।

সকৌতুকে বাঁশীর কথা আমি মনে মনে আলোচনা ক'র্‌ছি, অকস্মাৎ কটিবন্ধ থেকে বাহির কোরে বীরপুরুষ সেই বাঁশীটী বাজিয়ে দিলেন। সন্ধ্যাকালে একটা বনে একটা শেয়ালের আওয়াজ শুনে দূরে নিকটে সমস্ত বনবাসী শেয়াল যেমন এক সঙ্গে সমস্বরে চীৎকার কোরে উঠে, বীরপুরুষের বংশীধ্বনি হবামাত্রেই 'পোঁ পাঁ, পোঁ ভোঁ, চিঁ চিঁ, শী শী, পীঁ পীঁ' ইত্যাদি নানারবে বনের ভিতর চতুর্দ্দিক থেকে, সেইরূপ বহু বংশীধ্বনি সমুত্থিত! বোধ হ'ল যেন, ঊষা আগমনে শত শত বনবাসী পক্ষী নানাদিকে এককালে কলরব ক'রে উঠ্‌লো,—বনমধ্যে বায়ু পথে, আকাশ পথে শত শত ভোঁ ভা শব্দের প্রতিধ্বনি হ'তে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে অনেক গুলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ। একটু পরেই সে শব্দ থেমে গেল, বাঁশীর প্রতিধ্বনিও থাম্‌লো। দুই তিন লহমার মধ্যে দেখি, কালো কালো বীর-বেশ পরা, বড় বড় বল্লমধারী চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জন সৈনিক পুরুষ আমাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত। এসেই তারা অস্ত্রস্পর্শ কোরে বীরপুরুষের দিকে মাথা নোয়ালে। বীরপুরুষ সহসা গাত্রোত্থান ক'রলেন। নূতন আগত দলের মধ্যে, যে ব্যক্তিকে সর্দ্দার বোধ হ'ল, সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন ক'রে, প্রশান্ত গম্ভীর আদেশের স্বরে বীরপুরুষ বল্‌লেন, “যাও, দশ জন যাও।

বরাবর সুড়ঙ্গ পথে চোলে যাও। গোটা কতক কুকুর আমরা বেঁধে রেখে এসেছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভাত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা পাহারা থাক। কুকুর গুলোর আকার মানুষের মত, খুব শক্ত বাঁধনে বাধা আছে—পালাতে পারবে না, তবু কি জানি, পাহারা থাকা ভাল। বাঁধা কটা ছাড়া, সত্য সত্য আর গোটাকতক আলগা কুকুর আছে, সেগুলো এই বোম্বেটে-দের ডালকোত্তা! যদি কয়েদ ক'রে ধ'রে বেঁধে ফেলতে পার, চেষ্টা দেখো, একান্ত যদি না পার, গুলি কোরে মেরে ফেলো। প্রভাত কাল পর্য্যন্ত আমরা এখানে থাক্‌বো না। প্রভাতে তোমরা, তোমাদের জিম্মার ডাকাতগুলোকে নিয়ে, বরাবর সহরের কোতয়ালিতে যেও, সেইখানে আমার সঙ্গে দেখা হবে। যাও, শীঘ্র যাও! যদি আলো জ্বাল্‌বার দরকার হয়, ডাকাতদের ঘরে অনেক মশাল আছে, আংটা আংটা আগুন আছে, জ্বেলে নিও। যাও, বিদায় পাও!"

একজন দলপতির সঙ্গে দশ জন বল্লমধারী বন্দুকধারী যোদ্ধা পুরুষ, তৎক্ষণাৎ সুড়ঙ্গপথের দিকে চ'লে গেল। যারা থাক্‌লো, তাদের মধ্যে একজনকে বীরপুরুষ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "ঘোড়া কটা আছে?"

কেহই ঘোড়া ছাড়া আসে নাই। যে কজন এসেছে, তাও বীরপুরুষের জানা, তবে এ রকম অদ্ভুত প্রশ্ন কেন, ভাব বুঝ্‌তে না পেরে, উত্তর দিতে, লোকটা একটু থতমত খেয়ে গেল। ইতস্ততঃ দেখে বীরপুরুষ আবার ব'ল্লেন, 'সে কথা নয়; গোটা-কতক খালি ঘোড়া আন্‌তে ব'লেছিলেম,'সে রকম আছে কটা?

লোক উত্তর ক'ল্লে "তিনটা।"

মনে মনে কি চিন্তা ক'রে, পরক্ষণেই বীরপুরুষ বল্‌লেন "আচ্ছা থাক, চাই না। যারা সুড়ঙ্গে গেল, তাদের সঙ্গে অনেকগুলো ডাকাত থাক্‌বে,—একটু না হয় বিলম্বই হবে, তারা সব হেঁটেই আস্‌বে, এখন তোমরা চল।" আর কোন কথাই না। খানিক দূর ঘোড়া যাবে না, অনুচরেরা তফাতে ঘোড়া রে'খে পদব্রজেই এসেছে। খালি ঘোড়া যেতে পারে, শওয়ার নিয়ে যে'তে পারে না! লোকেদের মধ্যে একজন বীরপুরুষ ঘোড়াটীর লাগাম ধ'রে দাঁড়াল; একজন সেই মালের বস্তাটা কাঁধে কো'রে ঝুলিয়ে নিলে আর দুজন দুগাছা বল্লম একত্র ক'রে, সেই তিনটে বাঁধা ডাকাতের বাঁধনের ভিতর দিয়ে—যেমন ক'রে শূওর ঝুলায়, সেই রকমে ঝুলিয়ে নিয়ে চল্লো, তার পশ্চাতে আমরা সারি গাঁথা,—সম্মুখে যোগিনী, পশ্চাতে বীরপুরুষ, সর্ব্ব পশ্চাতে ঘোড়া। সর্ব্ব অগ্রে অবশিষ্ট অস্ত্রধারী সেনা। তাহাদের এক জনের হাতে সেই প্রজ্বলিত মশাল। এইরূপে আমরা প্রায় এক রশী দেড় রশী কণ্টকাকীর্ণ সংকীর্ণ বনপথ অতিক্রম ক'র্‌লেম। তার পর একটা খোলা জায়গায় এসে পো'ড়লেম্। বন আছে, বড় বড় গাছ পালা আছে, কিন্তু ঠাঁই ঠাঁই প্রশস্ত। যাওয়া আসার কোন ব্যাঘাত হয় না। সেই খানে আমাদের ঘোড়ার উপর তুল্‌বার পরামর্শ হলো। সঙ্গী সেনারা সেই খানেই সব ঘোড়া রেখে গিয়েছিল। আমাদের ত কোন কালে ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস নাই, কোন শওয়ারের কাছে বসে যাওয়াও অসাধ্য, কি

উপায়ে ঘোড়ায় উঠা হয়, না উঠ্‌লেও রাত্রি থাক্‌তে থাক্‌তে নিরাপদ স্থানে পৌঁছান যায় না;—কাজে কাজেই, অঙ্গবস্ত্রে বিমণ্ডিত হয়ে, এক একজন শওয়ারের পশ্চাতে ঘোড়ার পেটের সঙ্গে কাপড় বেঁধে আমাদের জড়-সড় হ'য়ে বোস্‌তে হ'লো। ডাকাতেরা তখন ত কাঁধেই আছে। ব্যবস্থা করবার—অপর সকলের ঘোড়ায় চড়বার উপক্রম হ'চ্চে, আমার গায়ে একটু একটু সুখের বাতাস লা'গ্‌ছে, এমন সময় বাম দিকের বনের ভিতর থে'কে, একটা বহুকণ্ঠ মিশ্রিত বিকট চীৎকারধ্বনি আমাদের কাণে এলো। "কিসের গোলমাল? কিসের আলো? কে যায়—কে যায়?" জনকতক লোক এই রকম হুংকার ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে, যে দিকে আমরা আছি, সেই দিকে ছুটে আস্‌তে লাগ্‌লো। বোধ হ'লো যেন, অন্ধকারের ভিতর থেকে ছুটে বেরুলো। মরিয়া হোয়ে ছুটে এসে, বীরপুরুষের সঙ্গীলোকগুলির সঙ্গে, কড়া কড়া বচসা আরম্ভ কোর্‌লে। যে দিক থেকে তারা ছুটে এলো, অকস্মাৎ সেই দিকে "গুড়ুম গুড়ুম" কো'রে গোটা দুই তিন বন্দুকের আওয়াজ হ'লো। আবার অকস্মাৎ পাঁচ সাতটা কালো কালো পলোয়ান বাঘের মত লাফাতে লাফাতে ঘন ঘন গর্জ্জন কোর্ত্তে কোর্ত্তে সেই খানে এসে জমা হলো, যেন উড়ে এসে প'ড়্‌লো।—হাতা-হাতী, কিলাকিলী, চুলাচুলী বেধে গেল;—অস্ত্র চালাচালী হয় আর কি!

বীরপুরুষ তখন অশ্বারোহন করেছিলেন। চক্রাকারে ঘোড়া ফিরিয়ে উভয় দলের সম্মুখবর্ত্তী হ'লেন। গভীর গর্জ্জনে

জিজ্ঞাসা কোর্‌লেন, "কারা তোরা?" একটা লোক উত্তর কোর্‌লে, "চেন আমাদের? আমরা দাস ;—মা ভবানীর চেলা! যমের হাতে পড়েছ! এই বনের মাঝখানে গড়াগড়ি যাবে!"

তারাও ডাকাত। বিশে ডাকাতের দলবল, ... ঘুরে বেড়ায়, ঠাঁই ঠাঁই আড্ডা ;—জেলার ভিতর ... এনে বিশে আরও ভাগ ক'রে আট ঘাট বাঁধ্‌বার ..., ঠাঁই ঠাঁই নূতন আড্ডা বসায়। এরাও বোধ হয় নূতন ... লোক। ওতে-ঘাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, খানিকক্ষণ ... সব অশ্বারোহী বল্লমধারী লোকজন বসে আসে, ... এসেছে, ঘোড়া থেকে নেমেছে, ঘোড়া বেঁধে রেখেছে, ... কথা কয়েছে, অবশ্যই বিলম্ব ক'রেছে, তখন ওরা ... ছিলনা, থাকলে সেই সময়েই গোলযোগ হোতো। ... ও দিকে দিকে পাহারায় ছিল, এখন এসে এই দিকে জু... আমার ভয় হোতে লাগ্‌লো, আবার না জানি কপালে কি ঘটে।

বীরপুরুষ সমীপবর্ত্তী হোলেন। বিনা রক্তপাতে গোল-মাল যদি মিটে যায়, ভালই হয়। সেই অভিপ্রায়ে তাদের তিনি মিষ্টকথায় ব'ল্‌লেন, "কারা তোমরা? কেন এসেছ? ফিরে যাও। দেখ্‌ছ এসব ভদ্রলোকের মেয়ে ; এদের আমি ডাকাতের আড্ডা থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাচ্ছি। বাধা দিও না। অস্ত্র বাহির কোরো না। যদি ডাকাত হও, বিশ্বেশ্বরের নাম, এ কথার মানে যদি ঠিক বুঝে থাকি, তোমাদের চেহারা, তোমা-

দের কথা, তোমাদের জুলুন, তোমাদের কাজ, যদি আমি ঠিক ঠিক বুঝে থাকি, নিশ্চয়ই তোমরা ডাকাত। মানুষের প্রাণে ডাকাতের কোন দরকার নাই। যদি তোমাদের ধনের আকাঙ্ক্ষা থাকে, রজনী প্রভাতে অমুক ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা ক'রো, এখন ভালয় ভালয় ফিরে যাও।"

তলোয়ারের আধখানা খাপ খুলে একজন ডাকাত, বুক চিতিয়ে, গোঁফ ফুলিয়ে, কর্কশস্বরে ব'ল্‌লে, "ব্যাটা যেন আমাদের গুরুঠাকুর! পরকাল বোঝাতে এসেছে! প্রাণে কোন দরকার নাই! ধর্ বেটাকে! ওর প্রাণটাই আগে ছিঁড়ে ফ্যাল্! তার পর সবগুলোর মুণ্ডুপাত! খণ্ড খণ্ড—মূলকুঁচি!"

সব কজন ডাকাত ঐ লোকটার ঐ কথার প্রতিধ্বনি ক'রে গোর্জ্জে উঠলো। 'ধর্ ব্যাটাকে—মার্ বেটাকে—কাট্ বেটাকে!'

বীরপুরুষ তখনও সুস্থির। তখনও তাঁর মুখে বাঁশী। যোগিনী একবার দক্ষিণ দিকে একটু হেলে, ডাকাত কটার মুখের চেহারা দেখে নিলেন। অভিপ্রায় কি, বুঝ্‌তে পারা গেল না। মুষ্টিবন্ধনে তলোয়ারের বাঁটখানা বেষ্টন ক'রে ধোরে, ডাকাতদের দিকে চেয়ে, অনুচরের স্কন্ধে শূণ্ডের ঝোলা তিনটে ডাকাতের মধ্যে একটার দিকে তরবারি হেলিয়ে, বীর পুরুষ গম্ভীরস্বরে বোল্লেন, "ভাই ডাকাত! দেখ দেখি, এই লোকটার দিকে চেয়ে, চিন্‌তে পার কি? এই তোমাদের সর্দ্দার,—এই তোমাদের দিক্‌বিজয়ী বিশ্বেশ্বর! এই দশা পেতে চাও কি? আমি তোমাদের প্রাণে মার্‌বো না, এদেশের আমি রাজা নই, এদেশের বিচার আমার হাতে নয়, বিচারে আমি দিব! এই

দশা পেতে চাও কি? ফিরে যাও। ডাকাতই হও আর যাই হও, প্রাণ বড় ধন; প্রাণ নিয়ে ফিরে যাও। যদি বাধা দাও, এক কথার উপর যদি দুকথা বল, যদি অস্ত্র চালাবার ভয় দেখাও, ঐ দশা হবে! এখনই হবে!”

ডাকাতেরা ভয় পেলে। বিশ্বেশ্বরের ঐ দশা হ’য়েছে দেখে, তারা প্রকাশ্যরূপেই কেঁপে উঠ্‌লো। যে লোকটা তলোয়ারের আধখানা খাপ্‌ খুলেছিল, তলোয়ারের বাঁট থেকে তার হাতখানা অবশ হোয়ে খ’সে প’ড়্‌লো। তাদের ভিতর দুজন লোক বড় বড় দুগাছা সড় কি উঁচু কোরে, বিশ্বেশ্বরকে খালাস ক’র্‌বার মত্‌লবে, “রে রে রে রে” চীৎকারে সম্মুখদিকে লাফিয়ে এসে প’ড়্‌লো! এ দলের যে দুজন সেনা, সঙ্গীসহ বন্দী বিশ্বেশ্বরকে কাঁদে ক’রে আছে, দুজন সড়্‌কিওয়ালার মধ্যে একজন, সেই দুজন বাহকের মধ্যে একজনের দক্ষিণ বাহুতে সজোরে সড়্‌কি বিঁধে দিলে। লোকটা দারুণ যন্ত্রণায় চীৎকার কোরে ভার ছেড়ে দিয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ভূতলে প’ড়ে গেল! যেমন পড়া, অমনি অজ্ঞান! এক দিক্‌ শূন্য হওয়াতে বল্লাম দুগাছা স’রে প’ড়্‌লো, বড় বড় তিন্‌টে ডাকাতের বস্তা এক সঙ্গে টিপ্‌ টাপ্‌ ক’রে মাটিতে প’ড়ে গেল।

চক্ষের পলক প’ড়্‌তে বরং বিলম্ব হয়, ধনুক থেকে তীর ছুটে যেতে বরং বিলম্ব হয়, চপলার চঞ্চলা হাস্যরেখা মেঘের কোলে মিলিয়ে যেতে বরং বিলম্ব হয়, সে ক্ষেত্রের কর্ত্তব্য অবধারণে, আমাদের উদ্ধার কর্ত্তা বীরপুরুষের ততটুকুমাত্রও বিলম্ব হোল না। তাঁর অশ্ব তখন সেই ক্ষুদ্র রণক্ষেত্রমণ্ডলে কুম্ভকার

চক্রের মত ভোঁ ভোঁ ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো। কাহারও হস্তে, কাহারও পদে, কাহারও অঙ্গুলীতে, কাহারও মস্তকে, ঘন ঘন তলোয়ারের বাঁটের আঘাত ক'রে বীরপুরুষ সেই ডাকাতকটাকে হতবুদ্ধি ক'রে তুল্লেন; সেই অবকাশে একে একে সকলগুলোকে নিরস্ত্র ক'রে ফেল্লেন। কে কখন কোন্ দিক্ থেকে এসে কি থারকানা ক'র্‌ছে, ঘোড়ার অবিরত ঘূর্ণনে ডাকাতেরা আপ্‌না আপ্‌নি সেটা অনুভব ক'র্‌তেই পার্‌লে না। অনুচর পুরুষগণের সাহায্যে, বীরপুরুষ তৎক্ষণাৎ সেই ডাকাতগুলোকে কায়দা কোরে বেঁধে ফেল্লেন; এক একটা ঘোড়ার পশ্চাতে এক একটাকে ঝুলিয়ে দিলেন। গণনায় তারা বার জন। এগারটা ঘোড়া খালি আস্‌ছে। তাদের পিঠেও গোটা পাচেক ডাকাতকে খুব শক্ত ক'রে বেঁধে দেওয়া হোল। সব ঠিক্ ঠাক্ কোরে সকলে আবার যে যার আপন আপন ঘোড়ার উপর চ'ড়ে ব'স্‌লো। ডাকাতের সড়্‌কির আঘাতে আহত লোকটীকে, একজন ঘোড়সওয়ার আপন ঘোড়ার জিনের উপর যত্ন ক'রে নিয়ে বসালে। এক হাতে তাকে বেষ্টন ক'রে ধ'রে রইল। লোকটী তখন অজ্ঞান নয়, অল্প অল্প চৈতন্য হোয়েছে। বনপথ এখনও অনেকটা বাকী। আবার যদি কোথাও ডাকাতের লোক ওত্ ক'রে থাকে, সাক্ষাৎ ক'র্‌বার জন্য সকলেই প্রস্তুত হোয়ে থাক্‌লো। আমাদের ঘোড়ারা তখন অল্প অল্প বেগে অগ্রসর হোতে আরম্ভ ক'র্‌লে। বীরপুরুষ এবার সকলের পশ্চাতে।

আমরা আস্‌ছি। পথে আর কোন গোলমাল নাই

আপনাদের মধ্যে কাহারও মুখে কোন বাক্যও নাই। আমাদের ঘোড়ারা কোথাও বেগে, কোথাও কদমে, কোথাও বা আরও ধীরে, বহুক্ষণে বনপথ অতিক্রম কোরে, বাহির বাতাসে এসে দাঁড়ালো। আমার বুকে আবার একটু সুখের বাতাস লাগ্‌লো। সম্মুখে একটী নদী। আমরা সেই নদীতীরে ঘোড়া থেকে নাব্‌লেম। রাত্রিও ফর্সা হোয়ে এসেছে। নদীটী পার হোয়ে ওপারে যাওয়া, কেবল তা নয়। নদীপথে আরও পাঁচ সাত ক্রোশ আমাদের যাওয়া দরকার। ঘোড়ারা কি কোরে যায়? সেনাদের মধ্যে একজন সেইখানে ঘোড়াদের হেফাযতের জন্য থাক্‌লো; সময়ক্রমে নৌকা কোরে পার হোয়ে, ঘোড়াদের পার কোরে ওপারের হাঁটাপথে চোলে যাবে, এই রকম ব্যবস্থা হোল। সেই সময়ের মধ্যে পাতালপুরীর লোকেরাও ঐ নদীতীরে এসে জুট্‌বে, এক সঙ্গে পার হবে।

আমাদের পার হবার বিলম্ব হোল। সম্পূর্ণ প্রভাত হয় নাই, ঊষাকাল। নদীকূলে নৌকা নাই। সূর্য্যোদয়ের পর একখানি নৌকা দেখা দিল। সেই নৌকার মাঝিকে হুকুম দিয়ে আমাদের বীরপুরুষ আর পাঁচখানি নৌকা আনালেন। একখানি নৌকাতে আমরা কটী স্ত্রীলোক আরোহণ ক'র্‌লেম, বাকী পাঁচখানিতে আর সব লোক। বীরপুরুষ আমাদের নৌকায় থাক্‌লেন না। আশ্চর্য্য! এতক্ষণ মনের উৎকণ্ঠায়—বিপদের ঘূর্ণনে মাথার ঠিক্ ছিল না, এখন নৌকার ভিতর চেয়ে দেখি, যোগিনী নাই!

পঞ্চদশ তরঙ্গ।

মোহন পুরী।

জাল ব্রজবাসীদের মায়ায় বিমুগ্ধ হোয়ে, সকলে মিলে যে পুরী থেকে বেরিয়ে, বৃন্দাবনে যাওয়ার আশায় বৃন্দাবনের নৌকায় উঠেছিলেম, ডাকাত নির্ম্মূল কোরে, বনপথ পার হোয়ে, যে দিন উষাকালে নদীতীরে পৌঁছি, সেই দিন বেলা দুই প্রহরের সময় সেই পুরীতেই পুনঃ প্রবেশ কর্‌লেম। সঙ্গে আছেন সেই বীরবেশী যুবাপুরুষ। তিনি এপুরী কেমন কোরে চিন্‌লেন! যোগিনী নাই, মঙ্গলাকে কি আমাকে কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রে নাই, দাঁড়ি মাঝিও অজানা, বিদেশী, তবে কি কোরে ঠিক্ বাড়ীখানি চিন্‌লেন! ইনি কি তবে এই বাড়ীর লোক হবেন! কিম্বা হয় ত এখানে যাওয়া আশা আছে, মঙ্গলারা এই বাড়ীর মেয়ে, তাও হয় ত জানেন। আমাকেও ত জানেন! একি আশ্চর্য্য সংঘটন! আমরা যে পাতালের ভিতর ডাকাতের কেল্লায় বন্দিনী, ইনিই বা সে সন্ধান কেমন ক'রে পেলেন? আমাদের উদ্ধার ক'র্‌বার জন্যে, কেনই বা—কি অভিপ্রায়ে অত লোকজন সঙ্গে কোরে, অকস্মাৎ বনের ভিতর পাতাল পুরীতে গিয়ে দেখা দিলেন, তাৎপর্য্য কি! দেখা হোয়ে অবধি একটীও কথা,

আমার সম্বন্ধে কি ভগ্নীদের সম্বন্ধে, মুখফুটে বোল্লেন না, তাৎপর্য্য কি ?—অথচ দেখ্‌চি চেনা মানুষ!

এই সকল ভাবনা যখন আমার মনে উদয় হোয়েছিল, তখন আমরা ছাড়া ছাড়া,—আমি তখন একটী নির্জ্জন ঘরে একাকিনী। সব কথা যেন ভুলে গিয়ে, তখন কেবল ঐ কথাই আমি সারাক্ষণটা ভাব্‌ছি, অথচ দেখ্‌চি চেনা মানুষ! জীবনচক্রের যে কত ফের-ফার, একটা এই সামান্য পুরীর মধ্যেই আমাকে নিয়ে—আমার জীবনকে নিয়ে, বালিকা বয়েসেই আমি তার অনেকটা অনুমান কোরে নিতে পার্‌লেম। এই এক পুরীতেই কত ব্যাপার! অনুদ্দিষ্ট পথে এক অচেনা লোকের জাহাজে এই পুরীতে আসি, রাত্রে বিভীষিকা রকমে এক অপরিচিত নূতন মূর্ত্তি দেখি! এই পুরীতেই আবার আমায় ডাকাতে ধরে! যোগিনী আবার আমাকে এই পুরীতেই আনেন! অন্ধকার রাত্রে ঠাকুরবাড়ীতে এক সোমরাজের অপরূপ খেলা দেখি! তার পর সোমরাজের পলায়ন,—নূতন নূতন লোক মারফতে দুই জায়গার দুইখানা চিঠি,—নিশ্চয়ই জাল চিঠি, সন্দেহ নাই,—ডাকাতের বিচারের সময় সেটা ভালই জানা যাবে,—চিঠির সঙ্গে ব্রজবাসী দর্শন,—ব্রজবাসী দ্বারা জলপথে হরণ,—তার পর আবার অলৌকিক উদ্ধারের পর সেই পুরীতেই প্রত্যাগমন। সঙ্গীপুরুষ ইচ্ছা কোরেই ভাব দেখাচ্ছেন, অপরিচিত! অথচ দেখ্‌ছি, চেনা মানুষ! এ পুরীটার কাণ্ড-কারখানা কি ? কোন্ জায়গায় এ বাড়ী, আগে ঠিক্ জান্‌তেম না। সেই দিনের নৌকায় দাঁড়ি মাঝিদের মুখে শুনেছি, এ জায়গার নাম

মোহন পুরী ! এখান থেকে কাশী বার ক্রোশ, বিন্ধ্যাচল উনিশ ক্রোশ। যে নদীর ধারে বাড়ী, সে নদীটী গঙ্গা। গঙ্গার সেখানটা বড় ক্ষুধা; ক্রমাগত মোহন পুরীর দিক্‌টা হাঁ কোরে কোরে খেতে খেতে আস্‌ছে। বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই বোধ হয় মোহনপুরী জলময়ী হোয়ে যাবে !

মোহন পুরী! ঠিক্ মিলেছে! এখানকার কাণ্ডখানা যা কিছু দেখ্‌ছি, সমস্তই যেন মোহন-মন্ত্র-মাখা! আমি যদি মোহন পুরীর সাদা মানে করি, নিশ্চয়ই বোল্‌ব, জাহুপুরী! সত্য সত্যই আমার চক্ষে সমস্তই ইন্দ্রজাল ঠেক্‌ছে! আমিও ইন্দ্রজালে বন্দিনী, আমার উদ্ধারকর্ত্তাও ইন্দ্রজাল, উদ্ধারের প্রণালীও ইন্দ্রজাল! জন্ম আমার শুভক্ষণে হোয়েছে কি অশুভক্ষণে হোয়েছে, এ প্রকার ঘন ঘন ইন্দ্রজালের খেলা দেখে, সেটা ত আমি এখন নির্ণয়ই ক'র্‌তে পার্‌ছি না। নিরাশা সাগরে ডুব দিয়ে এত দিন আমি ভাব্‌তেম, চির দুঃখিনী হোয়ে জন্মেছি, চির দুঃখিনী হোয়ে থাক্‌বো, চিরদুঃখিনী বেশে যমালয়ে যাব। সত্য—সত্য পাঠক মহাশয়! এত দিন আমি এই রকম ভাব্‌তেম। এখন এই মায়াধামে নূতন নূতন মায়া দেখে, ঘোর অন্ধকার গহ্বরের ভিতর একটু একটু মিট্‌মিটে আশাদীপ যেন জ্বোল্‌ছে। দূরে কি নিকটে জানি না; বোধ হ'চ্চে যেন, একটু একটু শুভদিন এক দিক্ থেকে উঁকি মার্‌ছে। বোধ হ'চ্ছে যেন, দুই একদিনের জন্তও গ্রহদেবতারা এই অভাগিনীর প্রতি সদয় নয়নে মুখ তুলে চাইবেন।

আবার দেখুন; এক যোগিনী! তিনি ত সাক্ষাৎ ইন্দ্রজাল

মূর্ত্তিমতি! আমার সঙ্গে দেখা অল্পদিন; প্রথম দিন ত বিন্ধ্যাচল থেকে মোহন পুরীতে উড়ে এলেন, যাবার সময় কোথা দিয়ে গেলেন, কিছুই জান্‌তে পার্‌লেম না! হঠাৎ আবার ডাকাতের পাতাল পুরীতে বিপদ্‌কালে গিয়ে দেখা দিলেন! আমাদের উদ্ধার কর্‌বার জন্যে বীরপুরুষ জুটালেন! ডাকাত ধরা, ডাকাত বাঁধা, আমাদের সব উদ্ধার করা, কত সৃষ্টিই কর্‌লেন! শেষকালে আবার নদী তীরে এসে অন্তর্দ্ধান হোলেন। তিনি সব কর্ত্তে পারেন। মঙ্গলা যা বোলেছে তাই! মায়াবলে তিনি সব কোর্ত্তে পারেন! মায়া আমি ভালবাসি না, মায়াতে সংসারে কেবল দুঃখ বাড়ে বই কমে না। তবে এখন মায়ার নামে আমার আহ্লাদ হোচ্ছে কেন মায়াবল আমার সহায় থাক্‌লে, দুষ্টলোকে শীঘ্র আমাকে পৃথিবী থেকে ঠেলে ফেলতে পার্‌বে না। দেখ্‌ছি যখন, দেখ্‌ব তখন অদৃষ্টের ভোগ কতদূর যায়!

অনেকক্ষণ একাকিনী আছি। একজন কেহ নিকটে এলে ভাল হয়, মনে মনে এইরূপ আকিঞ্চন আস্‌ছে, হাস্‌তে হাস্‌তে জয়মঙ্গলা এসে উপস্থিত। ঘরে প্রবেশ কর্‌বার আগে থেকেই, জয়মঙ্গলা সহাস্যবদনে ব'লে উঠ্‌লো, "কি গো রাজকন্যে! দেশের খবর সব শুনেছ?"

বুঝ্‌তে পার্‌লেম, আমার মুখখানি তখন ম্লান হোয়ে গেল। মনে বড় ব্যথা পেয়ে জয়মঙ্গলাকে আমি বোল্লেম, "দেশের খবর দেশেই থাক্‌, তুমি আমাকে আজ্ রাজকন্যে ব'লে ঠাট্ট কোর্‌লে কেন, সেই ব্যথাই বড় বাজ্‌লো এতকাল এক

দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু জয়মঙ্গলা! তোমার মুখের পরিহাসে আজ্ যে দুঃখ পেলেম, এমন দুঃখ আর——”

আমার মুখের কথাগুলি সমাপ্ত হোতে না দিয়েই, জয়মঙ্গলা বেশ্ মনের আমোদে হাস্‌তে হাস্‌তে আমাকে বোল্‌লে, “পরিহাস নয় কুঞ্জবালা! পরিহাস নয়! আমরা অন্ধকারে ছিলেম, তুমিও অন্ধকারে ছিলে, আজ্ আমি সব জান্‌তে পেরেছি। সে সব কথা আজ্ আমি তোমাকে বোল্‌ব না, বল্‌বার বাধা আছে,—নিষেধ আছে, তুমি রাজকন্যে, ক্রমে ক্রমেই সব জান্‌তে পার্‌বে। মেঘেরা সব ফর্সা হোয়ে গেছে, তোমার শুভ-সূর্য্য, শুভচন্দ্র উদয় হবার দিন নিকটবর্ত্তী হোয়ে এসেছে। এইটুকু বল্‌বার আদেশ।”

আমি সচঞ্চলে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কোর্‌লেম, “কার আদেশ?”

জয়মঙ্গলা বোল্লে, “কার আদেশ” তাও বলা নিষিদ্ধ—তাও বল্‌বার আদেশ নাই। কিন্তু তা বোলে চিরদিন নিষিদ্ধ থাক্‌বে না, তুমি এই কথাটী মনে রেখো। বেশী আহ্লাদে উন্মত্ত হোয়ো না। বেশী আহ্লাদে মানুষ মারা পড়ে, বেশী আহ্লাদ হবে বোলেই আজ্ আমি সব কথা তোমাকে বোল্লেম না। এখন আমার পরামর্শটা হোচ্ছে এই, সাহসের ভাগ বেশী কর, ভয়ের ভাগ কম রাখ। ওসব কথা এখন চাপা থাক্। সহরের একটা খোস্‌খবর শোন। ডাকাতগুলো সব সহরে এসে পৌঁছেচে। যতগুলো আমরা দেখে এসেছি, যে কটার কথা আমরা শুনেছি, তা ছাড়া আরও জনকতক নূতন

ডাকাত ধরা পোড়েছে! ভোর বেলা জনকতক ডাকাত কেল্লার ভিতর প্রবেশ কোরেছিল। কেল্লার প্রহরীরা তাদের ঘেরাও কোরে ধোরে, আত্মসাবধানের জন্য দুবার গুলি কোরে সব কটাকে গ্রেপ্তার কোরেছে। দুট নাকি আধমরা হোয়েছে। সবশুদ্ধ মাথা গুন্তিতে ডাকাত এখন পঞ্চাশজন। কোতয়ালীতে দেওয়া হোয়েছে, আজ্ তারা কোতয়ালীতে থাক্‌বে, কাল চালান হবে।"

আমি একবার বনের ভিতর মনে মনে যেটা ভেবেছিলেম, দেখি, জয়মঙ্গলাই বা কি বলে, সেইটী জান্‌বার জন্যই, সেই খানে আমি একটা বাজে ফ্যাক্‌ড়া তুলে ফেল্‌লেম। তা যদি না হোত, ডাকাত ধরার কোন নূতন কথা নাই, সুতরাং আমি জয়মঙ্গলার ওকথাটা ঐ পর্য্যন্তই সেরে দিতে বল্‌তেম। কিন্তু জয়মঙ্গলার মনের ভাব একটু জান্‌বার আবশ্যক ছিল। জয়মঙ্গলাকে আমি জিজ্ঞাসা কোর্‌লেম, "আচ্ছা দিদি! এই যে এখনকার সব রাজাদের চূড়ান্ত বিচারে, বড় বড় খুনী ডাকাতের মত অপরাধীদের ফাঁসী দেওয়া হয়, মাথা কাটা হয়, শূলে চড়ান হয়, এটা কি তুমি ভালবাস?"

জয়মঙ্গলা বার বার মাথা নাড়া দিয়ে, মুখ ভারি কোরে সতেজস্বরে বল্‌লে, "কাপুরুষের কাজ। রাজাই হউন, আর যিনিই হউন, স্পষ্ট কথা আমি বল্‌ব, মানুষ হোয়ে মানুষ মারা কাপুরুষের কাজ। কোন উপকারী মরা লোকের প্রাণ যদি কেউ দিতে পার্‌তো, তা হ'লে বরং অপকারী জীবন্ত লোকের প্রাণ নিতে পার্‌তো। তা যখন পারে না, ওটাও পারে না।

আর সেটা মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তও নয়, বেঁচে থেকে চিরজীবন মহা শাস্তি ভোগ করে, সেইটাই উচিত প্রায়শ্চিত্ত।”

আমার মতে জয়মঙ্গলার মত নিলে গেল। একটু চিন্তা কোরে জয়মঙ্গলাকে আমি বোল্লেন, “যে বীরপুরুষ আমাদের উদ্ধার কোরে এনেছেন, তাঁর সঙ্গে তোমার কথা হয় ?”

“হয়।”

“তুমি তাঁকে চেন ?”

“চিন্‌তেম না, এখন চিনেছি।”

“বেশ। তাঁর কাছে আমার একটী অনুরোধ জানাবে ?”

“কি অনুরোধ ?”

“অনুরোধ এই, ডাকাতদের যাঁরা বিচার কোর্‌বেন, তাঁদের কাহারও সঙ্গে বীরপুরুষের যদি আলাপ থাকে, কোন সূত্রে তাদের কাহারও কাণে অনুগ্রহ কোরে যদি এই কথাটী তুলেন, বেঁচে থেকে যেন ডাকাতেরা শক্ত শাস্তি ভোগ করে। যে অভাগিনী ওদের হাতে মরণাধিক যন্ত্রণা পেয়েছে, সেই অভাগিনীর এই ভিক্ষা, এই কথাটী তাঁদের জানাবেন, এই আমার অনুরোধ, বোল্‌বে ?”

“বোল্‌বো, বোল্‌বো ! এখনই তবে আমাকে যেতে হোলো। রাত্রে তিনি এখানে থাক্‌বেন না। ডাকাতদের যেখানে বিচার হবে, রাত্রেই সেইখানে গিয়ে, ইচ্ছামত জোগাড় যন্ত্র কোরবেন। শুন্‌লেম, কালই বিচারের দিন হবে। এর ত আর সাক্ষী সাবুদ দরকার হবে না, ডাকাতেরাও অস্বীকার ক'র্‌তে পার্‌বে না, একদিনেই নিষ্পত্তি হোয়ে যাবে। শুধু ডাকাতিই নয়,

বীরপুরুষ কোতয়ালীতে গিয়েছিলেন, ধমক্ দিয়ে দিয়ে বিশে ডাকাতকে অনেক ভয় দেখিয়ে ছিলেন, সত্য কবুল কোর্‌লে, সাজা কম কর্‌বার চেষ্টা পাবেন, একথা বোলে ভরসা দিয়ে-ছিলেন। অনেক অপরাধ বেরিয়ে পোড়েছে, ডাকাতি করা, মানুষ মারা, মেয়ে চুরি করা জাল করা। যে দুখানা চিঠি আমাদের কাছে এসেছিল, তুমি সন্দেহ কোরেছিলে জাল, সত্যই চিঠি জাল করা, ব্রজবাসী জাল করা, বিশে ডাকাতের কাজ, বিশে নিজমুখে একথা অনেক লোকের সাক্ষাতে আজ বীরপুরুষের কাছে কবুল কোরেছে। কিন্তু কেন, কি অভিপ্রায়ে তোমাকে ওরকম হায়রানি দিয়েছে, সে কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌লে কেবল এই কথা বলে, শুধু পণের টাকার লোভে নয়, ভিতরে কোন বড় লোকের উপদেশ আছে। কার উপদেশ, বীরপুরুষ সে নামটী কিছুতেই বাহির কোর্‌তে পার্‌লেন না। বিশে বলে, 'টুঁটিতে ছুরী দিলেও সে নাম ব'ল্‌বে না।' শপথ কোরেছে, উঃ!—ডাকাতের আবার শপথ! যেখানে যাচ্ছে, সেখানে বেতের চোটে শপথ থাক্‌বে না। তা যাক্, শপথ তার সঙ্গে সঙ্গে যাক্, এখন যাই আমি। তোমার পরামর্শটী ভাল, যাই, বীরপুরুষকে আগে তাই বলিগে! এখনি হয় ত তিনি চ'লে যাবেন! আমি চোল্লেম। তুমি বোসো;—এলেম্ বোলে!"

জয়মঙ্গলা চ'লে গেল, বেলাও প্রায় সব ফুরিয়ে এলো। জয়মঙ্গলা ফিরে এলো না; সন্ধ্যা হোলো, তবুও না; রাত্রি চার্ দণ্ড, ছ দণ্ড, একপ্রহর, তবুও জয়মঙ্গলার দেখা নাই! আমার অন্তরে ভয় হোলো! সমস্ত দিন সাহস ছিল, তখন

মনের ভিতর অনিষ্ট আশঙ্কা আস্তে লাগ্লো। বাহিরেও যেতে পারি না! কি ভয় আছে, জানি না, কিন্তু ভয় হয়! ঘরের চৌকাঠের পার হোতে পারি না! মঙ্গলার ভাব্নায় এত অন্য মনস্ক আমি! রাত্রি একপ্রহর; ঘরে আলো নাই, তা পর্য্যন্ত হুস নাই! বাড়ীতে লোকজন আছে, হয় ত দিয়ে গিয়েছিল, হয় ত বাতাসে নিবে গেছে, ঘর অন্ধকার। একটী বাতি জ্বাললেম। বাতিটীকে সহচরী কোরে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত জেগে বোসে থাক্লেম। অস্থির হোয়ে ভয়ে ভয়ে জাগা, বুঝ্তেই পারেন, কতখানি যাতনা! সেই যাতনা আমি ভোগ ক'র্লেম! জয়মঙ্গলা এলো না। তার পর জানি না, কখন্ কেমন কোরে ঘুমিয়ে পোড়েছিলেম। সারারাত্রি হুঁস ছিলনা। পরদিন প্রভাতে উঠে দেখি, সে বাড়ীতে আমি নাই! মোহন পুরীতেই নাই! আর একটা নূতন জায়গায়, নূতন বাড়ীতে, ছোট একটা ঘরে আধময়লা বিছানায় একাকিনী আমি শুয়ে আছি। মাথার দিকে একটু মুখ উঁচু কোরে দেখি, মাথায় সাদা সাদা ঝাঁকড়া চুল এক বুড়ী, আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কট্ মট্ চক্ষে চেয়ে রয়েছে!

ষোড়শ তরঙ্গ।

নূতন নিবাসে।

যাঃ! আশা ভরসা সব ফুরালো! একটু একটু আশ্বাস এসেছিল, ডাকাত বাঁধা প'ড়েছে, ডাকাতে আর ধ'র্‌বে না, সেই একটা বিশ্বাস এসেছিল, চক্ষু যে রূপখানি দেখ্‌তে ভাল বাসে, অভাবনীয়রূপে সেই রূপখানি আমার চক্ষের সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'য়েছিল;—আমি কাঙ্গালিনী, আমি আমার জাতকুল জানি না, তাঁর জন্ম বড় ঘরে, আমাকে পত্নী ব'লে গ্রহণ ক'র্‌তে তিনি রাজী হবেন কি না, সেই একটা বড় সন্দেহ আমার মনে ছিল;—আমি রাজকন্যে, জয়মঙ্গলা নিশ্চয় কোরে আমার কাণে সেই কথাটা তুলে দিয়েছিল। আশ্বাসে আশ্বাসে পূর্ব্ব সন্দেহটা মন থেকে একটু তফাৎ কোরেছিলেম। মোহনপুরীতে মোহন-মন্ত্রের গুণে দিন কতক হয় ত আমার গায়ে একটু সুখের বাতাস লাগ্‌বে, এই রকম আশা হোয়েছিল;—একবেলার মধ্যে আশার ছলনে, এই রকম কতই আমি সুখস্বপ্ন দেখেছিলেম! হায় হায়! সব গেল! সব ফুরালো! আশ্বাস, বিশ্বাস, আশা ভরসা, সমস্তই রাত্রের মধ্যে বিসর্জ্জন! কোথায় বা মোহনপুরী, কোথায় বা আমি, কোথায় বা জয়মঙ্গলা, কোথায় বা সুখের প্রদীপ; কোথায় কি! আমি এখন এই নূতন অজানা জায়গায় কাদের

আশ্রয়ে—কে জানে ভাল কি মন্দ, কাদের বাড়ীতে এসে শুয়ে আছি!—বিকট বেশে নিরাশা এসে আমার সম্মুখে উলঙ্গ হোয়ে নৃত্য ক'র্‌ছে!

শুয়ে আছি, উঠ্‌তে পার্‌ছি না, উঠ্‌ছি না। চক্ষে জল আস্‌ছে। হয় ত ভাল আশ্রয় হোলেও হ'তে পারে, মনে মনে এক একবার সেটাও ভাব্‌ছি। কপাল মন্দ কি না! ভালটাকে সরিয়ে দিয়ে মন্দটাই আগে আগে আসে। ভাল আশ্রয় হোলেও হ'তে পারে, মনে মনে ভাব্‌ছি বটে, কিন্তু ভয়টা আগে আগে এসে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে রয়েছে! মাথার কাছে বুড়ী দাঁড়িয়ে! প্রথমে একটীবার মাত্র মাথা তুলে দেখেছি, সেই অবধি সে দিকে আর একবারও চেয়ে দেখ্‌ছি না। আছে কিন্তু, সেটা জান্তে পার্‌ছি। আমি জেগেছি, জেগে আছি, বুড়ীও সেটা জান্তে পার্‌ছে। মুখে কিন্তু কিছুই বল্‌ছে না, চুপ্ কোরে দাঁড়িয়ে আছে।

মনটা আমার বড়ই ব্যাকুল হোয়ে উঠ্‌লো। আর শুয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা হোল না। বুড়ী যেই হোক্, বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করি, কোথায় আমি এসেছি। ভয়ই বা কি? মেয়ে মানুষ, তাতে আবার বুড়ী, কি ক'র্‌বে আমার? যদি কোন দুষ্টলোক এখানে থাকে, তা হোলে ত কপালে যা ঘট্‌বার, তাই ঘট্‌বে;—জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেও ঘট্‌বে, না ক'র্‌লেও ঘট্‌বে;—তবে কেন মিছামিছি সংশয়ে থাকি?

উঠ্‌লেম। সটান বুড়ীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বিছানার উপর বোস্‌লেম। বুড়ী দেখি তখনও কটমট্ চক্ষে আমার

দিকে চেয়ে আছে। জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো মনে ক'র্‌ছি, আমার বোল ফোট্‌বার পূর্ব্বেই বুড়ী যেন কত কালের ঘনীষ্ঠতা জানিয়ে ক্ষীণস্বরে বোল্‌লে, "উঠেছ? আমি অনেকক্ষণ এসেছি। সাড়া দিলে পাছে ঘুম ভাঙে, আহা! সাঁরাটী রাত পথে ক্লেশ পেয়ে এসেছ, তাই বলি আমি—"

আড়ম্বরে বিরক্ত হোয়ে বুড়ীকে বাধা দিয়ে আমি বোলে উঠ্‌লেম 'না না, সারারাত আমি ক্লেশ পাই নাই, রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত আপনার ঘরে জেগে বোসে ছিলেম, তার পর ঘুমিয়ে পোড়েছি। তার পরেই এই কাণ্ড! তা যাক্,—সে সব কথা যাক্; এখন দয়া কোরে বল দেখি, এখানে আমি কেন? কোথায় আমি এসেছি? কে আমাকে এখানে এনেছে? আর বাড়ী খানিই বা কার?'

দাঁত নাই, ঠোঁট দুখানি মুখের ভিতর প্রবেশ কোরেছে, জীবের সাহায্যে সেই ঠোঁট দুখানি একটু বিস্তার কোরে, বুড়ী একটু চমৎকার হাসি হাস্‌লে। সেই শুষ্ক মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ব'ল্‌লে, "ও বাবা! এক নিশ্বাসে তোমার অতগুলো জিজ্ঞাসা? কোন্ কথাটার জবাব দিব? হি-হি-হি!"

দেখ্‌লেম বড় মজার বুড়ি! কথার যে রকম বাঁধুনি, মনের যে রকম ভাব, তাতে বোধ হোলো, দুস্‌মন নয়, বুড়ীকে কাছে এসে বোস্‌তে ব'ল্‌লেম। বুড়ী বোল্লে, "হি-হি-হি। আমার কি আর বলা আছে! সে সব দিন ফুরিয়েছে। যখন তোমার মত বয়স ছিল, তখন রাত দিন বোলেছি, এখন

খুব দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যাস কোরেছি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তোমার কথা গুলোর উত্তর দিই। তুমি বোসে থাক। রাজার মেয়ের বিছানায় কি আমাদের বোসতে আছে? তুমি বোসো!"

এ কি কথা শুনি! বুড়ীও বলে রাজার মেয়ে! কেমন কথা হোলো? সত্যই কি তাই তাই? না, আমাকেই কি বোল্‌ছে! না, আমাকে হয় ত নয়! এটা হয় ত কোন রাজার বাড়ী, রাজার মেয়ে হয় ত এই ঘরে এই বিছানায় শুয়ে থাকে, রাজার মেয়ের বিছানা তাই হয় ত বোল্লে। এটা তবে শত্রু পুরী নয়! তবু ভাল, মুস্কিলে অনেকটা আসান।

আমাকে অন্যমনস্ক দেখে, মাথা চুল্‌কে চুল্‌কে বুড়া আবার ব'ল্‌লে "হি-হি-হি! কথাগুলো জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, তার জবাব শুন্‌লে না? শোনমা বলি, জবাব শোন! কি কি কথা জিজ্ঞাসা কোরেছ? কেন তুমি এখানে এসেছ?—এসেছ শান্তিজলে স্নান ক'র্‌বে ব'লে। কে তোমাকে এখানে এনেছে?—তোমারই কোন আপ্‌নার লোক। কোথায় তুমি এসেছ?—কাশীতে। বাড়ীখানি কার?—রত্নবতী ঠাকুরাণীর।"

বুড়ী আমার চার কথার চার উত্তর প্রদান কোর্‌লে। কি আমি বুঝ্‌লেম?—সত্য ব'ল্‌ছি, কাশীতে এসেছি। এটী যদি সত্য হয়, তবে শুধু সেইটুকু ছাড়া আর কিছুই বুঝলেম না। শান্তিজলে স্নান করা, দিন গেলে সেটা আমার দরকার বটে, কিন্তু স্নান করাতে এনেছে একজন আপ্‌নার লোক! আমার কি আপ্‌নার লোক আছে? যে আমাকে একটু ভালবাসে, যে আমাকে দুটী মিষ্টকথা বলে, যে আমাকে বিপদ্ থেকে উদ্ধার

করে, তাকেই ত আমি আপ্‌নার লোক বোলে ভাবি। তা ছাড়া জগতে আমার আর আপ্‌নার লোক কেহই নাই!' থাক্‌লেও হয় ত থাকৃতে পারে, আমি কিন্তু জানি না। তবে কে সেই আপ্‌নার লোক? বাড়ীখানি বোল্লে, রত্নবতী ঠাকুরাণীর। কে সেই রত্নবতী ঠাকুরাণী?

অন্ধকার ঘুচ্‌লো না; কিন্তু বুড়ীর কথায় যদি বিশ্বাস করা যায়, বুড়ীর মনে যদি কোন প্রতারণা না থাকে, তা হ'লে অকস্মাৎ বিপদের আশঙ্কা কম! আপাততঃ জ্বলন্ত অনলে শীতল জল!

চিন্তা ক'র্‌ছি, একটী স্থূলোদরী চক্রমুখী ক্ষুদ্রকেশী স্থূলাঙ্গী স্ত্রীলোক, গরদের কাপড় প'রে সহাস্তবদনে, গজেন্দ্রগমনে, সেই গৃহমধ্যে এসে প্রবেশ ক'র্‌লেন। "এই যে মা এসেছেন!" সচঞ্চলে এই কথা ব'লেই বুড়ী একটু পাশের দিকে স'রে দাঁড়ালো। প্রবেশকারিণী সরাসর চোলে এসে আমার বিছানার উপর বোস্‌লেন। আমারে কোলে কোরে নিয়ে শত শত আশীর্ব্বাদ কোরে, কতই আদরের কথা বোল্লেন। তৎক্ষণাৎ পরিচয় পেলেম, তিনিই সেই বাড়ীর অধিকারিণী রত্নবতী ঠাকুরাণী। আমার চক্ষে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো! চিনিনা, তবু আদর করেন! আহ্লাদে ধুক্ ধুক্ কোরে আমার বুক নাচ্‌তে লাগ্‌লো! চক্ষের জলের সঙ্গে আমিও সেই সময় তাড়াতাড়ি রত্নবতী ঠাকুরাণীকে অনেকগুলি অন্তরের কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌লেম। তিনি আমার মুখে একটী চুম্বন কোরে প্রসন্নবদনে বোল্লেন, "শুন্‌বি রে বাছা শুন্‌বি! বিধাতার ঘটনে যখন মিলন

হোয়েছে, এখানে যখন এসেছিস্, তখন কোন কথাই আর শুন্‌তে বাকী থাক্‌বে না। কেবল শোনা নয়, হবিও তাই!”

দেখ্‌লেম, রত্নবতীর চক্ষেও সেই সময় দু ফোঁটা জল পোড়্‌লো! গরদের আঁচলে তিনি খস্ খস্ কোরে নেত্র মার্জ্জন কোর্‌লেন। বেলা অনেকটা হোয়েছে বোলে, আমাকে সঙ্গে কোরে তিনি বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেলেন;—বুড়ীও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এলো। বাড়ীর লোকজন আর ঘরগুলির ভাব দেখে, আমার মনে তখনও যা কিছু আশঙ্কা ছিল, সমস্তই দূর হোয়ে গেল। আমি যেন তখন নূতন জগতের, নূতন আলোতে সুখময়ী শান্তির কোলে স্থান পেলেম!

রত্নবতী ঠাকুরাণীর আদেশে আমার সেবার জন্য দুটী পরিচারিকা, আর আমোদ আহ্লাদের জন্য দুটী সহচরী নিযুক্ত হ'লো। আমার আদরের সীমা নাই, উত্তম উত্তম উপাদেয় রাজভোগ, উত্তম উত্তম বসন, উত্তম উত্তম মণিমুক্তার অলঙ্কার, আমার জন্য থরে থরে প্রস্তুত। চিরকাঙ্গালিনী আমি, ওসব সুখভোগের সামগ্রী আমার চক্ষে কেন? কিছুই ভাল লাগে না। আদর পাই, যত্ন পাই, স্নেহ পাই, সব পাই; মনে মনে আহ্লাদও হয়, আশাও জন্মে, আশ্বাসও আসে, কিন্তু প্রাণ যেন সর্ব্বক্ষণ হু হু করে! কোথাকার আমি, কে আমি, কোথায় ছিলেম, কোথায় এলেম, যাদের সব ভালবেসেছিলেম, তারাই বা সব কোথায় পোড়ে রইলো; কাশীতে আমাকে এনেছে, এই বাড়ীতে রেখেছে, একথা জান্তে পার্‌লে কি না, এই সব ভাবনায় প্রাণ আমার সর্ব্বদাই অস্থির!

বাহিরে আহ্লাদ, অন্তরে আগুণ, এই রকমে এক মাস আমি সেই বাড়ীতে থাক্‌লেম। বাড়ীর লোকগুলির সঙ্গে বেশ জানাশোনা হোলো। একটা আশ্চর্য্য দেখ্‌লেম! বাড়ীতে পুরুষ মানুষ একটীও নাই! একমাত্র রত্নবতী ঠাকুরাণীই সর্ব্বেশ্বরী; অপর সব পরিচারিকা। স্ত্রীলোকেরাই সমস্ত কর্ম্ম করে, পুরুষ মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নাই। রত্নবতী বিধবা। পুরুষ মানুষ কেউ কখন বেড়াতেও আসে না। আমি এ বাড়ীতে একমাস আছি, এর মধ্যে একদিনও ত একজনও এলো না। যারা আমাকে আপ্‌নার মানুষ বোলে এখানে রেখে গিয়েছে, শুন্‌লেম, তারাও ত কৈ এই একমাসের মধ্যে একবারও আমার সন্ধান নিলে না! এ সব তবে কি কাণ্ড? এদেরই বা তবে কি রকম কথা! সমস্তই কি মিথ্যা! যা দেখ্‌ছি, যা শুন্‌ছি, এ গুলোও কি তবে মায়া? অনেক ভাবি, স্থির কিন্তু কিছুই কোরে উঠ্‌তে পারি না।

আরও একমাস গেল। কেহই আমার তত্ত্ব নিতে এলো না। গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি হাস্য করেন। মুখের কথায় উত্তরের মধ্যে "শুন্‌বিরে বাছা, শুন্‌বি" বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করি, বুড়ীও বলে, "হি-হি-হি" বিষম বিভ্রাটেই পোড়্‌লেম!

দিনমানে আমি বাড়ীর ভিতর থাকি, রাত্রিকালে সেই ঘরে সেই শয্যায় শয়ন করি। প্রথম রাত্রে যে ঘরে আমাকে স্থান দিয়েছিল, রত্নবতী যত্নবতী হোয়ে, প্রতি রাত্রে সেই ঘরে আমাকে শুইয়ে রাখেন। খানিক রাত্রি পর্য্যন্ত সহচরীরা আমার কাছে থাকে, আমি ঘুমিয়ে পোড়্‌লে তারাও উঠে

যায়। এ বাড়ীতে এসে অবধি আমার একটু একটু ঘুম হয়। একাকিনী সেই ঘরটীতে ঘুমিয়ে থাকি। ঘরটী সত্য সত্য বাড়ীর ভিতরের ছাড়া নয়, তবে কি না পশ্চাদ্দিকের শেষের ঘর, সে ঘরের পশ্চাতে আর ঘর নাই। মস্ত একটা খোলা ছাত পোড়ে আছে। সেই ছাতের দিকে ঘরের একটা খুব উচ্চ জানালা আছে, রাত্রিকালে সে জানালাটা সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে, দিনমানে খোলা হয়। একদিন পূর্ণিমা। আমার একজন সহচরী, আহ্লাদ কোরে ঘরের ভিতর চাঁদের আলো আন্‌বার জন্যে, সন্ধ্যাকালে সেই জানালাটা খুলে রেখেছে। রাত্রে আমি গিয়ে শুয়েছি, সহচরীরা কাছে বোসে নানা রকম গল্প কোচ্ছে, পূর্ণিমার চাঁদ জানালা দিয়ে আমাদের ঘরের ভিতর উঁকি মার্‌ছেন, চাঁদের আলোর সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস আস্‌ছে, মনে যেন একটু একটু স্ফূর্ত্তি পাচ্ছি, সহচরীদের কাছে জয়মঙ্গলাদের নাম কোরে, তাদের সব গুণের পরিচয় দিচ্ছি, তারা কি এখানে আস্‌তে পারে না, সহচরীদের বার বার এই কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছি। তারা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি কোরে হাস্‌ছে। আমি বোল্‌ছি, হেস না। তাদের এক যোগিনী আছে, সেই যোগিনী মনে কোল্লে, এই মুহূর্ত্তেই তাদের উড়িয়ে এনে এই জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর দিতে পারেন।

সখী দুটী আমার এই কথায় হেসে হেসে ঢোলে ঢোলে লুটোপুটী খেলে। হাস্‌তে হাস্‌তে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তুমি সে যোগিনীকে দেখেছ?"

যোগিনীকে আমি ধ্যান কোল্লেম। যোগিনীর রূপ আমার মনে পোড়্‌লো। যোগিনী যেন কৃষ্ণবসনে অবগুণ্ঠনবতী হ'য়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে যেন কেমন এক রকম আতঙ্ক এলো! অলক্ষিতে শিউরে উঠে চক্ষু বুজে ফেল্লেম! কম্পিতস্বরে সখীদের ব'ল্লেম, 'সখি! আমার ঘুম পাচ্ছে, কাল বোল্‌বো যোগিনীর কথা।' এই কথাটী বোলেই আমি ঘুমিয়ে পোড়্‌লেম। সখীরা কখন উঠে গেল, কিছুই জান্‌তে পার্‌লেম না। যখন ঘুমিয়েছিলেম, পূর্ণিমার রাত্রি,—চাঁদের গতিতে রাত্রি তখন দুই প্রহরের বেশী।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি যেন দেখ্‌ছি, জেগে উঠে বোসে রোয়েছি, জানালা দিয়ে চাঁদের আলো আস্‌ছে, আমি সেই দিকে যেন চেয়ে রোয়েছি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে জানালার কাছটা যেন একবার অন্ধকার হোয়ে গেল! কে যেন একজন জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর এলো! সখীদের সঙ্গে গল্প ক'র্‌বার সময় সহসা যেরূপ কৃষ্ণবসনা যোগিনী মূর্ত্তির ছায়া চক্ষের কাছে দেখা দিয়েছিল, ঠিক্ সেই রকম কৃষ্ণবসনা এক মূর্ত্তি যেন আমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো! বিছানার উপর উঠে ব'স্‌লো! মুখে ঘোম্‌টা ছিল, চঞ্চলহস্তে খুলে ফেল্লে। মূর্ত্তি প্রকাশ হ'লো! ঘুমের ঘোর,—স্বপ্ন, তবু যেন ঠিক্ মনে হ'চ্চে। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সাষ্টাঙ্গে আমি তাঁর চরণে প্রণিপাত ক'র্‌লেম। সেই বনচারিণী যোগিনীই আমার সম্মুখে। আমার মাথায় হাত দিয়ে যোগিনী আমাকে ভাগ্যবতী বোলে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌লেন।

ণঃ! আরও যে কি সব কথা, তা এখন মুখে বোল্‌তেও সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চ হয়! স্বপ্নে আমি যোগিনীর মুখে সেই সব কথা শুন্‌লেম। আমার মাথার ভিতর সেই সময় যেন দপ্‌ কোরে শত বিদ্যুতের আলো জ্বোলে উঠ্‌লো! এখন সে সব কথা বল্‌বার সময় নয়। স্বপ্ন যদি ফলে, ততদিন পর্য্যন্ত যদি আমি বাঁচি, তবে পাঠক মহাশয় এই কুঞ্জবালার মুখে কুঞ্জবালার এই অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত শুন্‌তে পাবেন।

যোগিনী চ'লে গেলেন। আমারও স্বপ্ন ভঙ্গ হ'লো। স্বপ্নের সঙ্গেই নিদ্রা ভঙ্গ। রাত্রিকালে যে বিছানায় যেমন শুয়েছিলেম, সেই বিছানায় তেমনি শুয়ে আছি। জানালা যেমন খোলা, তেম্‌নি খোলাই র'য়েছে। চাঁদ চ'লে গিয়েছেন, জানালা দিয়ে ফুর্‌ ফুর্‌ ক'রে ঊষার বাতাস আস্‌ছে, রজনী প্রভাত।

সপ্তদশ তরঙ্গ

পরিচিত দর্শনে।

স্বপ্নের কথা কাহাকেও কিছু বোল্লেম না। সাত দিন গেল, স্বপ্নের কথা একটীও আমি ভুল্‌তে পারি না। রত্নবতীর আলয়ে ছ মাস আমার বরং দগ্ধচিত্ত অনেকটা শান্ত ছিল, আবার অস্থির! কোন বিপদের আশঙ্কায় অস্থির নয়, স্বপ্নের সব

অদ্ভুত অদ্ভুত কথার তোলা পাড়াতেই অস্থির! যে দুটী সখী আমার কাছে থাকে, তারা আমাকে অন্যমনস্ক কর্‌বার জন্যে অনেক রকম গল্প তোলে, বড় বড় যুদ্ধের কথা আনে, কোন রকম হাসির কথা উপস্থিত কোরে, আপ্‌না আপ্‌নি হেসে হেসে পেট ফুলায়, আমার মুখে হাসি নাই;—যে সাত দিনের কথা ব'ল্‌ছি, সে সাত দিন হাসি আমার কাছে বিদেশী। সখী দুটীর নাম "কপোত কুমারী" আর "ময়ূরমঞ্জরী।" বেশ নাম দুটী। আমুদেও তেম্‌নি।

এতদিন এবাড়ীতে আমি আছি, বাস্তবিক বাড়ীখানা কি, কাহারও মুখে সে পরিচয় ভাল রকমে একদিনও পাই নাই। এই সাত দিনের পর দিন সন্ধ্যার পর কপোতকুমারী হঠাৎ—কি জানি কি ভেবে সেই কথাটা তুল্লে;—হঠাৎ আমাকে বোল্লে, "সুড়ঙ্গ দেখেছ? এখানা বড় মজার বাড়ী, এর নীচে সুড়ঙ্গ আছে। সুড়ঙ্গের ভিতর এক মন্দির আছে। মন্দিরের ভিতর এক প্রতিমা আছে,—পাষাণ প্রতিমা, সে প্রতিমার যে কি লীলা, কেহই কিছু ব'ল্‌তে পারে না! এক এক রাত্রে কিন্তু সেখানে মানুষ যায়—একজন কি কজন, তা আমি বোল্‌তে পারি না। বেশী দিন আমি এবাড়ীতে আসি নাই, তুমি আস্‌বার একমাস আগেই আমরা এসেছি; এবাড়ীতে বেশী দিন কেহ তিষ্টিতে পারে না, গৃহিণী যিনি, তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে কত সব কাজ করেন, বেশী দিন লোকের চক্ষে সে সব লুকিয়ে রাখা বোধ হয় অসাধ্য মনে করেন। পাছে তারা দেখে, পাছে প্রকাশ করে, সেই ভয়ে মিছামিছি এক

একটা ছল ধোরে—এক একটা দোষ বাহির কোরে, গালাগালি দিয়ে, গঞ্জনা দিয়ে, মানুষগুলিকে ঘন ঘন তাড়িয়ে দেন। মাসের মধ্যে দুবার তিনবার লোকজন বদল হয়। মাগী ভারি খিট্‌-খিটে, মানুষ তিষ্ঠিতে পারে না, আমরা তবু তিনমাস আছি। হ্যাঁ, ব'ল্‌ছিলেম, সুড়ঙ্গের ভিতর এক এক রাত্রে মানুষ যায়;—প্রতিমা দেখে, পূজা করে, ঘণ্টা বাজায়, এই সব হয়। যাবে তুমি দেখ্‌তে?"

ঔদাস্য ভাবে আমি বোল্লেম, "প্রতিমা দেখ্‌বার এখন আমার সময় নয়। ওসব সাধ এখন আমার হয় না। কিন্তু গৃহস্থের বাড়ীর ভিতর সুড়ঙ্গ কেন আছে?"

"এখানা একজন রাজার বাড়ী।" চঞ্চলনয়নে দরজার দিকে চেয়ে, তখনি আবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে, একটু আস্তে আস্তে কপোতকুমারী বোল্লে, "এখানা একজন রাজার বাড়ী।" রাজা নাই, পুত্র কন্যা কিছুই হয় নাই, রাণীও নাই;—কিন্তু শুন্‌তে পাই, এই রত্নবতী ঠাকুরাণীও সেই রাজার একজন রাণী।"

"তা কেন?" কপোতকুমারীর মুখের কাছে হস্ত বিস্তার কোরে ময়ূরমঞ্জরী চক্ষু নাচিয়ে নাচিয়ে বোল্লে, "তা কেন? সত্য কথা বল্‌না। রত্নবতী বলেন, 'উনি রাজরাণী,' আর কেহ কিন্তু ও কথা বলে না। পুরাতন লোকের মুখে আমি শুনেছি, রত্নবতী সে রাজার বিবাহ করা রাণী নয়, কিন্তু রত্নবতী বলেন, 'দলীল আছে।' সেই দলীলের জোরে উনি এখন সেই রাজার রাজত্বের মালীক হোয়ে বোসে আছেন।"

কপোতকুমারী বোল্লে, "সেই কথাই ত আমি বোল্‌ছি।" এই কথাটী বোলে, সচমকে দরজার দিকে চেয়ে, কপোতকুমারী আবার চুপি চুপি বোল্‌তে লাগ্‌ল, "কিন্তু এ সুখ বড় বেশী দিন নয়। সেই রাজার একজন ভাইপো আছেন, তিনি নাকি মহাবীর। এতদিন নাবালক ছিলেন, এখন বয়স হোয়েছে, অনেক বড় বড় যুদ্ধে বীরত্ব দেখাচ্ছেন। তিনি নাকি অতি শীঘ্রই এই বাড়ী দখল ক'র্‌তে আস্‌বেন। রাজার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী এখন তিনি। যোগাড় কোচ্ছেন, কৌশল ঠাওরাচ্ছেন, সহজে যদি না হয়, রক্তারক্তি হবে। আমি সে দিন মণিকর্ণিকার ঘাটে বড় বড় লোকের মুখে এই সব কথার কাণাকাণি শুনে এসেছি। আমি না কি——"

কপোতকুমারীর মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। চঞ্চল-পদে হেল্‌তে দুল্‌তে সেই বুড়ী এসে গৃহ মধ্যে উপস্থিত। শুষ্কমুখে হাস্‌তে হাস্‌তে চক্ষু টেনে টেনে বুড়ী আমারে বোল্লে, "ওগো! একটী রাজপুত্র এসেছেন, যা ভেবেছি তাই, তোমার সঙ্গে দেখা কোর্‌তে চান্।"

রাজ পুত্র? আমার সঙ্গে দেখা? এই রাত্রিকালে? কে এমন রাজপুত্র? চকিত মাত্রে আমার মনকে আমি এক নিশ্বাসে এত কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌লেম। শরীরে যেন বিদ্যুৎ চোম্‌কে গেল! সবিস্ময়ে বুড়ীকে জিজ্ঞাসা কোর্‌লেম, "কে সেই রাজপুত্র?"

"ঠাকুরাণী তাকে চেনেন। পর্ নন্, তোমার আপনার লোক।"

উৎকণ্ঠিত হোয়ে আবার আমি জিজ্ঞাসা কোর্‌লেম, "যিনি আমাকে এবাড়ীতে রেখে গিয়েছেন, তিনি ?"

"না,'—তাঁর চেয়ে ভাল। মা তাঁকে বোসিয়ে রেখেছেন, আমি খবর দিতে এসেছি।"

আপনার লোক,—রাজপুত্র,—রত্নবতীর চেনা,—সখীরা এখানে আছে, ভয়ের কোন কারণ নাই, সখীদের মুখপানে চাই লেম,—তাদের চক্ষু যেন আমার মনের কথায় সায় দিলে। ভেবে চিন্তে বুড়ীকে আমি বোল্‌লেম, "যাও, সঙ্গে কোরে আন।"

বুড়ী গেল। রাজ পুত্রকে সমাদর কর্‌বার উপযুক্ত মত সাবধানে প্রস্তুত হোয়ে আমরা তিনজনে পাশাপাশী চুপ্‌টী কোরে বোসে থাক্‌লেম। একটু পরেই রণবেশধারী একটী পরম সুন্দর যুবা পুরুষ সেই বুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ কোর্‌লেন।

চোখোচোখি একটীবার মাত্র চেয়েই কেমন এক প্রকার লজ্জাতে আমি মাথা হেট ক'র্‌লেম। গৃহে আরও ভিন্ন আসন ছিল, তারই একখানি আসনে রাজপুত্র উপবেশন কোর্‌লেন। আড়ে আড়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, মুখখানি অতি বিষন্ন।

আমিও কিছু বোল্‌তে পারি না, রাজপুত্রও কিছু বলেন না, সখীরাও চুপ্, বুড়ীও নিস্তব্ধ, ঘর নিস্তব্ধ। এই রকম প্রায় পাঁচ সত মুহূর্ত্ত। সহসা মৌনভঙ্গ কোরে রাজপুত্র ডাক্‌লেন, "কুঞ্জবালা !"

আমার বুক কেঁপে উঠ্‌লো ! কি জানি কার উপদেশে তখন লজ্জা একটু স'রে গেল ; ধীরে ধীরে মুখ তুলে রাজ পুত্রের

মুখের দিকে একবার চাইলেম। বিমর্ষ বদনে চক্ষু ফিরিয়ে বুড়ীর দিকে—সখীদের দিকে ব্যগ্রদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে, রাজপুত্র তখনই আমার চক্ষুকে একটী সঙ্কেত ক'র্‌লেন। বুঝ্‌লেম, কোন গোপন কথা থাক্‌তে পারে, সখীদের সাক্ষাতে সে কথা হয় ত বল্‌বার নয়। বুঝ্‌লেম, কিন্তু সংশয় হ'লো। কি কোরে সখীদের স'রে যেতে বলি! ব'ল্‌তে হোলো না।

চতুরা ময়ূরমঞ্জরী রাজপুত্রের চক্ষের সঙ্কেতের ভাব বুঝেছিল, তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল;—"আয়গো আয়!" হস্ত সঙ্কেতে এই কথা বোলে ডেকে, কপোতীকে আর বুড়ীকে সঙ্গে কোরে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় চৌকাঠের উপর থেকে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে চতুর কটাক্ষে চেয়ে চেয়ে চতুরা ময়ূরমঞ্জরী ফিক্ কোরে একটু হেসে গেল। তৎক্ষণাৎ আসন থেকে উঠে রাজপুত্র সেই ঘরের দরজা বন্ধ কোরে দিলেন। আরও জোরে জোরে আমার বুক লাফাতে লাগ্‌লো।

রাজপুত্র এবারে আর আসনে বোস্‌লেন না, আমার বিছানার নীচে হাঁটু গেড়ে বোসে, বিষণ্ণবদনে আমার হাত দুখানি ধ'রে, ছল ছল নয়নে আমার মুখের দিকে চেয়ে, অতি-ক্ষীণ-করুণ-বচনে বোল্লেন, "কুঞ্জবালা! তোমার কাছে আমি বিদায় নিতে এসেছি!"

আমি চ'ম্‌কে উঠ্‌লেম। সত্য যেন চৈত্র মাসের এক বিদ্যুৎ আমার বুকের ভিতর দিয়ে মাথা ফুড়ে বেরিয়ে গেল। রাজ-পুত্রকে হাত ধোরে তুলে বিছানার উপর ব'সিয়ে কাঁপ্‌তে

কাঁপ্‌তে আমি একটু তফাতে স'রে ব'স্‌লেম। চক্ষের জল সম্বরণ কোর্ত্তে পার্‌লেম না। সজল-চক্ষে কাতর-বচনে বাষ্প-রুদ্ধ-কণ্ঠে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে বোল্লেম, "কেন ?—কেন এমন নিদারুণ বার্ত্তা ?"

রাজপুত্রের চক্ষেও জল প'ড়্‌লো। তিনিও একটী নিশ্বাস ফেলে রুদ্ধস্বরে বোল্লেন, "বিধাতার মনে ছিল !"

ব্যস্তস্বরে আমি জিজ্ঞাসা কোর্‌লেম, "কি ছিল বিধাতার মনে ?"

"তুমি আমার হবে না ! এ জন্মে তোমাতে আমাতে সে ভাবের কোন সম্পর্কই থাক্‌বে না ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি সুখী হও, আমার হাতে যাতে কোরে তোমার কোন উপকার হয়, যতদিন জীবন থাক্‌বে, ততদিন তাতে আমি সর্ব্বক্ষণ জাগ্রত থাক্‌বো। কুঞ্জবালা ! আমি বিদায় নিতে এসেছি, বিদায় হোলেম, কিন্তু কুঞ্জবালা ! পৃথিবীর গণ্ডগোলের ভিতর এক একবার আমাকে মনে কোরো ! মনে রেখো, আমি তোমাকে ভালবাস্‌তেম, আমি তোমাকে ভালবাসি, যতদিন বাঁচি, তত-দিন—চিরকাল ভালবাস্‌বো !"

আবার আমি অশ্রুধারে ভেসে সকাতরে জিজ্ঞাসা কোর্‌লেম, "কেন এমন নিদারুণ বার্ত্তা ? রাজপুত্র ! আপনি রাজপুত্র, তাও আমি জান্‌তেম না, তবুও মনপ্রা—না না,—দুঃখিনী আমি, জগৎ সংসারে একাকিনী আমি, আমার বুকে এ নির্ঘাত ছুরী কেন ? কি অপরাধ আমি—"

"অপরাধ !" মনে যেন ব্যথা পেয়ে রাজপুত্র ব'ল্লেন,

"অপরাধ! অপরাধ তুমি জাননা, তুমি দেবকন্যা! সে কথা তুমি মনেও ভেবো না, সে দুঃখকে তুমি মনের কোণেও স্থান দিওনা, সে সব সংশয় কিছুই নাই! দেবতার খেলা! এ খেলার উপর মানুষের হাত নাই! একটী যোগিনী আমাকে ব'লেছেন. সে যোগিনীকে তুমি জানই ত, সেই বনের ভিতর ডাকাতের গুহা থেকে যিনি তোমাদের উদ্ধার কর্‌লেন,সেই তিনিই আমাকে ব'লেছেন, "শম্বলের রাজকন্যাকে বিবাহ করা আমার কপালে লেখা! কেবল সেই বিবাহেই সংসারে আমি সুখী হোতে পার্‌বো;—সেই কন্যে ছাড়া আর কোন সুন্দরীকে বিবাহ কোর্‌লে, আমার কপালে দ প'ড়ে যাবে, বংশ পর্য্যন্ত ছারখার হবে!" যোগিনী আমাকে বার বার সাবধান কোরে দিয়েছেন, সে কথার অন্যথা হোলে, ঘোরতর অমঙ্গল হবে! সেই জন্যই ব'ল্‌ছি, কুঞ্জবালা! এ জন্মে তুমি আমার হবে না! যে রাত্রে ডাকাতের পাতালপুরী থেকে তোমাদের উদ্ধার, সেই রাত্রেই যোগিনীর মুখের ঐ নিষেধ মন্ত্র আমার কর্ণে প্রবেশ কোরেছে। সেই রাত্রেই আমি জেনেছি, তুমি পরের হবে! সেইজন্যই ডাকাতের হাত থেকে উদ্ধার কোরে বনপথে তোমার সঙ্গে আমি একটীও কথা কই নাই। কুঞ্জবালা! তা বোলে তুমি আমার পর হবে না! আমি তোমার চিরবন্ধু থাক্‌বো। যখন প্রয়োজন হবে, সংবাদ দিলেই তখনই আমার দেখা পাবে। "আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখে থাক!"

মনের আগুন মনে চেপে রেখে জোরে জোরে দুটী নিশ্বাস ফেলে, আরও একটী ক্ষুদ্র আশ্বাসে হতাশকে একটু একটু তফাৎ

কোরে গদ্গদস্বরে আমি বোল্লেম, "রাজপুত্র! কপালের কথার উপর আর কার কথা! দেবতার কাজের উপর আর কার কাজ! আমি ত যতটুকু বুঝেছি, বেশ বো'লতে পারি, দেবতাও যা, যোগিনীও তা! দুইই সমান! যা হবার তাই হবে, কিন্তু রাজপুত্র! আপনাকে আমি ভালবাস্‌তেম, আপনিও আমাকে ভালবাস্‌তেন, ভালবাসার কাজও আপনি দেখিয়েছেন, ঘোর বিপদে ডাকাতের মুখ থেকে রক্ষা কোরেছেন, আপনার গুণ, আপনার মূর্ত্তি, আপনার দয়া, আপনার বীরত্ব, চিরদিন আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত থাক্‌বে! কিন্তু 'বিদায়' এই নিষ্ঠুর,—এই হৃদয়বিদারক কথাটা আর আমার কাছে মুখে আন্‌বেন না!"

"আচ্ছা তাই।" বিষণ্ণ বদনকে একটু প্রসন্ন কোরে রাজপুত্র বোল্লেন, "আচ্ছা তাই। দেখ কুঞ্জবালা! তুমি আমাকে চিন্‌তে। চিনে চিনে ভালবাস্‌তে শিখেছিলে। কিন্তু কে আমি, আমার নামই বা কি, তা তুমি জান্‌তে না, এখনও জানলা। আমি চন্দ্রহংস পুরীর রাজ রাজেন্দ্র ভূমিপত্তি রাওজীর বংশধর পুত্র! আমার নাম ইন্দুভূষণ রাওজী। এই নাম তুমি তোমার ভাবী সুখের পরিজনের নামের সঙ্গে এক একবার মনে ক'রো।"

লজ্জাকে আরও অন্তর কোরে রাজপুত্রকে আমি বোল্লেম, "মনে করার কথাটাই আপনি বার বার বোল্‌ছেন, শুধু মনে করা কেন, যোগিনী যদি অত শক্ত কোরে আপনাকে অন্য নারীর পাণিগ্রহণ কোর্‌তে নিষেধ না কোর্‌তেন, তা হ'লে

আমি সাধ কোরে আপনার দ্বিতীয় পত্নী হোয়ে, শম্বল রাজকুমারীর দাসী হোয়ে থাক্‌তেম!”

রাজপুত্র উঠে দাঁড়ালেন। আমার দুখানি হাত ধোরে স্নেহবাক্যে আশীর্ব্বাদ কোর্‌লেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠে দাঁড়ালেম। রাজপুত্রের চক্ষের জল অনবরত প্রবাহিত। আমার চক্ষে তখন জল কম।

দরজা খুলে রাজপুত্র বেরিয়ে গেলেন। চৌকাঠ পর্য্যন্ত আমি সঙ্গে সঙ্গে গেলেম। ফিরে এসে বিছানার উপর বোস্‌লেম। দুঃখও হয়, লজ্জাও হয়, ভয়ও হও। স্বপ্নটা কি সত্য হবে? সত্য কি স্বপ্নে যোগিনী তবে এসেছিলেন? বিধাতার খেলা! তা যদি সত্য হয়, তবে ত হংসপুরীর রাজপুত্রের এ বিদায়ে আমার হৃদয়ক্ষেত্রে ভাবী সুখের পুষ্পতরুর অঙ্কুর হোয়ে থাক্‌লো। রাজপুত্রকে আর গুটীকতক মনের কথা আমি বোল্‌তেম। কিন্তু ঐ স্বপ্ন যেন বাধা দিয়ে মনের কপাট এঁটে দিতে বোল্লে। রাজপুত্র গেলেন। এর মধ্যে আর দেখা হবে কি না, সে কথাটা জিজ্ঞাসা করা হোলো না। পরের আশ্রয়ে লুকিয়ে আছি, শীঘ্রই হয় ত আবার আস্‌বেন। একাকিনী বোসে বোসে, খানিকক্ষণ এই সব আমি ভাব্‌ছি, সহচরী কপোতী আর ময়ূরী হাস্‌তে হাস্‌তে জড়াজড়ি কোরে ছুটে ছুটে ঘরের ভিতর এসে পোড়্‌লো।

অষ্টাদশ তরঙ্গ।

বিবাহ।

রাজপুত্র এলেন; রাজপুত্র গেলেন; তার পর এক পক্ষ গেল, কোন রকম নূতন ঘটনা দেখ্‌লেম না। রত্নবতীর সেই এক ঘেয়ে আদর, সহচরীদের সেই এক ঘেয়ে গল্প, রত্নবতীর রাণী হওয়ার গুপ্তকথা, সে সব কথা তখন পুরাতন হোয়ে প'ড়্‌লো। নূতনের মধ্যে এক একবার কেবল মনে হয়, সুড়ঙ্গ-পথে পাষাণ প্রতিমা! কোন সুযোগে প্রতিমাখানি একবার দেখে আসি, মনে মনে সাধ হয়, কিন্তু রত্নবতী যদি সেটা ইচ্ছা না করেন, যেতে যদি না দেন, গেলে যদি রাগ করেন, সেই ভয়ে মনের সাধ মনে মনেই চেপে রাখি। একদিন সন্ধ্যার পর আমার সেই শয়ন কক্ষটীতে আমি বোসে আছি, সখীরা কেহ নিকটে নাই, একাকিনী বোসে বোসে নৈষধচরিত পাঠ কোর্‌ছি, কত দিন যে পুস্তক স্পর্শ করি নাই, মনে হয় না। মনের অনন্ত ভাবনায় সেই দিন কেমন ইচ্ছা হ'লো, রত্নবতীর গৃহে অনেক প্রকার পুস্তক আছে, তারই ভিতর থেকে নৈষধ-চরিতখানি বেছে বেছে বাহির কোরেছি, ঠাকুরাণীর কাছে চেয়ে নিয়েছি, সেইখানি পোড়্‌ছি। আমার আপনার অদৃষ্টের সঙ্গে নৈষধের নায়িকার অদৃষ্টের কতদূর মিল, মনের

আবেগে সেই মিলটী মিলিয়ে মিলিয়ে দেখ্‌ছি, পোড়্‌ছি আর কাঁদ্‌ছি। নলরাজা গ্রহ-কোপে বিপদে পোড়েছিলেন, রাজ্য-ত্যাগী বনবাসী ভিখারী হোয়েছিলেন, দময়ন্তী হারিয়েছিলেন, দময়ন্তীও অত বড় রাজকন্যে অত বড় রাজরাণী হোয়েও, অভাগিনী কাঙ্গালিনীর মত আলয় আশ্রয় হারিয়ে বিস্তর যন্ত্রণা সহ্য কোরেছিলেন, কিন্তু আমি—এই অভাগিনী আমি,—আমি যেমন পদে পদে বিপদের শিকার, আমার অদৃষ্টে যেমন অভাবনীয় অনন্ত যন্ত্রণা, এত না—সাধ্বী সতী দময়ন্তীর যন্ত্রণা এত না। পোড়্‌ছি, ভাব্‌ছি, মিলিয়ে মিলিয়ে দেখ্‌ছি, অনবরত চক্ষে জল পোড়্‌ছে, সখীরা নিকটে নাই। কেন নাই? জানি না। রাত্রি অনুমান দেড় প্রহর কাছাকাছি। অকস্মাৎ ময়ূরমঞ্জরী রক্তমুখে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের ভিতর ছুটে এসে আমার হাত ধোরে টানাটানি আরম্ভ কোল্লে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "ছুটে এসো—ছুটে এসো! ভারি মজা হোচ্চে, বাড়ীতে বিয়ে হোচ্চে, সুড়ঙ্গের ভিতর বিয়ের মজ্‌লিশ বোসেছে। সুড়ঙ্গটা বোধ হয় মাটীর ভিতর দিয়ে অনেকদূর পর্য্যন্ত গেছে। আরও দুটো একটা এই রকমের বাড়ীর সঙ্গে হয় ত যোগ আছে। অনেক লোক এসেছে, আমাদের রত্নবতীও সেইখানে গেছেন, সব্বাই আমরা গেছি, দেখ্‌লেম, কেবল তুমি নাই, শীঘ্র এসো, দেখ্‌বে এসো!"

রত্নবতী যেতে ব'লেছেন কি না, সে টুকু পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা কর্‌বার সময় পেলেম না। ময়ূরমঞ্জরী আমাকে যেন ঝড়ের গতিতে হিড়্‌ হিড়্‌ কোরে টেনে নিয়ে চল্লো। সত্যই একটা

অন্ধকার ঘরের নীচে ছোট ছোট পাথরের সিঁড়ি বেয়ে দুজনে আমরা সুড়ঙ্গের ভিতর নেমে প'ড়লেম। তখন আর ছুট্ নয়, আস্তে আস্তে থেমে থেমে, দেয়াল ধোরে ধোরে সুড়ঙ্গের ভিতর নাম্‌লেম। ছোট খাট সুড়ঙ্গ নয়! নীচে একটা যেন গৃহস্থ লোকের বাড়ী! মাঝখানে মন্দির, মন্দিরের সাম্‌নে সুড়ঙ্গের উঠানে নাটমন্দির, পাশে পাশে অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর। নাটমন্দিরে সভা বোসেছে। অনেক বড় বড় ঝাঁপ্‌পাওয়ালা জন কতক রাজা রাজাড়াও তার ভিতর আছেন বোধ হোলো। অনেক লোক একত্র হোয়েছে। মন্দিরের দরজা খোলা, নাট মন্দিরের লোকেরা সম্মুখে দাঁড়ালে প্রতিমা-খানির চক্ষে চক্ষু পড়ে।

লোকেরা সব ফুস্ ফুস্ কোরে কথা ক'চ্ছে। বিবাহের সভা, আমোদ উৎসবের কথা, তা না হোয়ে দেখ্‌লেম, লোক গুলির মুখ যেন সব বিষাদ মাখা! কাহারও কাহারও মুখে ভয়ের ছবি জাজ্বল্যমান, এক একজনের মুখে যেন কতই উপ-রোধের একটু একটু কাষ্ঠ হাসি। বিবাহের সভায় এরকম বিষন্ন-তার ভাব কি!

একটী পরম সুন্দরী কন্যা নূতন বিবাহের বস্ত্রালঙ্কারে মণ্ডিতা হোয়ে সভার এক ধারে একটী উচ্চ বেদীর উপর মাথা হেট কোরে বোসে আছে। মুখ কিন্তু বিষন্ন। একটু আগেই যেন কেঁদেছে, চক্ষের কোনে—দুখানি টুকটুকে গালে, সেই রকম এক'একটী সরু সরু জলের দাগ। বেদীর আর এক ধারে একটী পরম সুন্দর যুবা পুরুষ। বেশ ভূষা দেখে অনুমান করা

গেল, সেইটীই বর। বরের মুখ খানি কিন্তু তত বিষণ্ণ নয়। একটু একটু হাসি আছে, তবু যেন কেমন এক প্রকার আতঙ্কিত আতঙ্কিত চমক্ চমক্ ভাব।

একটীবার চেয়েই বরের মুখের দিকে আর আমি চাইলেম না। মজ্‌লিসে বিস্তর লোক। মজ্‌লিস্‌টী ফুলের মালা দিয়ে, আয়না দিয়ে, ছবি দিয়ে, পদ্ম দিয়ে, খুব জম্‌কাল রূপে সাজান হোয়েছে। আলোয় আলোয় চাঁদ ক্ষেত্র! লোক গুলির মুখে যদি একটু একটু আলো থাক্‌তো, তবে ত এ মজ্‌লিসের বাহার বেরুত! তা যে নয়! ওদিকে যেমন আলোয় আলোয় কুরুখুন্টি, এদিকে তেম্‌নি অন্ধকার ঘুর্ ঘুট্টি!

আমার সহচরীরা ইতিমধ্যে কার মুখে শুনে এসেছে, এ বিবাহের ভারি গোল। চুরী করা মেয়ে। মেয়ের বাপ্ একজন মস্ত রাজা, এ বিবাহে বাপের মত নাই। মেয়েরও নাই, চুরী কোরে এনেছে। বরের দলের লোকেরা এক রকম ডাকাতি কোরেই মেয়েটিকে ধোরে এনেছে। বর নাকি এই মেয়ে না পেলে আত্মঘাতী হবে বোলেছিল, সেই জন্যই এই সব কাণ্ড।

কথাটা শুনে বরের মুখের দিকে আর একবার আমি চাইলেম। মুখখানি যেন চেনা চেনা বোধ হ'লো। ভুল হ'লো না কি? আবার চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি, হঠাৎ মন্দিরের সেই পাষাণ প্রতিমার পেছন থেকে দপ্ কোরে একটা প্রকাণ্ড লাল আলো জ্বোলে উঠ্‌লো। মন্দির শুদ্ধ, মজ্‌লিস্ শুদ্ধ সব লাল হোয়ে গেল। সেই লালের ভিতর পাষাণপ্রতিমার কতই যেন

ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! দেখ্‌তে সেখ্‌তে সেই আলোটা নীলবর্ণ হোয়ে উঠ্‌লো! যে দিকে বর সেই দিকে প্রতিমা, আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি, সব যেন নীলবর্ণে ঢাকা! প্রতিমা আর দেখা যায় না! মজ্‌লিসের আলোগুলো পর্য্যন্ত নীলবর্ণ! আবার একি? আবার একি? একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সেই নীলবর্ণের ভিতর থেকে কৃষ্ণবসনা এক অপরূপ নারী-মূর্ত্তি মন্দিরের চৌকাঠে এসে দাঁড়াল। গল্পে শুনেছি, পরী যেমন উড়ে, অপরূপ নারী মূর্ত্তি ঠিক্ সেই রকমে মজ্‌লিসের মাঝখানে উড়ে এলো! একবার বর কন্যার দিকে ফিরে, একবার বর যাত্র লোকগুলির দিকে ফিরে, সেই মূর্ত্তি দুই ভাগে দুই তীব্র তীব্র দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ ক'র্‌লে; ভ্রুকুটিভঙ্গীতে দক্ষিণহস্ত বিস্তার কোরে, বজ্রের গর্জ্জনে বোল্লে, "সাবধান, সাবধান! এ বিবাহ কোন মতেই হবে না! কিছুতেই আমি হোতে দিব না। এ বিবাহে মহা অমঙ্গল, রক্তের সমুদ্র!"

সকলেই স্তম্ভিত। মূর্ত্তির দিকে সকলেই স্থির-দৃষ্টি। সমবেত বরযাত্রগণের মধ্যে একজন অর্দ্ধবৃদ্ধ বীরপুরুষ ছিলেন, শেষে জান্‌লেম, তিনিই সর্দ্দার মধ্যস্থ। কন্যার মাতা-পিতার অমতে বিবাহ, চোরাও বিবাহ, তথাচ হিন্দুর বিবাহে সম্প্রদান চাই। যাঁর কথা আমি বোল্লেম, তিনিই সম্প্রদান ক'র্‌বেন স্থির ছিল, মূর্ত্তির কথা শুনে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বেশ রাজার মত পোষাক পরা, মুক্তার ঝালোট দেওয়া মুকুট মাথায়, চেহারাও বেশ তেজস্বী, যৌবনে তিনি একজন সুপুরুষ ছিলেন, সেই চেহারায় তার অর্দ্ধেকটা ছায়া আছে। যখন তিনি

দাঁড়ালেন, তখন দেখ্‌লেম, মুখখানি কেবল বিস্ময়-মাখা! তার পর দেখি, সেই মুখে ভয়ানক ভয়, থরথরে অঙ্গাঙ্গে নিদারুণ কম্প, মহা শঙ্কিত-নয়নে মূর্ত্তির দিকে চেয়ে, কম্পিত-কণ্ঠে, কম্পিত-ওষ্ঠে, জড়িয়ে জড়িয়ে তিনি ব'ল্লেন, "অরুন্ধতি! তুমি! তুমি এখানে কেমন কোরে এলে?"

নিমেষ মধ্যেই মূর্ত্তি অন্তর্ধান! নীলবর্ণ আলোটাও অন্তর্ধান! চারিদিক্ ধোঁয়ে ধোঁয়াকার! ধূমরাশির ভিতর সেই পাষাণ প্রতিমা যেন বিকটবদনে হাস্য কোর্‌ছেন! বাড়ীময় নিশ্বাসরোধী গন্ধকের গন্ধ।

মজ্‌লিসের সমস্ত লোকের অঙ্গেই থরহরি কম্প! চক্ষের পলক পড়ে না, মুখে বাক্য সরে না, অঙ্গ লোমাঞ্চ! যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনিও বোসে প'ড়্‌লেন! বর কন্যা যেন অচল পাষাণ! তথাপি সেই অচল পাষাণে কন্যার মুখখানি যেন বিস্ময়ের সঙ্গে প্রসন্ন!

পুরী নিস্তব্ধ! গভীর নিস্তব্ধ, ভয়ানক নিস্তব্ধ! হঠাৎ দেখি, আমাদের রত্নবতী ঠাকুরাণী কটিদেশে গরদ কাপড় জড়িয়ে এলো চুল কোরে, যেন ডাকিনীর মত মজ্‌লিসের মাঝখানে এসে উপস্থিত! আবির্ভূতা অপূর্ব্ব মূর্ত্তির সঙ্গে যিনি কথা কোয়ে ছিলেন, কেমন এক প্রকার চমকিত স্বরে তাঁকেই সম্বোধন কোরে ঠাকুরাণী বোল্লেন, 'অরুন্ধতী! তুমি না অরুন্ধতীর নাম কোল্লে? অরুন্ধতী না মোরেছে? আজ্ ত নয়, কতকাল হ'লো সে কথা শুনেছি, আজ্ পাঁচ বৎসর হ'লো!'

লোকগুলির ভয় বিস্ময় যেন আরও শতগুণ বেড়ে উঠ্‌লো। কেহই আর সেখানে স্থির হোয়ে বোসে থাক্‌তে পার্‌লেন না। কম্পিতশরীরে, কম্পিতচরণে, আতঙ্কের অস্ফুট চীৎকারের সঙ্গে সকলেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। বর ওদিকে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে পালায়নের উপক্রম কোর্‌ছিলেন, হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাস এসে মজ্‌লিসের সব আলোগুলো নিবিয়ে দিলে। সুড়ঙ্গের ভিতর জোর বাতাস অসম্ভব। কিন্তু যে প্রকার অদ্ভুত ঘটনার ক্ষেত্র, সে ক্ষেত্রে মহা অসম্ভবও সত্য সত্য সম্ভবে।

পুরী অন্ধকার। অন্ধকারে কে কার ঘাড়ে পড়ে, কে কোন্ দিকে যায়, ভ্যাবা চ্যাকা খেয়ে গেল। মহা আতঙ্কে সকলের মুখেই অস্ফুট চীৎকার। আমি ত সখী দুটীকে জড়িয়ে ধোরে আড়ষ্ট হোয়ে দেয়াল ঘ্যাঁসা হোয়ে র'য়েছি। এই সময় উপর দিক্ থেকে সুড়ঙ্গ পথে একটা লোক ছুটে এসে, জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে, সেই অন্ধকারের ভিতর সভয়কণ্ঠে ব'ল্‌লে, "ওগো! তোমরা কে কোথায় আছ? অন্ধকার কোরেছ কেন? শীঘ্র ছুটে এস! শীঘ্র উপরে এসো! বাড়ীতে ডাকাত পোড়েছে!"

ভয়ের উপর ভয়, বিপদের উপর বিপদ্, বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! ভাল বিয়ে দেখ্‌তে এসেছি! আমার কপালেই কি এই সব ঘ'ট্‌ছে? ডাকাত! ডাকাত কি আবার আমাকেই ধ'র্‌তে এসেছে? আমি এই বাড়ীতে আছি, জান্‌তে পেরেই কি ডাকাত পোড়েছে? ভয়ে ত সখীদের কোলে আমি

আধ মরা! অতগুলো লোক আছে বোলে একটু একটু সাহস ছিল, কিন্তু ভাব্‌তে গেলে লোকগুলোও ত আমার মত আধ মরা! এর চেয়ে যখন আমার কম বয়স, তখন আমি স্বহস্তে তলোয়ার চালিয়েছি, একাকিনী এলোচুলে তলোয়ার ধ'রে বড় বড় ডাকাত ভাগিয়েছি, কত বিপদে-পড়া মানুষ বাঁচিয়েছি! সব আমার মনে আছে, লোকে শুনে হাস্‌বে বোলে, অবিশ্বাস ক'র্‌বে বোলে, এদিকে আবার আত্মশ্লাঘা হবে বোলে, মুখে কিছু ফুটি না। উঃ! এখন আমার এই দশা!

এই রকম অদৃষ্টের কথা ভাব্‌ছি, যে লোকটা ছুটে এসেছে, সে ঐ রকম হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ভয় দেখাচ্ছে, লোকগুলো সব শেয়ালের মত চীৎকার কোচ্ছে, হঠাৎ স্বুড়ঙ্গমুখে আলো দেখা গেল। এককালে অনেক গুলো লোকের পায়ের শব্দ; হাঁকাহাকি চেঁচাচেঁচি কোর্ত্তে কোর্ত্তে অনেকগুলো লোক গুম্ গুম্ কোরে স্বুড়ঙ্গ দিয়ে নেমে আস্‌ছে, এসে উপস্থিত। আগে আগে একজনের হাতে একটা গুপ্ত লণ্ঠন, তার পশ্চাতে খাপ্‌খোলা তলোয়ার হাতে পাঁচজন চোগোঁপ্‌পা পালোয়ান, তাদের পশ্চাতে আরও দশ বারজন। কিন্তু তাদের সব মুখে মুখোশ পরা, আগেকার কজনের মুখ খোলা। সকলের হাতেই খাপ্‌খোলা তলোয়ার।

রত্নবতী চীৎকার কোরে স্বুড়ঙ্গের দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন, লোকেরা তাঁকে আট্‌কে ফেল্লে। আমি ত আর আমাতে নাই!

ঊনবিংশ তরঙ্গ।

গ্রেপ্তারী-পরওয়ানা।

যে সব লোকেরা এলো, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দলপতি, মস্ত একখানা কাগজ হাতে কোরে সেই ব্যক্তি গভীর গর্জ্জনে বোল্লে, "কার নাম সোমরাজ? কার নাম সোমরাজ?"

কেহই কথা কয় না! নামটা শুনেই ত আমি চ'ম্‌কে উঠ্‌লেম! হঠাৎ একটা চমক্ ভেঙ্গে গেল! বরের মুখখানা দেখে চেনা চেনা বোধ হোয়েছিল, এতক্ষণে তার হদিস্ জান্তে পার্‌লেম! সেই সোমরাজ এই বর; যে ব্যক্তি হাকিমি ধরণে সোমরাজের নাম কোল্লে, একটু পরেই জান্‌লেম, সে লোকটা সহর কোতয়াল! কাহারও মুখে কোন উত্তর না পেয়ে সহর কোতয়াল আবার গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা কোর্‌লে, "কার নাম সোমরাজ?"

সোমরাজ ত আগে থাক্‌তেই পলায়নের উদ্যোগ ক'র্‌ছিলেন, কোতয়ালের গভীরগর্জ্জনে আরও ভয় পেয়ে অন্ধধারে সুড়ঙ্গপথে ছুটে প্রবেশ কোর্ত্তে যান, কোতয়ালের লোকেরা ধাঁ কোরে সেই দিকে ছুটে গিয়ে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে "পাখ্‌ড়ো পাখ্‌ড়ো" বোলে, জোরে পলাতকের একখানা হাত ধোরে টেনে হিঁচ্‌ড়ে সভার মাঝ্‌খানে নিয়ে এলো। একটু আগে

কতকগুলো লোক সেই অন্ধকারের সময় নীচের সুড়ঙ্গপথে পালিয়েছে, বাকী যে কজন আছে, তাদের মধ্যে একজন সেই মুকুটধারী বীর। কোতয়ালীর লোকেরা যখন সোমরাজকে টেনে এনে ফেল্লে, সেই বীর তখন কম্পের ভিতরেও দর্পে দর্পে দাঁড়িয়ে উঠে,—একটু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লেন, "কেন তোরা ধোরেছিস্? কেন তোরা ধোর্‌বি? সোমরাজ—আমার সোমরাজ—আমার সোমরাজ কখন—"

সদর্পে সম্মুখবর্ত্তী হোয়ে, সহর কোতয়াল জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তুমি কে?"

সহর কোতয়াল নূতন বাহালী। তার পশ্চাতের একজন পুরাতন সঙ্গী লোক গোঁফ চুম্‌রে, বুক ফুলিয়ে ছুটে এসে বিকট-মুখে বোল্লে, "ও লোকটা এই সোমরাজের বাবা, যেমন বাপ্ তেম্‌নি বেটা। ওর নামেও গ্রেপ্তারী আছে। ধর ওটাকে, দুজনকেই বাঁধ, পিচ্‌মোড়া কোরে বাঁধ! ভারি বদ্‌মাস্, দাগাবাজ, জালিয়াত, ডাকাত, বাঁধ বেটাদের! ভারি ফন্দিবাজ, আবার বহুরূপী, থাকে থাকে রূপ বদ্‌লায়, বেশ বদ্‌লায়, নাম বদ্‌লায়, ভারি ধড়িবাজ, লুকিয়ে লুকিয়ে রাজা সেজে বেড়ায়, সোমরাজটা বলে আমি রাজার ছেলে, ওর বাপ্‌টা বলে আমি রাজা ভীমরাজ! বাঁধ বেটাদের! দুই নামেই গ্রেপ্তারী পরওয়ানা আছে। কোথায় কখন্ লুকিয়ে লুকিয়ে কোন্ ভাবে থাকে, আজ্ আটমাসের মধ্যে কোন সন্ধানই আমরা পাচ্ছি না, এইবার শেয়ালের বাচ্চা বাঘের মুখে পোড়েছে! বাঁধ বেটাদের!"

যেমন কথা, অম্‌নি কাজ্। ভীমরাজ আর সোমরাজ

কোতয়ালের হাতে বাঁধা পোড়্লেন। দুজনের মুখ শুকিয়ে ছাই বর্ণ হোয়ে গেল। বাকী যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও নিতান্ত অব্যাহতি পেলেন না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত থানাতল্লাসী সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই সে বাড়ী থেকে বেরুতে পাবেন না, আদালতে সাক্ষীর স্থলে হাজির হোতে হবে, সহর কোতয়ালের এইরূপ আদেশ। প্রকারান্তরে তাঁরাও তখন কোতয়ালীর বন্দী।

মনে ক'চ্ছিলেম, এই পর্য্যন্তই বুঝি থামে,—থাম্লো না। আরও ক্রমে বাড়াবাড়ি হোয়ে উঠ্লো। রত্নবতীর উপর জুলুম। চারিদিক্ চেয়ে সহর কোতয়াল জিজ্ঞাসা কোল্লে, "রত্নবতী কোথা?" মুখোশপরা লোকেদের ভিতর থেকে একজন বোলে উঠ্লো, "আমরা পথ আগ্লে আছি, ঐখানেই আছে। হয় ত কোথায় লুকিয়েছে। আলো ধোরে ধোরে দেখ, টেনে বাহির কর! উঃ! মেয়ে মানুষের পেটে এত ফিকির! এত দাগাবাজী! পাকা বদ্মাস্, ধর বেটীকে!"

গুপ্ত লণ্ঠন হাতে কোরে কোতয়ালীর লোকেরা এদিকে সেদিকে চতুর্দ্দিকে রত্নবতীকে খুজ্তে লাগ্লো। রত্নবতী তখন ভয়ে বিহ্বল হোয়ে মন্দিরের সিঁড়ির এক পাশে গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন, খুজ্তে খুজ্তে কোতয়ালীর লোকেরা সেইখানেই তাকে পেলে। বাঁধ্লে না, স্ত্রীলোক বোলে তখন এইটুকু দয়া দেখালে। চার্জন আগু পাছু মোতায়েন হোয়ে রত্নবতীকে স্থুড়ঙ্গমুখে নিয়ে এলো। গায়ে পর্য্যন্ত হাত দিলে না।

স্থুড়ঙ্গের নীচে স্থুড়ঙ্গ। কি জানি, কোতয়ালীর লোকেরা

কি রকমে সেটা জান্‌তে পেরেছিল, তলোয়ারের থাপ খুলে কোতয়ালীর দুজন প্রহরী সেই সুড়ঙ্গের মুখে পাহারা থাক্‌লো। আমরা এমনি জায়গায় লুকিয়েছি, সেখান থেকে সব দেখ্‌তে পাচ্ছি, লোকেরা কিন্তু আমাদের দেখ্‌তে পাচ্ছে না। লুকিয়ে আছি—আমি, ময়ূরমঞ্জরী আর কপোতকুমারী। তিনজনেই এক জায়গায় জড়সড়। বুড়ী কোথায়, গোলেমালে তখন সেটা কিছুই জান্‌তে পার্‌লেম না। সেখানকার সব লোকগুলিকে সঙ্গে নিয়ে, বন্দীদের হেফাজত ক'রে কোতয়ালেরা সেই মুখোশ পরা লোকগুলির সঙ্গে উপরের সুড়ঙ্গপথে উপর মহলে চোলে গেল। যে মেয়েটীকে বিয়ে দিতে এনেছিল, সেটী যে কখন কোথা দিয়ে কোথা গেল, হুলস্থুলের সময় সে কথা কেহ জিজ্ঞা-সাও কোর্‌লে না।

আমরা সুড়ঙ্গের ভিতরেই আছি। ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার, প্রতিমার মায়া, ভূতের ভয়, সে সব বরং তখন ভাল লাগ্‌তে লাগ্‌লো। সজীব মানুষের ভয়ানক উপদ্রবের চেয়ে সে সব ভয়ের তবু পার আছে, তাই ভেবে সুড়ঙ্গের ভিতরেই আমরা থাক্‌লেম। উপর মহলে গেলেম না।

খানিকক্ষণ আছি, আবার হঠাৎ সুড়ঙ্গপথ আলো হোলো! একটী লোক একটী লণ্ঠন হাতে কোরে সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ কোল্লে! লোকটী মুখোশপরা, আলো হাতে কোরে এদিক্‌ ওদিক্‌ দশদিক্‌ কি যেন অন্বেষণ কোল্লে, আমরা আড়ষ্ট! আর লুকাতে পার্‌লেম না, লণ্ঠনের আলো এসে আমাদের গায়ে পোড়্‌লো! লোকটী চঞ্চলপদে আমাদের কাছে এলো।

আমরা চীৎকার কোরে তিনজনে জড়াজড়ি হোয়ে সেইখানে শুয়ে পোড়্‌লেম! লোকটী আমাদের কাছে এসেই মুখের মুখোশটা খুলে ফেল্লে! আলোটা তুলে মুখের কাছে ধোল্লে। আশ্চর্য্য! একটীবার ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখি, যুবরাজ ইন্দু-ভূষণ!

বিংশ তরঙ্গ।

নানা রহস্যের মর্ম্মভেদ।

কুমার ইন্দুভূষণের সঙ্গে আমরা উপর মহলে এসেছি, আমার অনুরোধে পাঠকমহাশয়কে এটী নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে হবে। যে লোকগুলির মুখে মুখোশ ছিল, তাঁরা সকলেই সেখানে আছেন। কোতয়ালীর লোকেরা আর আর সব লোকগুলিকে সঙ্গে কোরে নিয়ে গেছে। বাড়ী প্রায় ফর্সা। মুখোশপরা লোক-গুলির মুখে তখনও কেন মুখোশ, সে রহস্যটা কিছুই আমি বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। কারাই বা তারা, কেনই বা মুখোশ পরা, সেটাও বড় দুর্ব্বোধ। ইন্দুভূষণের মুখে আর মুখোশ নাই, সুড়ঙ্গের ভিতর খুলেছিলেন, সেই খোলাই খোলা। সকলেই তারা একটী ঘরে বোসে আছে। আমাদের সঙ্গে কোরে এনে, কুমার ইন্দুভূষণও সেই ঘরে প্রবেশ ক'র্‌লেন, ঠিক্

তারই পাশের ঘরেই আমাদের রাখ্‌লেন; মাঝখানে দরজা, আমরা সেই দরজাটী প্রায় সটান বন্ধ কোরে ছোট একটু ফাঁক রাখ্‌লেম। তারাই সব কি করে, দেখ্‌তে পাই, কি সব কথা বলাবলি করে, শুন্‌তে পাই, ঠিক্ সেই রকমে আমি সেই ছিদ্রপথে চক্ষু দিয়ে কাণ পেতে থাক্‌লেম। সখী দুটী পাশে পাশে উঁকি মার্‌তে লাগ্‌লো। তত আর ভয় নাই;—আমার ত নাই, কেননা, কুমার ইন্দুভূষণ সম্মুখে।—ইন্দুভূষণ বিশ্বাসঘাতক হবেন না, সে বিশ্বাস আমার বেশ আছে।

দরজার ছিদ্রে চক্ষু দিয়ে আছি, বিফল হোচ্চে না, মূর্ত্তিকটী দেখ্‌তে পাচ্ছি। ছিদ্রপথে কাণ পেতে আছি, মিথ্যা হোচ্ছে, কথা একটীও শুন্তে পাচ্ছি না। কথা কি তারা ক'চ্ছে না? ক'চ্ছে; কিন্তু চুপি চুপি ফুস্ ফুস্ কোরে কথা; তফাৎ থেকে সে সব কথা কাণে আসে না। কেবল মুখোশ ঢাকা চেহারা-গুলি দেখ্‌ছি, হঠাৎ আমাদের সেই বুড়ী মাথার সব সাদা চুলগুলো আদুড় কোরে, বুকে হাত চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে, ডাক-ছেড়ে কেঁদে, সেই মুখোশের ঘরে এসে প্রবেশ কোল্লে। আঁচলটা মাটীতে লুটিয়ে যাচ্ছে, কাঁচুলীর বাঁধনগুলো ছিঁড়ে গেছে, প্রায় যেন অর্দ্ধ উলঙ্গ।

"সর্ব্বনাশ হোয়েছে গো, সর্ব্বনাশ হোয়েছে! ডাকাতে আমাদের সর্ব্বনাশ কোরে গেছে! ঘরের কপাটগুলো সব চ্যালা কোরে ফেলেছে! সিন্দুক বাক্স ভেঙে ছার্‌খার্ কোরেছে! সর্ব্বস্ব লুঠে নিয়েছে। ঠাকুরাণীর একখানি সোণার জগধাত্রীর

প্রতিমা ছিল, তা পর্য্যন্ত নিয়ে গ্যাছে।” কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এই সব কথা বোলে, বুড়ী একাই যেন ঘরের ভিতর হাট পাকিয়ে দিলে!

দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কোরে, সক্রোধ-গভীর-গর্জ্জনে কুমার ইন্দুভূষণ বোল্লেন, “তুই বেটী এখনও আছিস্? তুই এখনও এই বাড়ীর ভিতর রোয়েছিস্? কোতয়ালীর লোকেরা তোরে গ্রেপ্তার কোরে নিয়ে যায় নাই? তুই বেটী সব জানিস্! সব পরামর্শর ভিতর তুই থাক্‌তিস্! পাকা মাগী! তোকে ধ'রতে না পার্‌লে এ মোকদ্দমার কিছুই হবে না! দাঁড়া তুই! আমরাই তোকে সাত সাগরের জল খাওয়াচ্ছি!”

“তুমি অমন কথা কেন বলগো? তোমার আমি ক'রেছি কি? তুমি কেন অমন কোরে ধমক্ দাও? মোকদ্দমা কি গো? মোকদ্দমার আমি কি জানি? তোমরাই ত পরামর্শ কোর্ত্তে! তোমরাই ত সব লুকিয়ে লুকিয়ে——”

“তুই আমাকে চিন্‌তে পারিস্?”

কট্‌মট্ চক্ষে রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে, দুই হাতে দুই চক্ষের জল মুছে বুড়ী তখন যেন আস্ফালন কোরে বোল্লে, “ঢাকা দাও কেন? বুড়ীর কথাগুলো চাপা দিয়ে ফেল কেন? তোমাকে আমি চিনি না? আরেব্বাস্! 'ধরেন মাছ না ছোঁন পানি!' তুমিই ত ডাকাতি ক'র্‌বার গোড়া! চিন্তে পার্‌বো বোলে মুখোশ পোরে এসেছিলে! যারা যারা তোমার কাছে এখনও বোসে আছে, ওরা যদি তোমার মতন মুখোশ খোলে, তা হোলে হয় ত ওদেরও আমি চিন্তে পারি! উঃ তোমার মনে

এই ছিল! আগে আগে কেমন ভিজে বেরালের মত আস্‌তে, আমাদের ঠাকুরাণীকে মাসীমা বোলে ডাক্‌তে, মনে কোর্ত্তেম, সত্যই বুঝি আদরের ঘরের বোনপো। উঃ! বোনপোর পেটের ভিতর এত বড় ছুরী!"

"বোস্ বুড়ী, বোস্!"—রাগ ভাব দূরে গেল, কণ্ঠস্বর নরম হ'লো, মৃদু হেসে বুড়ীকে তিনি বোল্লেন, "বোস্ বুড়ী, বোস্!" আমি তোকে ভয় দেখাচ্ছিলেম, বলি দেখি দেখি, ভয় পায় কি না। হাঃ—হাঃ—হাঃ! তুই বুড়ী কি ভয় পাবার বুড়ী! বুড়ীর বাবা তুই! বোস্ চুপ্ কোরে! চেঁচাস্ নি, কাঁদিস্ নি, কিছু কোরিস্ নি। তোর ভয় কি? কোন ভয় নাই। তোকে আমি বাঁচাব। তোর আমি ভাল কোর্‌ব, বোস্ তুই।"

"ওরা আগে মুখোশ খুলুক,—ওদের ভিতর যদি ডাকাত থাকে, ওরা যদি আমাকে বেঁধে ফেলে, তখন আমি কি কোর্‌ব? তুমিই বা কি কোর্ব্বে? ওরা আগে মুখোশ খুলুক, তবে আমি বোস্‌ব!—বোস্‌ব কি দাঁড়াবো, দাঁড়াব কি পালাবো, তা তখন বিবেচনা ক'র্‌বো।"

হাস্য কোরে রাজপুত্র জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সদর দরজা বন্ধ হোয়েছে?"

"দরজা কি আছে তা বন্ধ হবে?"

"তুই যা যা, দেখে আয়, সদর দরজা কেউ ভাঙেনি। যদি বন্ধ না হোয়ে থাকে, বন্ধ কোরে দিয়ে আয়।"

একটী মুখোশের ভিতর থেকে শব্দ এলো, "সে কাজ আমি আগেই সেরে এসেছি।"

মুখোশ লক্ষ্য কোরে বুড়ী বোল্লে, "সেরে রাখ্‌লেই কি আর না রাখ্‌লেই কি? যে বাড়ীটার পাতাল ফোঁড়া পথ, সে বাড়ীর উপরের দরজা বন্ধ করা না করা সমান। ইন্দুভূষণের দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার বুড়ী বোল্লে, "রাগ কর আর যাই কর, বড় অলক্ষুণে বাড়ী কিন্তু।"

"তা হোক্, তা আচ্ছা, তুই এখন বোস্। বল্ দেখি, সব ভিতরের কথা কি? জানি আমি অনেক, তবে তুই নাকি অষ্টপ্রহর থাকিস্, আর অনেক দিন আছিস্, রাণীর সঙ্গে, (শ্রীবিষ্ণু) রত্নবতীর সঙ্গে, তোর নাকি অনেক গুপ্ত পরামর্শ চলে, তুই হয় ত আমার চেয়ে বেশী জানিস্। কেমন সত্য নয়? বল্ দেখি, তুই কি জানিস্? ভয় কি? ভয় নাই, আমি তোকে বাঁচিয়ে দিব। ভিতরের সব কথা আমার কাছে ভেঙে বল্। মোকদ্দমার দায় থেকে বাঁচিয়ে দিব, আর যত দিন তুই বাঁচ্‌বি, রাজরাণীর মত সুখে থাক্‌তে পার্‌বি, তার মত উপায় আমি কোরে দিব।"

বুড়ী কিছুই বলে না, বসেও না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল মুখোশগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে, আর মুক বাঁকায়। কুমার ইন্দুভূষণ মুখোশগুলির দিকে একবার নেত্র-সঙ্কেত কোর্‌লেন, সড়্ সড়্ কোরে সব কটী মুখোশ স'রে স'রে পোড়্‌লো, সকলেরই সত্যরূপ সুপ্রকাশ। আমি দেখ্‌ছি, সবগুলি অচেনা, কেবল একখানি মুখ আমার চেনা! ইন্দুভূষণকে নিয়ে দুখানি। মুখ দুখানি বটে, এক জায়গায় দেখ্‌ছি বোলেই দুখানি বোলে চিন্‌তে পারছি, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেখ্‌লে,

কার সাধ্য, উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন ব'ল্‌তে পারে। দুই মুখ এক রকম, এক ছাঁচ, এক গড়ন, এক ডৌল; নাক, মুখ, চোক, কাণ, কপাল, ভুরু, ঠোঁট, এমন কি মাথার চুল পর্য্যন্ত নিখুঁত এক। এমন অভিন্ন অভেদরূপ মানুষের সংসারে সচরাচর দেখা যায় না। যদি এত অভেদ, তবে ইনি ইন্দুভূষণ, ইনি ললিতানন্দ, মানুষ ইটী চিন্‌তে পারে কি রূপে? সকল মানুষ পারে না। যে চক্ষের সঙ্গে এই দুই মূর্ত্তির, অথবা কেবল একটী মূর্ত্তির বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিচয়, সেই চক্ষুই কেবল নির্ণয় ক'ত্তে পারে। কুমার ইন্দুভূষণের কপালের বামদিকে, বাম কর্ণের পার্শ্বে, অঙ্গুলীর পর্ব্ব পরিমাণ একটী নীলবর্ণ জড়ুর আছে, এই মাত্র প্রভেদ। মাথার চুলে কিম্বা টুপীতে যখন সেইটী ঢাকা পড়ে, তখন ঘোরতর ভ্রান্তিরহস্য উপস্থিত হয়। ইন্দুভূষণের রূপ আমি অনেক বার দেখেছি, তবু আমি মোহনপুরীতে ঠ'কেছিলেম। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! বড়ই আশ্চর্য্য! ওঃ! পাঠক মহাশয়ের মনে থাক্‌তে পারে, মোহন পুরীর বাড়ীতে জাহাজের সেই প্রথম মূর্ত্তি দেখে, আমার মনটা কেমন একরকম চঞ্চল হোয়েছিল; তিনি সস্ত্রীক তীর্থযাত্রা কোরেছেন শুনে, চ'ম্‌কে উঠেছিলেম্; এতদিনে সে ভ্রম ঘুচ্‌লো; মুখোশ-খোলা নূতন মূর্ত্তিগুলির মধ্যে যে মূর্ত্তিটি আমার চেনা, তিনি অপর আর কেহই নহেন, মোহনপুরীর জাদুগৃহের কর্ত্তা, আমার অসময়ের আশ্রয়দাতা, জয়মঙ্গলার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজকুমার ললিতানন্দ বাহাদুর। আশ্চর্য্য সংঘটন! রত্নবর্তীর বাড়ীতে ডাকাতি হ'লো, সুড়ঙ্গের ভিতর বিয়ের আসর বোস্‌লো,

ফৌজদারীর লোকেরা গ্রেপ্তারী পরওয়ানা এনে আসামী ধোরে নিয়ে গেল, এত অশুভ ঘটনার ভিতর ললিতানন্দ বাহাদুর! তিনি আবার প্রবেশ কোরেছেন ছদ্মবেশে! চক্র বড় সামান্য নয়! যতগুলি লোক মুখোশ পোরে এসেছিলেন, সকলই দেখ্‌ছি বড়লোক। চেহারাও সব সেই রকম, বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, এক রত্নবতীর বাড়ী উপলক্ষেই ভয়ানক রহস্যজাল বিস্তার হোয়েছে।

লোকগুলির মুখ দেখে মনে যেন একটু সাহস পেয়ে, বুড়ী তখন ধীরে ধীরে ঘরের একধারে এসে বোস্‌লো। গৃহে যাঁরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, বুড়ীটা তাঁদের মধ্যে পাঁচ সাত জনের চেনা। কার মনের কি মতলব, বুড়ী সেটা জান্‌ত না। যারা যারা রত্নবতীর বাড়ীতে আসে, সকলেই হয় ত রত্নবতীর বন্ধু, বুড়ীর মনে এই রকম ধারণাই ছিল। কতক কতক কথাবার্ত্তার ভাবে সেইটীই আমি তখন বুঝ্‌তে পাল্লেম। সে প্রসঙ্গ তখন কিন্তু কিছুই উথাপন হ'লো না। কুমার ইন্দুভূষণ সমুজ্জ্বল-নয়নে বুড়ীর মুখেরদিকে চেয়ে, মিষ্টবাক্যে ব'ল্লেন, "শুনেছিস্ আমার কথা? যতদিন বাঁচ্‌বি, কোন কষ্ট থাক্‌বে না; আমি তোকে অভয় দিলেম, ফৌজদারী ফ্যাঁসাতে একবারও তোকে নিয়ে টান পড়্‌বে না; তোদের ঠাকুরাণীর যত কিছু গুপ্ত কাণ্ড—যা কিছু তুই জানিস্, মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন, সেইটা স্মরণ কোরে, সব কথাগুলি আজ আমার কাছে প্রকাশ কর্; মিথ্যা যদি ব'লিস্, কোন কথা যদি চেপে যাস্,—ফৌজদারী ত

ফৌজদারী, আমিই তোকে পাষাণ প্রতিমার কাছে খণ্ড খণ্ড কোরে বলিদান ক'র্‌বো।”

বুড়ী ভয় পেলে কি সাহস পেলে,—যার ঘেঁসে ব'সেছি, তার মুখখানা তখন আর আমি দেখ্‌তে পেলেম না; কিন্তু কথাগুলি শুন্‌বার কোন ব্যাঘাত হ'লো না। বুড়ী ব'ল্লে, “তুমি যদি একা হও, যা কিছু আমি জানি, তোমার কাছেই ব'ল্‌তে পারি; দশ জনের কাছে ব'ল্‌তে আমার বুক কাঁপে।”

কুমার ইন্দুভূষণ বন্ধুগুলির প্রতি নেত্র-সঙ্কেত ক'ল্লেন, তাঁরা তখন দ্বিরুক্তি না কোরে, সেখান থেকে উঠে, সে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের দিকে আর একটা ঘরে গিয়ে ব'স্‌লেন। এ ঘরে কেবল বুড়ী আর ইন্দুভূষণ।

যে ঘরে আমরা বোসে আছি, সেই ঘরের দরজার ছিদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত কোরে প্রসন্ন বদনে রাজপুত্র ব'ল্লেন,—কেননা, তিনি জান্‌তেন আমরা সেই ঘরেই আছি, আমাকেই লক্ষ্য ক'রে ব'ল্লেন “নূতন আশ্রমের কাণ্ডখানা যদি ভাল কোরে শুন্‌বার ইচ্ছা থাকে, কোন বাধা নাই, এই ঘরেই প্রকাশ হ'তে পার।

“আবার কেন ডাক!” একটু যেন ভয় পেয়ে বুড়ী চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লো, “আবার কেন ডাক! বুকে ছুরী দিলেও অন্য লোকের কাছে কখনই আমি ঠোঁট খুল্‌বো না”। কথাগুলি ব'ল্‌তে বল্‌তে, তাড়াতাড়ি উঠে, বুড়ী সেই দরজার ধারে এসে দাঁড়ালো, আমরাও সেই সময়—আমি, কপোতকুমারী আর ময়ূরমঞ্জরী আস্তে আস্তে দরজা খুলে বুড়ীর চক্ষের কাছে প্রকাশ পেলেম।

বুড়ীর বিশুষ্ক নিস্তেজ চক্ষু যেন জোলে উঠ্‌লো! "আছ তোমরা? ধর্ম্মে ধর্ম্মে রক্ষা পাই! সব ভাবনা ছেড়ে তোমার ভাবনাই আমি বেশী ভাব্‌ছিলেম! বাপ্‌রে বাপ্‌! রাজার মেয়েদের কি এত খেলা?"

কিছুই উত্তর না দিয়ে, বিস্মিতনয়নে বুড়ীর দিকে চাইতে চাইতে, আমরা তিন জনে ইন্দুভূষণের গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'ল্লেম। যে দিকে যে দরজা অনাবৃত ছিল, সচঞ্চলে আমিই সে গুলো তাড়াতাড়ি বন্ধ কোরে দিলেম, ইন্দুভূষণের কাছে গিয়ে বস্‌লেম, কাছে না,—যেখানে তিনি, তার প্রায় চারি হাত তফাতে দুটী সহচরীর মাঝ্‌খানে আমি, আমাদের দুহাত তফাতে ইন্দুভূষণের সম্মুখে বুড়ী।

রাজপুত্র আবার পূর্ব্ব প্রশ্ন নূতন কোরে তুল্লেন। বুড়ী আপনার গুপ্তকাহিনী আরম্ভ ক'ল্লে।

"আচ্ছা, রাজপুত্র! ও সব কথা আমাকে তুমি জিজ্ঞাসা ক'চ্চ কেন? কি তোমরা না জান? রাণী রত্নবতী তোমার মাসিমা, তোমরা এই বাড়ীতে যাওয়া আসা কর, তোমাদের সঙ্গেই সব কথা হয়; আমি গরীব মানুষ, বুড়ো মানুষ, তাতে আবার দাসী, আমার কাছে বেশী কথা কি শুন্‌তে পাবে?"

"বেশী কথা কম কথা তা আমি ব'ল্‌ছি না। রত্নবতী আমার মাসীমা, সে সম্পর্কও তোর্ মুখে শুনতে চাই না। আমি যতটুকু জেনেছি, সে সব ত নূতন কথা। তুই এ বাড়ীতে আছিস্, আজ্ কম-বেশ বিশ বৎসর। আমি শুনেছি, রত্নবতী যখন রাণী হন নাই, তখনও তুই রাজার কাছে চাকুরি কোত্তিস।

কাণ্ড-কারখানা যা কিছু, তোর্ তা অজানা নাই। আমি শুনেছি, রাজা-রাণী তোর্ কাছে কোন কথা গোপন ক'ত্তেন না। সেই সব কথাই আমি জিজ্ঞাসা ক'চ্চি।”

“অত কথা আমার মনে নাই। রাজা মহীপৎ বাহাদুর তিনটী বিবাহ কোরেছিলেন; সেই তিনটী রাণীই এই বাড়ীতে থাকৃতেন। রত্নবতী কে, তা আমি তখন জান্তেম না। রাণী তিনটী একদিনে মারা পড়েন। সকলের মনেই মহা সন্দেহ! অনেকেই অনেক রকম কাণাঘোসা করে;—কেহ কেহ বলে, এমন মরণ আশ্চর্য্য! কে হয় ত আড়ি কোরে বিষ খাইয়ে মেরেছে।”

“বিষ! তুই জানিস্ সে কথা? কে খাইয়েছিল, তা তুই শুনেছিস্?”

“কাণাঘোসা কথা আমি কেমন ক'রে ঠিক্ ক'রে বোল্‌বো? উঠেছিল ঐ কথা, কিন্তু রাজা মানুষ তিনি, জোর কোরে কেহই কোন কথা নিয়ে পীড়াপীড়ি কোরতে পাল্লে না। মাস্‌খানেক সেই কথা নিয়ে কাণাকাণি হোয়েছিল, তার পর চাপা পোড়ে গেল। একমাস পরে রত্নবতী এই বাড়ীতে এলেন। রত্নবতীর বয়স তখন একুশ কি বাইশ বৎসর; সেটা বোলছি প্রায় যোল সতের বৎসরের কথা। থাকৃতে থাকৃতে জান্‌লেম, রাজা মহীপতের চার বিবাহ। কুল-শীলের পরিচয় না জেনে, রাজা রত্নবতীকে বিবাহ কোরেছিলেন, রূপ দেখে মোহিত হোয়েছিলেন, যৌবনে রত্নবতী খুব সুন্দরী ছিলেন, সেইজন্যই রাজা তাঁকে বিবাহ করেন, এই রকম আমি শুনেছি। শেষে নাকি

প্রকাশ পায়, রত্নবতী রাজার মেয়ে নয়, ক্ষত্রিয়ের মেয়েও নয়; সামান্য একজন মাড়ওয়ারী দোকানদারের মেয়ে। সেইটী জান্‌তে পেরে, লোকলজ্জার ভয়ে, রাজা রত্নবতীকে বাড়ীতে আনেন নাই। রাণীগুলি পৃথিবী থেকে চোলে যাবার পর-লোক, নিন্দার ভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান কোরে, জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় বন্ধুর কোন খাতির না রেখে, রাজা তখন রত্নবতীকে বিবাহ করা রাণী বোলে গ্রহণ করেন, এই বাড়ীতেই এনে রাখেন। কথা টি টি হ'য়ে যায়। দেশ বিদেশের কোন লোক এ বাড়ীতে আর আসেন না, কোন সংশ্রব রাখেন না, রত্নবতীকে নিয়ে রাজা তখন একঘোরে।"

"আচ্ছা, বাড়ীতে এই সব সুড়ঙ্গ আছে; এই সকল সুড়ঙ্গ পথে তখন কোন লোকজন যাওয়া আসা ক'র্‌তো কি না, তা তুই বোল্‌তে পারিস্?"

"বাড়ীখানা অনেক দিনের পুরাতন, রাজা মহীপতের পৈতৃক ভদ্রাসন নয়, কোনকালে আরও কোন রাজার বাড়ী ছিল; অনেক হাত ফিরেছে, তার পর মহীপৎ বাহাদুর এই বাড়ীখানি কিনে কাশীবাসী হন। সুড়ঙ্গ ছিল; রাজা যতদিন ছিলেন, ততদিনের মধ্যে কিছুই আমি জান্‌তেম না। রত্নবতী যখন বিধবা হোলেন, সেই সময় অবধি আমার মনে কেমন এক একটা খট্‌কা জন্মাতে লাগ্‌লো। অনেক রাত্রি, বাড়ীর চতুর্দ্দিকের সমস্ত দরজা বন্ধ, সকলেই শুয়েছে; বাড়ীর ভিতর ঘণ্টা বাজে! কোথায় বাজে, কে বাজায়, কিছুই আমি জান্‌তে পারি না! রোজ রাত্রে শব্দ পাই না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত

জেগে থাকা অভ্যাস,—বরাবর অভ্যাস নয়, রাণী তিনটী মর্‌বার পর অবধি মনে কেমন একটা আতঙ্ক হয়! বাড়ীখানা যেন খাঁ খাঁ করে! চাঁদ্‌নি রাত্রেও যেন অন্ধকার দেখায়! থাকে থাকে কে যেন গভীর রাত্রে আমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়! আব্‌ছায়ায় দেখি, আঁৎকে উঠি, চেয়ে দেখি, আর দেখ্‌তে পাই না! তার উপর আবার ঘণ্টা বাজার শব্দ! বিষ খাওয়ার কথাটা মনে পড়ে—হেসো না তুমি, মেয়ে মানুষ, আমি মনে করি ভূত! ঘুম হয় না! বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ করি। পাঁচ সাত রাত্রি উঠাউঠি চুপ্‌চাপ। কখনও কখনও মাসখানেক কিছুই সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। অকস্মাৎ এক এক রাত্রে ঘণ্টা বেজে উঠে! ভাব্ কি? প্রায় একমাস দেড় মাস ঐ রকম হয়। আমি শুয়ে শুয়ে ভয় পাই। ভূতের ভয়ে বাহির হোতে পারি না।"

"আচ্ছা, রত্নবতীর সঙ্গে রাজার বিয়ে হোয়েছিল, এ কথাটা তুই কার্ মুখে শুনেছিলি?"

"রাজার মুখে।"

"রত্নবতী কিছু বোলেছিল?"

"তা বোলেছিলেন বৈকি। রাণী তিনি, তিনি কেন সে কথাটী লুকিয়ে রাখ্‌বেন?"

"আচ্ছা, কাশী জায়গা, বিশ্বেশ্বর পুরী, এখানে ত অনেক বড় বড় লোকের বাস, অন্য কোন লোকের মুখে তুই কোন কথা শুনেছিলি?"

"ও কি গো? ও কথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা কর? মেয়ে

মানুষ আমি, রাজবাড়ীতে দাসীবৃত্তি ক'র্‌তে এসেছিলেম, ও সব কথা—"

"না না, তা ব'ল্‌ছি না। বিবাহের কথাটা অন্যলোক একেবারেই কিছু জানে না, এমন কি কখনও সম্ভব হ'তে পারে? ভয় কি তোর্? লজ্জা কি? একটু একটু সঙ্কেত আমি পেয়েছি, তাই জন্যেই জিজ্ঞাসা কোচ্চি। রত্নবতী ত গিয়েছে। প্রাণে যদিও বাঁচে, রাণী বোলে দাবী কোরে এ বাড়ীতে আর তাঁকে ফিরে আস্‌তে হবে না। সে কথাটা আমি তোদিকে নিশ্চয় কোরেই বোল্‌ছি। তবে আর তোর ভয় কি? বল্ তুই। কারও মুখে শুনেছিলি কিছু?"

মাথা হেট কোরে, খানিকক্ষণ ভেবে, যেন কেমন এক প্রকার হতবুদ্ধি হ'য়ে, বুড়ী কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে রইলো; একবার রাজপুত্রের মুখের দিকে চায়, একবার আমার মুখের দিকে চায়। রাজপুত্র বারম্বার জেদ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন, বার বার অভয় দিলেন,—সত্য কথা না বোল্লে বিপদ্ হবে, এই রকম ভয় দেখালেন। বুড়ী তখন নাচারে পোড়ে, মনের কথা ভাঙ্‌লে। বুড়ী বোল্লে, "এ বাড়ীতে আস্‌বার আগে অন্নপূর্ণা পুরীর একজন পুরোহিতের বাড়ীতে আমি চাকরি ক'র্‌তেম, এখানে এসেও মাঝে মাঝে সে বাড়ীতে আমার যাওয়া আসা ছিল। সেইখানেই আমি শুনেছিলেম, রাজা মহীপতের সঙ্গে সমস্ত জ্ঞাতি-কুটুম্বের যখন চলাচল বন্ধ হয়, সেই সময় ঐ কথা নিয়ে ভারি ঘোঁট হোয়েছিল, গোপনে গোপনে অনেক লোক অনেক প্রকার সন্ধান নিয়ে ছিল;

তাতেই নাকি প্রকাশ পায়, ঐ রত্নবতী পৈরাগের একজন জহরী মহাজনের বিবাহ করা স্ত্রী। আমাদের রাজা যখন পৈরাগে যান, সেই সময় কেমন কোরে ঐ রত্নবতীর সঙ্গে তার দেখা হয়। রত্নবতীর নাম ছিল তখন 'যোগিয়া।' রাজার সঙ্গে যোগিয়ার সেই সময় গুপ্ত প্রণয় জন্মে। যোগিয়াকে অনেক টাকা দিয়ে রাজা সেই জহরীটাকে বিষ খাইয়ে মারবার পরামর্শ দেন। সত্যই না কি তাই হয়! তার পর সেই জহরীর যথাসর্ব্বস্ব চুরী ক'রে, যোগিয়া সেই পৈরাগেই আর একখানা বাড়ীতে গিয়ে বাস করে; স্বামীর সাবেক বাড়ীখানা বিক্রয় কোরে ফেলে! স্বামী নাই, পুত্র কন্যা হয় নাই, যোগিয়াই সব, কাজেই কেহ ওকথার ভাল মন্দ কিছুই বলে না। যোগিয়া সেই নূতন বাড়ীতেই থাকে। বয়েস কম; ধর্ম্মপথে মতি না থাক্‌লে, সে অবস্থায় যে রকমটা ঘোটে থাকে, যোগিয়ারও তাই ঘোটেছিল। রাজা মধ্যে মধ্যে পৈরাগে বেড়াতে যেতেন, যোগিয়া যাতে রাজভোগে সুখে থাক্‌তে পারে, তার ব্যবস্থা ক'রে দিতেন। আগেই ব'লেছি, লোক-লজ্জার ভয়ে বাড়ীতে আন্‌তে পার্‌তেন না; শেষকালে নিষ্কণ্টক হোয়ে রাণী বোলে বাড়ীতে এনেছিলেন; এইখানেই যোগিয়ার নাম হোয়েছিল রত্নবতী!"

"হাঁ; এখন বুঝ্‌লেম, বিবাহের কথাটার চেয়ে এই কথাটাতেই বেশী জোর। রত্নবতী তবে বাজারের বেশ্যা!"

'শুননা বলি। লজ্জা খেয়ে সব কথাই যখন তোমার কাছে ব'ল্‌তে হোলো, তুমি যখন আমাকে বাঁচাবে বোলে, তখন

আর কোন কথাই লুকিয়ে রাখ্‌বো না। ভূতের ভয়ে রাত্রি-কালে আমি ঘর থেকে বেরুতে পারি না। যে যে রাত্রে ঘণ্টা বাজে, সেই সেই রাত্রে আরও বেশী ভয়! এক রাত্রে আমি আপনার ঘরে শুয়ে আছি, বাহিরের দিকে কেমন এক রকম ঝন্ ঝন্ কোরে শব্দ হোলো! কে যেন কোন্ ঘরের কপাট জানালা বন্ধ কোরে দিলে, কি খুলে ফেল্লে, এম্‌নি শব্দ—বাতাস হলেও হ'তে পারে, কিন্তু তখন তেমন বাতাস ছিলনা। রাত্রি অনেক। জাগন্ত মানুষ আমি, স্বপ্ন নয়, স্পষ্ট স্পষ্ট শব্দ শুন্‌তে পেলেম।—হা, একটী কথা ব'ল্‌তে ভুলে গিয়েছি,—রাজা তখন বাড়ীতে ছিলেন না, বাঙলা দেশে তখন মোগল-পাঠানে কি একটা যুদ্ধ, আমাদের রাজাও একজন বীর পুরুষ ছিলেন কিনা, আরও কত বীর পুরুষের সঙ্গে তিনি বাঙলা দেশে গিয়ে-ছিলেন। রাণী রত্নবতী রাত্রিকালে আপনার ঘরে একাকিনী শুয়ে থাকেন, অপরাপর লোকজন সব নিজের নিজের ঘরে, পুরুষ মানুষেরা বাহির মহলে নিদ্রা যায়। জানালা দরজার শব্দ হ'লো। বাড়ীতে কেউ জেগেছে নাকি? কাণ পেতে থাক্‌লেম, আর কোন শব্দ পেলেম্ না। ভুতের ভয় মনে এলো; বিছানা থেকে উঠ্‌তে পার্‌লেম না, কাণ পেতে আছি, অনেকক্ষণ আর কোন সাড়া শব্দ নাই। মনে মনে ভাব্‌লেম, যদি কেহ জেগে থাকে, দরজা খুলে বেরিয়ে থাকে, আবার শব্দ হবে; কিন্তু সে রকমের কোন শব্দই আর পেলেম্ না। ভুতের ভয়ই আমার মনের ভয়, যেমন আসে তেম্‌নি যায়। বাড়ীতে ভুত কখন কোন দৌরাত্ম্য করেনা, মনে মনে ভাবলেম্ তবেই বা ভয়

করি কেন? অমন একটা বিশ্রী শব্দ হ'লো, আমি জেগে আছি, আর সবাই ঘুমিয়ে প'ড়েছে, রাত্রি সাঁ সাঁ ক'র্‌ছে, চুপ্‌টী ক'রে শুয়ে থাকা ভাল কর্ম্ম নয়; রাত্রে যদি কিছু ঘটে, সকালে আমাকেই গালাগালি খেতে হবে; কেননা, আমি জেগে থাকি, রাণী সেটা বেস জানেন। সাত পাঁচ অনেক ভাব্‌লেম, আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠ্‌লেম, আলো জাল্লেম, টিপি টিপি দরজা খুল্লেম, চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে একটু গা ঢাকা হ'য়ে, এদিক্ ওদিক্ উঁকি মেরে দেখ্‌লেম, লোক জন কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। রাত্রি অন্ধকার নয়, বেস্ জ্যোৎস্নার আলো; টিপি টিপি ঘরের দরজাটী ভেজিয়ে দিলেম, বারাণ্ডায় বেরুলেম, আলোটী ঘরের ভিতরেই থাক্‌লো। পা টিপে টিপে রাণী রত্নবতীর ঘরের দিকে যাচ্ছি, প্রায় কাছাকাছি গেছি, ঘরের ভিতর যেন হুজন মানুষের কথা শুন্‌তে পেলেম। ফুস্ ফুস্ কোরে কথা। একি! রাণী একাকিনী, কথা কন কার সঙ্গে? সন্দেহ হোলো। খুব সাবধানে, পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে, নিঃশব্দে ঘরের জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেম। জানালা খোলা; দেখ্‌তে পাচ্ছি বেস্; ঘর যদিও অন্ধকার, কিন্তু বারাণ্ডা পর্য্যন্ত চাঁদের আলো এসেছে; বেস্ দেখ্‌লেম, খাটের উপর হুজন মানুষ,—হুজনেই পাশাপাশী হোয়ে ব'সে আছে, চুপি চুপি কথা হ'চ্ছে; দেখে ত আমার আত্মাপুরুষ কেঁপে উঠ্‌লো! কি সব কথা হ'চ্ছে, শোন্‌বার দরকার ছিল না, তবু কিন্তু ইচ্ছা হ'লো, শুনি; আরও সাবধান হ'য়ে দাঁড়ালেম। কথা হোচ্ছে হুজনে,—

একটী আমাদের রাণী, আর একটী পুরুষ মানুষ। রাণী জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন, "নৌকার মাঝীটাকে সে কথাটা ভাল কোরে বোলে দিয়েছ'ত ?" পুরুষ মানুষটী উত্তর কোল্লে, "বলাবলি কেন জিজ্ঞাসা কোচ্ছ ? নিশ্চয় মনে ক'রে রাখ, কাজ্‌টা সাবাড় হোয়ে গ্যাছে।" রাণী আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "পার্‌বে তারা ?" আবার উত্তর হ'লো, "টাকার জোর বড় জোর! সংসারে যা কিছু দেখ্‌ছো, সমস্তই রূপচাঁদের খেলা! একখানা ঠিকে নৌকার মাঝী, সে যদি একদিনে এক থোকে দশ টাকা হাতে পায়, তার আর আহ্লাদ ধরে না;—আমাদের ডাক হোচ্চে, হাজার টাকা! এতেও কি তুমি কোন রকম সন্দেহ কর ?" পুরুষটীর দিকে একটু স'রে ব'সে, রাণী তার মুখের কাছে মুখ তুলে চুপি চুপি ব'ল্লেন, "সে কথা ব'ল্‌ছি না, নৌকায় ত আরও সব লোকজন থাক্‌বে, নৌকাখানা ডুবিয়ে দিলে, আর সব লোক বাঁচ্‌বে কেন ?" লোকটী একটু হেসে হেসে বোল্লে, "তা বুঝি জাননা ? সে ফিকিরটা বড় পাকা হ'য়েছে! মিথ্যা একটা অছিলা তুলে, দাঁড়ী-মাঝীরা নৌকার ভিতর একটা গণ্ডগোল বাধাবে, যারা যারা নৌকাতে থাক্‌বে, মধ্যস্থের মত তারাও তাতে কথা কইতে বাধ্য হয়, এমনি একটা ফ্যাসাদ উপস্থিত ক'র্‌বে; ইনি একজন তেজস্বী পুরুষ কি না, গোলমালটা থামিয়ে দিতে যাবেন, সেই উপলক্ষে কথায় কথায় গালাগালি হবে; দাঁড়ি-মাঝীরা সব মাতাল থাক্‌বে, তখনি হুড়্‌মুড়্ ক'রে তার ঘাড়ের উপর পোড়ে কাপড় দিয়ে হাত, পা, মুখ বেঁধে ফেলে, ঝুপ্ কোরে জলে টেনে ফেলে দিবে!

বুঝ্‌লে না ?” রাণী বোল্লেন, “বুঝ্‌লেম ; কিন্তু নৌকার আর সব লোক হামী হবে না ?” পুরুষ মানুষটী কেমন এক রকম ভঙ্গীতে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়ে হেসে হেসে ব’ল্লেন, “হামী হবে মহী-পতের জন্যে ? একটা এক গুঁয়ে এক ঘোঁয়ে রাজার জন্যে ? তুমি জাননা, আমি জানি, দেশের সমস্ত লোক তার উপর চটা,—হাড়ে হাড়ে চটা ;—হামী হবার কথা ভাব্‌ছো কি ? তারা বরং খুসীই হবে। জলের উপর কাণ্ড, রাত্রিকালেই হবে, কাক পক্ষীও জান্‌তে পার্‌বে না, স্বচ্ছন্দে সব কাজ ফর্সা হোয়ে যাবে ! কে ক’ল্লে, কোথায় কি হ’লো, কি বৃত্তান্ত, কিছুই প্রকাশ পাবে না ! কোন চিন্তা নাই ! আমার সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো ! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থর্ থর্ ক’রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম ! রাণীর ঘরে অত রাত্রে পুরুষ মানুষ, তাই দেখেই ত কেঁপেছি, তার উপর আবার রাজাকে নৌকা থেকে জলে ফেলে দিয়ে খুন ক’র্‌বার পরামর্শ ! ও হরি ! এত পাপেও পৃথিবী আজও ডোবে না ! আর সেখানে দাঁড়ালেম না, আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে এলেম ; বিছানায় গিয়ে শুলেম না, চৌকাঠের পাশেই দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। আমার——”

সবিস্ময়ে কুমার ইন্দুভূষণ জিজ্ঞাসা ক’ল্লেন, “সত্যই কি তাই হ’লো ?”

রাণী উত্তর ক’ল্লে, “হ’লো না ত কি হোলো ! দশ দিন পরে খবর এলো, পথের মাঝ্‌খানে নৌকা-ডুবি হ’য়েছিল, আর সব লোক সাঁত্‌রে বেঁচেছে, দুজন দাঁড়ী আর রাজা মহী-পতটী ডুবে মোরেছে !”

একটী নিশ্বাস ফেলে, একটু ভেবে, রাজপুত্র ব'ল্লেন, "আচ্ছা; সেই যে পুরুষ মানুষটীর সঙ্গে রাত্রিকালে রত্নবতীর পরামর্শ হোয়েছিল. সে লোকটীকে তুই চিন্তে পেরেছিলি ?"

বুড়ী উত্তর ক'ল্লে, "শোননা বলি ! সেই কথাই ত আমি ব'ল্‌ছিলেম, তুমি আর একটা কথা এনে ফেল্লে। জানালার কাছ থেকে ফিরে এসে আমি আমার ঘরের চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। মনে ক'ল্লেম, এই লোকটা যখন আসে, তখনই কপাটখোলা শব্দ হ'য়েছিল ;—ধীরে ধীরে বন্ধ ক'রেছিল, সে শব্দ আমার কাণে আসে নাই। দাঁড়িয়ে আছি, আস্তে আস্তে দরজা খুলে সে লোকটা বেরিয়ে এলো। চৌকাঠের গায়ে গা ঘেঁসে আমি কেবল চক্ষু দুটী বার্ কোরে আছি। লোক্‌টা যখন বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ালো, সেই সময় পরিষ্কার চাঁদের আলো তার মুখে পোড়্‌লো, মুখখানি চিন্তে পাল্লেম ; তার পরেও অনেকবার দেখেছি।"

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, "নাম বল্‌বার কিছু বাধা আছে ?" বুড়ী বোল্লে, "এত দিন ছিল, এখন ফুরিয়েছে। বাপ্‌রে বাপ্ ! তোমাদের কাশীর পায়ে শত শত দণ্ডবৎ !"

মৃদু হেসে, রাজপুত্র ব'ল্লেন, "কেন বুড়ী, কাশীর উপর কোপ কেন ?"

বুড়ী বোল্লে, "নয় কেন ? যে লোকটার কথা আমি ব'ল্‌ছি, যে লোকটার নাম তুমি জান্‌তে চাচ্চো, সে লোকটার অপার লীলা ! কাশীর অনেক লোক গোপনে গোপনে সেই রকম লীলাবাজী চালায় !"

সেইরূপ হাস্য কোরেই কুমার ইন্দুভূষণ আবার জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, "তবু শুনি না, বল্‌না তুই, লোকটা কে? নামটা কি?"

বুড়ী উত্তর ক'ল্লে, "হি—হি—হি! তোমরা বুঝি তাকে চেননা? তোমরা বুঝি কিছু জাননা? কোতয়ালেরা চিনেছে। ঐ যে লোকটার নামে গ্রেপ্তারী-পরওয়ানা, বিয়ের সভায় যে লোকটার নাম বেরিয়েছে ভীমরাজ! উঃ! লোকটার পেটে এতদূর বুদ্ধি! এতদূর হারামের ছুরী! কেমন ফিকির ক'রে ক'রে আদালতের হাত থেকে এত কাল বেঁচে বেঁচে বেড়াচ্ছিল! কোতয়ালেরা ব'লে গ্যাছে, রাজা নয়, রাজা সেজে বেড়াতি! আমি কিন্তু এতদিন তাকে রাজা ব'লেই জান্‌তেম,—গুণ্ডা ভেজিয়ে ওরা যখন আমাদের রাজাটীকে জলে ডুবিয়ে খুন করে, তার দিনকতক পরে ঐ ভীমরাজ আমাদের রাণীর ঘরে ব'সে, মস্ত একখানা কাগজে কি একখানা দলিল লেখে, সেই দলিলে, আমাদের মরা রাজার নাম দস্তখত থাকে; সত্য কিন্তু সেটা ভীমরাজের দস্তখত। দলিল যখন লেখা হয়, আমাকে দেখে কোন ভয় ক'ল্লে না, আমি তখন তাদের কাছেই দাঁড়িয়েছিলেম; স্বচক্ষে দেখেছি, ভীম-রাজ হাস্‌তে হাস্‌তে আমাদের রাজার নাম দস্তখত কোল্লে, রত্নবতীকে সেই দস্তখতটা দেখিয়ে সেই সময় হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, "দেখ দেখি ঠিক্ তোমাদের রাজার হাতের লেখা নয়?"

মহা বিস্ময়ে কুমার ইন্দুভূষণ ব'লে উঠ্‌লেন, "বটে? সেই দলিলখানার কর্ত্তা তবে ভীমরাজ?"

বুড়ী ব'ল্লে, "সে নয় ত আর কে! সেই দলিলের জোরেই

ত রত্নবতী এত দিন গায়ের গর্ব্বিতে রাজত্ব ভোগ ক'চ্ছি-লেন।"

রাজপুত্র ব'ল্লেন, "প্রথম রাত্রে চাঁদের আলোতে তুই ত সেই মুখখানা দেখ্‌লি, তার পর সে বেরিয়ে গেল কোন্ পথে ?"

বুড়ী উত্তর ক'ল্লে, "তখন জান্‌তেম না, এখন জানি ; তোমরাও সে পথ জান। সেই পথে কত ছিষ্টি হোতো, হোম্‌রা চোম্‌রা কত রাজা, কত আম্‌লা, কত জুয়ারী, কত মাতাল একত্র হোতো,—মাঝে মাঝে সব ভদ্রলোকের মেয়ে ধ'রে আন্‌তো,—কার কবে কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে, তার পরামর্শ কোর্‌তো! ইদানী তুমিও ত তার অনেক দেখেছ—তুমিও ত সেই সব দলে থাক্‌তে !"

"দূর বুড়ী !" হাস্‌তে হাস্‌তে ইন্দুভূষণ ব'ল্লেন, "দূর বুড়ী ! থাক্‌তেম ব'লেই কি আমি সে সব কাজের ভিতর থাক্‌তেম ?"

বুড়ী ব'ল্লে, "তা আমি কি জানি ? চোরের সঙ্গে থাক্‌লেই চোর বলে ! আরও, আজ্ আবার এই ডাকাতির সময় ডাকাতের সঙ্গে এসেছ ! সে দলের তুমি নও কেমন ক'রে আমার বিশ্বাস হবে ?"

রাজপুত্র ব'ল্লেন, "বিশ্বাস হবার সময় এসেছে। আর তুই কি কি জানিস্ ?"

বুড়ী ব'ল্লে, "তুমিও যা জান, আমিও তাই জানি ; একটী কথা তুমি জাননা, আমিও সেটী ব'ল্‌বো না।"

রাজপুত্র ব'ল্লেন, "সেটী তবে আমাকে শুন্‌তেই হবে। আদালতে যাবে না, যদি নিতান্ত গুহ্য কথা হয়, আমার কাছেই

গোপন থাক্‌বে; কিন্তু এ বাড়ীর পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব সমস্তই আমার শোনা চাই।”

বুড়ী ব'ল্লে, “দুটী জীবের প্রাণ নষ্ট হবে! দিব্বি দেওয়া কথা, তা আমি কেমন ক'রে ব'ল্‌বো? উঃ! ভীমরাজ আর সোমরাজ তারা দুটোতে না ক'রেছে, এমন কর্ম্মই নেই! যে কথাটা তুমি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ, তার ভিতরেও তারা দুজন! একটা কিন্তু আমার বড় সন্দেহ আছে——”

এই পর্য্যন্ত বোলে, আমার দিকে চোক্ষু দিয়ে, অঙ্গুলি হেলিয়ে, বুড়ী তখন সন্দেহের কথা ব'ল্‌তে লাগ্‌লো। “এই যে মেয়েটীকে তোমরা এখানে এনে রেখেছ——” রাজপুত্রকে ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে থেমে গিয়ে সরাসর আমাকেই লক্ষ্য ক'রে ব'ল্লে, “হ্যাঁগা, ও মেয়েটী! ওগো, ও রাজার মেয়ে! সোম-রাজ নামে কোন রাজার ছেলে কি তোমার চেনা আছে? তোমার নাম ত শুন্‌চি কুঞ্জবালা, তোমার কি আর কোন লুকান নাম আছে?”

বুড়ীর প্রশ্নের ত কোন কথাই আমি বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। সন্দেহ-বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেম, “কেন তুমি ওকথা আমায় জিজ্ঞাসা ক'ল্লে?”

“হাঁ, তাই ব'ল্‌চি,—তাই ব'ল্‌চি, ঐ কোতয়ালেরা যেটাকে ডাকাত ব'লে বেঁধে নিয়ে গেল, তারি নাম সোমরাজ! পরি-চয় দেয় রাজার ছেলে ব'লে! কাণ্ডই মিথ্যে! ঐ সোমরাজ— রাজপুত্র শোনগো! ঐ সোমরাজ অনেকদিন হোলো, এই সুড়ঙ্গের ভিতর একটী বিদ্যেধরীর মতন মেয়ে ধ'রে আনে—

কোথা থেকে চুরী ক'রে আনে, ঠিক্ যেন তোমার মত! দুটীকে এক জায়গায় দাঁড় করালে চেনা যায় না; যখন এনেছিল, তখন তোমার চেয়ে বয়স কম, এখন হয় ত সমান হবে। আমি ত প্রথম রাত্রে তোমাকে দেখেই মনে ক'রেছিলেম, সেই মেয়ে; তার পর শুন্‌লেম, তুমি হ'য়ে গেলে কুঞ্জবালা। কিন্তু সেটীতে তোমাতে ঠিক্ যেন এক ছাঁচে ঢালা!"

বুড়ী আমার সঙ্গে কথা ক'চ্ছিল, মাঝ্‌খানে বাধা দিয়ে রাজপুত্র ব'ল্লেন, "তা সমান হোতে পারে; ওসব দৈবাতের কথা; দৈবাৎ রূপে রূপে মিলে যেতে পারে; কিন্তু মেয়েটী এখন গেল কোথা?"

হঠাৎ সদর দরজায় চীৎকার,—ঘন ঘন কপাটে আঘাত। রাজপুত্র সচঞ্চলে আসন থেকে উঠে, আমাদের সেইখানেই বোস্‌তে ব'লে, বারাণ্ডায় বেরিয়ে গেলেন। অন্য ঘরে যাঁরা গিয়ে বোসেছিলেন, তাঁরাও বেরিয়ে এলেন। পুনঃ পুনঃ কপাটে আঘাত, পুনঃ পুনঃ চীৎকার! এ আবার কি ফ্যাসাদ! রাত্রি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, এখন ত আর ডাকাত পড়্‌বার সময় নয়! তবে এরা কারা? তৎক্ষণাৎ তলোয়ারের খাপ খুলে রাজপুত্র নিজেই গুম্ গুম্ শব্দে উপর থেকে নেমে গেলেন। একাকীই গেলেন। আমার কিন্তু ভয় হ'লো। সঙ্গী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বারাণ্ডার রেল ধ'রে, উঁকি মেরে নীচের দিকে ঝুঁকে, কাণ্ডখানা কি, দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সিঁড়িতে চার্ পাঁচজন লোকের পায়ের শব্দ! রাজপুত্রের কথা আর মনে রাখ্‌তে পার্‌লেম না,—সাহস

হলো মা;—আগে আমরা যে ঘরটীতে লুকিয়ে ব’সেছিলেম, তাড়াতাড়ি সখীদের হাত ধ’রে সেই ঘরে গিয়েই প্রবেশ ক’র্‌লেম;—বুড়ীকে পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেম।’

লোকেরা এসে উপস্থিত। অগ্রে অগ্রে রাজকুমার, পশ্চাতে আর তিনজন,—সহর কোতয়াল, একজন বরকন্দাজ, আর হাতে পায়ে শিকল বাঁধা সোমরাজ; যে ঘরে ব’সে আমাদের কথা হ’চ্ছিল, সেই ঘরেই প্রবেশ ক’র্‌লেন, আসামী নিয়ে কোতয়ালেরাও সেই ঘরে এলো; যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও এলেন। তাঁরা কিন্তু সকলেই বিস্ময়াপন্ন! আমরাও তাই! রাজপুত্রের সঙ্গে সকলে এসে এক জায়গায় ব’স্‌লেন, আসামীর মোতায়েনে কোতয়ালেরা দাঁড়িয়ে থাক্‌লো। সহর কোতয়াল বোল্লে, “এই বাড়ীতেই আছে। বুকে জাঁতা ঘুরিয়ে এত পীড়াপীড়ি করা গেল, এত বড় বদ্‌মাস্, কিছুতেই মুখের কথা বাহির করা গেল না। আমাদের খানাতল্লাসীতে ভুল হ’য়েছে! স্নুড়ঙ্গের ঘরগুলো কিছুই তল্লাস করা হয় নাই; প্রতিমা আছে ত প্রতিমাই আছে! তার ভিতর যে মানুষ কয়েদ কর্‌বার গুদোম ঘর, সে কথাটা কেহই প্রকাশ করে না। যতগুলো অপরাধ পরওয়ানাতে লেখা, তার ভিতর একটা হ’চ্চে দুটী মেয়ে মানুষকে গুম্ করা, সেই অপরাধের সর্দ্দার আসামী এই সোমরাজ; এর বাপ্‌টাও তাই বটে, কিন্তু এরই অপরাধ বেশী। একটী মেয়ে খুব ছেলে মানুষ, সেটীকে গুদোমের ভিতর কয়েদ ক’রে, যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দেওয়া হোচ্চে। চলুন রাজকুমার! স্নুড়ঙ্গ তল্লাস, আমাদের আজ্ রাত্রের ভারি

জরুরী কাজ। ভীমরাজের বুকে বাঁশ দিয়ে, যখন দলন করা হয়, পাষাণবুকো ডাকাত কাঁদে না! শেষটা যখন জীব বেরিয়ে প'ড়্‌লো, তখন গোঁ গোঁ ক'রে বোল্লে, 'ঐ বাড়ীতেই আছে, স্থড়ঙ্গের ভিতরেই আছে।' আস্থন্ আপ্‌নারা।"

কোতয়ালের সঙ্গেই লণ্ঠন ছিল, সেই লণ্ঠন ধ'রে, তাঁরা সকলেই স্থড়ঙ্গপথে নেমে গেলেন। যেতে যেতে কুমার ইন্দুভূষণ একাকী একবার ফিরে এসে, আমাদের ঘরের দরজার কাছ থেকে চুপি চুপি বোলে গেলেন, "বোসো তোমরা, কোন ভয় নাই, সব নূতন নূতন ফোয়ারা উঠ্‌ছে!"

চুপি চুপি আমাদের এই কথা ব'লেই, রাজপুত্র আবার দলের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলেন। আমার মনে ভয়ও আছে, ভরসাও আছে। ও ঘরটা থেকে স'রে এসে ভালই ক'রেছি, শক্ত শিকলে বাঁধা থাক্‌লেও বাঘ দেখে কার না ভয় হয়? সোমরাজটা ঘরে এসে আমাকে দেখ্‌তে পেলেই চিন্‌তে পার্‌তো। যে অপরাধে এই খানাতল্লাসী হ'চ্চে, সে অপরাধ মেয়ে মানুষকে গুম্ করা।—গুম্ করা মানে, বে-আইননতে লুকিয়ে কয়েদ করা। সোমরাজেরা বাপ্ বেটায় দুটী মেয়ে মানুষকে এই বাড়ীর স্থড়ঙ্গের ভিতর লুকিয়ে কয়েদ ক'রে রেখেছে! বিচিত্র কথা কিছুই নয়, স্থড়ঙ্গের যে রকম নবরঙ্গ কাহিনী শুন্‌লেম, গুম্ করা, খুন্ করা, জীয়ন্ত গোর দেওয়া, কিছুই অসম্ভব নয়! কিন্তু কারা?—কারা সেই দুটী মেয়ে মানুষ? বুড়ী ব'ল্‌ছিল, সোমরাজ যে মেয়েটীকে ধ'রে আনে, সেটীর চেহারা ঠিক্ আমার মত! কে সেটী তবে? সেইটী-

কেই কি তবে গুম্ ক'রেছে? কিছুই জানি না, কিছুই নিশ্চয় নাই, তথাপি মনের ভিতর কতই ভাবনা আস্‌ছে। হঠাৎ সুড়ঙ্গের ভিতর মহা চীৎকারধ্বনি! আতঙ্ক আছে, দর্প আছে, ধর্ ধর্ মার্ মার্ শব্দ আছে, এক সঙ্গে অনেক লোকের কলরব, হুলস্থূল কাণ্ড!

বড় জোর পাঁচ সাত লহমা। কুমার ইন্দুভূষণ সুড়ঙ্গপথে তাড়াতাড়ি ছুটে আমাদের কাছে এলেন। তাঁর মুখ দেখেই আমি কোন অমঙ্গল আশঙ্কা ক'ল্লেম! তিনি এসেই আমাদের ব'ল্লেন, "আমাকেও কোতয়ালীতে যেতে হ'লো; তোমরা এইখানে থাক; বুড়ি! দেখিস্, হেফাজত ক'রিস্! সদর দরজা বন্দ ক'রে রাখিস্! এখনই আমাকে যেতে হবে; ভারি অনর্থ বেধে উঠেছে! তিন্‌টে খুন্ হ'য়েছে! বোধ করি, গুমী কয়েদীদের স'রিয়ে ফেল্‌বার জন্যে, নীচের সুড়ঙ্গপথে জনকতক লোক ব'সেছিল, সকলেই বড়লোক! তাঁরা এখনও আছেন সুড়ঙ্গের ভিতর; খানাতল্লাসীতে কিন্তু গুমী পাওয়া গেল না। এদিকে তিন্‌টে খুন! সুড়ঙ্গমুখে সহর-কোতয়াল, দুজন প্রহরী রেখে এসেছিল, জান; সুড়ঙ্গের প্রবেশমুখে যখন মানুষের মাথা দেখা দেয়, একজন প্রহরী সেই সময় এক কোপেই তার সেই মাথাটা কেটে ফেলে! পিছনে পিছনে অনেক লোক। ঐ নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখে সরাসর বিন্ বিন্ ক'রে তাঁরা উপরে উঠে প'ড়্‌লেন। প্রহরীদের সঙ্গে দাঙ্গা বেধে গেল; তাঁদেরও দু তিনজন দুটো একটা চোট খেয়েছিল; প্রহরী দুজন রক্তে ডুবে সুড়ঙ্গমুখে প'ড়ে

র'য়েছে! একজনের বুকের উপর ট্যার্চাভাবে তলওয়ারের চোট, দেহটা দুখানা হ'য়ে প'ড়েছে, আর একজনের মুণ্ডুটা উড়ে গেছে! মহা অনর্থ উপস্থিত! আহা! প্রথমে যে লোকটী সুড়ঙ্গের উপর মাথা তুলেছিল, সেটীকে কেটেছে, আমার বড় দুঃখ হ'চ্চে! সে লোক্‌টী আমার বেস চেনা! তার নাম খগেশ্বর। সে একজন লক্ষপতি মহাজনের ছেলে।"

খগেশ্বরের নাম শুনেই ময়ূরমঞ্জরী কেঁদে উঠ্‌লো। থামানো যায় না! ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেম না! রাজপুত্রও পাল্লেন না! তবু তিনি জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, "তুমি অত কাঁদ কেন? তুমি কি খগেশ্বরকে চিন্‌তে?"

ময়ূরমঞ্জরী কথা কৈলে না, কেবল গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো! রাজপুত্র ব'ল্লেন, "আহা! দুঃখ হয় বটে, অতি ভাল মানুষ ছিল! আমি ত জান্‌তেম খগেশ্বর অতি নিরীহ! তাতেই বা সন্দেহ কি? যারা এই সুড়ঙ্গপথে আসে, তারা ত সকলেই বদ্ মতলবে আসে না! খগেশ্বরের হয় ত কোন ভাল মতলবই ছিল। আহা! বেচারা বিনা দোষে কাটা প'ড়েছে! কাঁদ্‌তে ইচ্ছা হয় বটে! তা তুমি চুপ্ কর; যা হবার তা হ'য়ে গেছে! চক্ষের জলে ফিরাতে পারা যাবে না, রাজপুত্র এই কথা ব'লে, নিজের বামহস্তে নিজের অশ্রু মার্জ্জন ক'র্‌লেন।

ময়ূরমঞ্জরী একটু শান্ত হ'লো। বাহিরে শান্ত দেখালে, কিন্তু তার বুকের ভিতর কি যেন গুম্‌রে বেড়াতে লাগ্‌লো; মুখের ভাব দেখে সেটী স্পষ্টই আমি বুঝ্‌তে পার্‌লেম। জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার সময় নয়; রাজপুত্র কোতয়ালীতে যাবেন; ব্যস্ত

হ'য়ে আমাদের ব'ল্লেন, "তোমরা চুপ্ ক'রে এইখানে ব'সে থাক! ভেবো না, কেঁদো না, ভয় ক'রো না, ঘর থেকে বেরিও না; চুপ্ ক'রে বোসে থাক। একজন বন্ধুকে তোমাদের কাছে রেখে যেতেম; কিন্তু হবে না। খুনের কাণ্ড! যারা যারা বাড়ীতে উপস্থিত ছিল, সকলকেই যেতে হবে! তা হোক্, শীঘ্রই আমি ফিরে আস্‌ছি। আমি চ'ল্লেম, দেরী হ'য়ে যাচ্চে। হ'লোই বা দেরী? তাতেই বা আমার কি? আমি ত আর আসামী নই? আমার বাড়ী,—না—না, আমি এখানে আছি, বাড়ীতে খুন হ'য়েছে! যেতে হয়, যাব।"

ব্যগ্রকণ্ঠে আমি জিজ্ঞাসা ক'ল্লেম, "না গেলে কি হয়?"

রাজপুত্র হাস্য কোরে বোল্লেন, কিছুই হয় না। দেশ ত এক রকম অরাজক; কার বা আইন, কার বা আদালত, কার বা তদারক, কার বা কি? সমস্তই ফক্কিকার! কত শত খুন কোরে খুনী আসামী বেঁচে যাচ্চে, স্বচ্ছন্দে সরপোট বেড়িয়ে বেড়াচ্চে, কে তাদের কি বলে? আমি ত এক রকম কাণে শোনা সাক্ষী। খুন হোয়েছে দেখেছি, হোতে দেখিনি। আমি না গেলে, কার সাধ্য কি বলে? কিন্তু যেতে হবে। আমাদের কাজ্ আমরা কোর্‌বো, আমরা সোজা পথে চোল্‌বো, কাঁটা বনে কেন যাব? কেহ জোর কোরে ফুটিয়ে না দিলেও, বনের কাঁটায় আপনা হোতে গা ছোড়ে যায়। তেমন কাজ কেন কোর্‌বো? যেতে হবে, চোল্লেম। থাক তোমরা। বুড়ী দেখিস্! খবরদারী রাখিস্! ময়ূরমঞ্জরি! তুমিও আর কেঁদো না। এখনি আমি আস্‌ছি।"

এই কথা বোলে, সাবধান কোরে কুমার ইন্দুভূষণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন; সুড়ঙ্গপথেই প্রবেশ ক'র্‌লেন; তার পর আবার দল শুদ্ধই উঠে এলেন; সদর দরজা খুলে দল শুদ্ধই চোলে গেলেন। একটু পরে বুড়ী গিয়ে দরজা বন্ধ কোরে এলো। আমরা তিনজনে, সেই ঘরেই বোসে থাক্‌লেম; বুড়ীকে নিয়ে চার্‌ জন।

একবিংশ তরঙ্গ।

আরও গুপ্তকথা প্রকাশ।

চার্‌ জনেই আমরা সেই ঘরটীতে বোসে আছি। চুপ্‌টী কোরে বোসে থাক্‌বার হুমকু, কিন্তু তা কি মানুষে পারে? কতক্ষণ পারে? আমরা চুপ্‌টী কোরে বোসে থাক্‌তে পাল্লেম না। পরের কথাই বা কেন বলি, আমি ত পাল্লেম না। খগেশ্বরের কথা শুনে ময়ূরমঞ্জরী কাঁদ্‌লে কেন, খুনের কথার চেয়ে সেই কথাটাই আমার মনে বড় হ'য়ে উঠ্‌লো। একবার মনে ভাব্‌লেম, খগেশ্বরের সঙ্গে ময়ূরীর হয় ত ভালবাসা ছিল, হয় ত ভালবাসা জন্মেছিল, সেইজন্মেই লেগেছে; আবার ভাল্‌লেম, তাই বা কেমন কোরে হয়, ও রকমের কোন কথাই ত একদিন একবারও মুখে আনে না; বাড়ী থেকে কোথাও

পায়ও না, লক্ষণেও কিছু প্রকাশ পাওয়া যায় না; এ বাড়ীতে সুড়ঙ্গ আছে, তাও সবে নূতন জেনেছে; কি কোরেই বা আর কিছু সন্দেহ হয়? সে রকম ত সম্ভব হয় না! তবে কি? তবে অমন কোরে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদ্‌লে কেন? জিজ্ঞাসা ক'ল্লেম। ময়ূরমঞ্জরী একটু থেমেছিলো, আবার কেঁদে উঠ্‌লো। কুণ্ঠিত হোয়ে, দুই হাতে চক্ষের জল মুছিয়ে দিয়ে, সান্ত্বনাবাক্যে আমি ব'ল্লেম, না ভাই, তুমি কেঁদনা! আর আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌র না! আচ্ছা, বল দেখি, কাক্ পাখিগুলো যখন মাথার উপর উড়ে যায়, তখন আমাদের পায়ের কাছে যে তাদের ছায়া পড়ে, সেই ছায়াগুলো বেশী কালো, কি কাক্‌গুলো বেশী কালো?

দুঃখের উপরেও ভারি মুখে একটু মৃদু হেসে, স্তম্ভিত স্বরে ময়ূরমঞ্জরী ব'ল্লে, "আমার চক্ষে এখন সব কালো, সব যেন আমি ছায়াবাজী দেখ্‌ছি! এ চক্ষে এখন ছায়া গুলোই বেশী কালো!"

অনেক দিন আমি হাসি নাই; ময়ূরমঞ্জরীর ঐ কথাটীতে আমার একটু হাসি এলো! তত শঙ্কটের ভিতর প'ড়ে আছি, সুড়ঙ্গের ভিতর হুল স্থূল; সঙ্গে সঙ্গে কোতয়ালীর হাঙ্গামা, জল জীয়ন্ত তিন তিনটা খুন্! ভরসার মধ্যে কুমার ইন্দুভূষণ, তিনিও চক্ষের কাছে অদর্শন; এত শঙ্কটে প'ড়ে আছি, তবু কেন সে সময় হাসি এসেছিল, আমার মন সে কথা বোল্‌তে পারে, আমি পারি না! মন যেন সেই সময় আমার গলা টিপে বোলে দিলে, হাস্ কুঞ্জবালা, এই বেলা একবার হাস্!

তাই আমি হেসেছিলেম,—আহ্লাদের হাসি নয়, বড় দুঃখের হাসি!

ময়ূরমঞ্জরী বলে কি? ছায়াবাজী দেখ্ছে, অন্ধকার দেখ্ছে! ছায়া কালো দেখ্ছে! বলে কি? আমার যেমন অদৃষ্ট, এমন অদৃষ্ট কি কাহারও আছে? আমি যেমন জন্মাবধি ছায়াবাজী দেখ্ছি, আর কেহ কি এ সংসারে তেমন ছায়াবাজী দেখ্তে পারে? আমার চক্ষে যেমন জগৎ সংসার অন্ধকার, তেমন ঘোর অন্ধকার কি আর কাহারও চক্ষে ঠেকে? ক্ষুণ্ণস্বরে ময়ূরমঞ্জরীকে জিজ্ঞাসা কল্লেম, "আমার চেয়েও কি? আমার চক্ষু যেমন অন্ধকার দেখে, তোমার চক্ষে তার চেয়েও কি বেশী অন্ধকার?"

আমাদের কথায় কাণ ছিল কি না জানি না,—কপোতকুমারী এতক্ষণ বুড়ীর দিকেই সটান চেয়ে ছিল; হঠাৎ আমাদের কথার মাঝ্খানে বাধা দিয়ে যেন কিছু সভয়কণ্ঠে বোলে উঠ্লো, "তোমরা কেবল অন্ধকার অন্ধকার কোরে ছড়া কাটাকাটী ক'চ্চো, বুড়ী যে এদিকে অন্ধকার দেখায়! বুড়ী যে কাঁপ্ছে, বুড়ী যে যায়! বুড়ীর যে জ্ঞান নাই, বুড়ীর যে চক্ষু কপালে উঠ্ছে! মুখে জল দাও! বাঁচাও! হাত ধোরে দেখ দেখি, বুড়ীর বুঝি নাড়ী গেল! আবার বুঝি খুন্ দায়! খুনের উপর খুন! চার্দিকে কোতোয়াল! চার্দিকে মকদ্দমা! সাক্ষী দেবে কে?"

সচকিতে আমরা বুড়ীর দিকে চাইলেম। বুড়ী কাঁপ্ছে; সত্যই বুড়ী কাঁপ্ছে; দাঁতে দাঁত লেগে গেছে; কিন্তু বোসে

আছে! গা ঠেলে দেখি, নড়ে না! বোসে বোসেই মরে না কি? কেনই বা মরে? বুড়ী বুড়ী কোরে চীৎকার কোরে কতবার ডাক্‌লেম; কেই বা শোনে! বুড়ী অজ্ঞান্! শুয়িয়ে দিলেম, মুখে চোকে জলের ছিটে দিলেম, সাড়া নেই! প্রাণের লক্ষণ স্বধুই কেবল অনেকক্ষণ অন্তর এক এক নিশ্বাস! বুড়ীকে নিয়ে আমরা মহা আথান্তরে প'ড়্‌লেম।

উষাকাল উপস্থিত। রাত্রি ফর্সা হ'য়ে এসেছে। ঘরের ভিতর ঠাণ্ডা হাওয়া আস্‌ছে। দূরে দূরে প্রভাতি পাখীরা নানা স্বরে গান ক'চ্চে। এমন স্বখের সময় বুড়ীর অন্তকাল উপস্থিত! তিনটী ছোট ছোট মেয়ে মানুষ আমরা; এমন মরণ-বিপদে, কেমন কোরে বোসে থাক্‌ব! শশব্যস্ত! তত গুলো ভয়ের সঙ্গে আবার এই একটা ভয়। মহা আথান্তরে প'ড়্‌লেম।

অকস্মাৎ সদর দরজায় তিনবার আঘাত! আবার বুঝি কোন নূতন বিপদ! আবার আঘাত!! কণ্ঠস্বর নাই, আবার তিনবার! নিতান্ত জোর আঘাত নয়, মন্দ লোক না হোতে পারে, দেখ্‌তে হবে। কেই বা দরজা খুলে দিতে যায়? সখীদের পাঠাব না, ওরা ভয় পাবে। আমিই যাব। যদি বিপদ্ হয়? বিপদ্ আমার জ্ঞাতি-কুটুম্বের মধ্যেই হয়েছে! বিপদ্ আমার গা সওয়া, গায়ের আবরণ, বিপদকে আমি ভয় করি না। যদি বিপদ্ হয়, আমার উপর দিয়েই যাবে, সখীদের পাঠাব না, নিজেই যাব।

মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা ক'ল্লেম। সখী দুটীকে বুড়ীর কাছে

বোসিয়ে রেখে ভয়কে আর সাহসকে সহচর কোরে আমি দরজা খুল্‌তে চ'ল্লেম। নীচে নাম্‌লেম, পলকমাত্র এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু ভাব্‌লেম, আবার জোরে জোরে তিনবার আঘাত! বুকখানি একটু কাঁপ্‌ল, কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে দরজার কাছে গেলেম! ঊষা হ'য়েছে, দুষ্টলোক হবে না; বুড়ীর আঁচল থেকে চাবি খুলে এনেছিলেম, কম্পিতহস্তে ধীরে ধীরে বৃহৎ কুলুপের চাবিটা খুল্লেম, কপাট উদ্ঘাটিত হোলো; সম্মুখে রাজকুমার ইন্দুভূষণ!

সাহসে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ! রাজকুমারের বদন গম্ভীরের সঙ্গে প্রসন্ন। মন যেন আমার নিশ্চয় বোলে দিলে, সুলক্ষণ। প্রভাতে দরজা বন্ধ ক'র্‌বার দরকার ছিল না, রাজপুত্র তবুও সেই বৃহৎ কুলুপের চাবি লাগিয়ে দিলেন। আমি অম্‌নি তাড়াতাড়ী বল্লেম, "বুড়ী মরে!"

বিস্মিত হয়ে রাজপুত্র ব'ল্লেন, "সে কি! মরে? তার মুখে যে এখনও অনেক কথা আমার শোন্‌বার আছে! চল—চল, শীঘ্র চল।"

"শীঘ্র চোল্লেই বা কি হবে? বুড়ীর বাক্‌রোধ হ'য়ে গেছে!" এই কটী কথা আমি ব'ল্‌ছিলেম; মুখের কথা মুখে কোরেই দ্রুত অগ্রগামী রাজপুত্রের অনুগামিনী হ'লেম; ঘরটা তখন রোগীর ঘর; রাজপুত্রের সঙ্গে আমি রোগীর ঘরে উপস্থিত হলেম। বুড়ীর তখনও একই অবস্থা, বরং আরও বেয়াড়া! রাজপুত্র গিয়ে বুড়ীর মুখের কাছে হাঁটু গেড়ে ব'স্‌লেন; বুড়ী, বুড়ী, কোরে অনেকবার ডাক্‌লেন! আর বুড়ী! বুড়ী

আছে এই মাত্র; একটী একটী নিশ্বাস আছে; দেহ কিন্তু শক্ত কাঠ; মুখ, চক্ষু নীলবর্ণ হয়ে গেছে।

গতিক দেখে রাজপুত্র একটু তফাতে স'রে বস্‌লেন, থেমে থেমে দুটী নিশ্বাস ফেল্‌লেন। তেমন সতেজ প্রফুল্ল মুখখানি একটু ম্লান হ'য়ে গেল! ম্লাননয়নে আমার মুখের দিকে চেয়ে, ধীরে ধীরে তিনি ব'ল্লেন, "সত্যই ত বুড়ী বাঁচ্‌লো না! হ'য়েছিল কি? এমন হ'য়ে গেল কেন? নীলবর্ণ হ'লো কেন? ততক্ষণ ত বেস্ ছিল? হঠাৎ এমনটা হবার কারণ কি? মুখ দিয়ে গাজা ভাঙ্‌চে, ঘর থেকে বেরিয়েছিল কি?"

"একবার বেরিয়েছিল।" আমি তাড়াতাড়ি ব'ল্লেম; "একবার বেরিয়ে গিয়েছিল; আপনারা বেরিয়ে যাবার পর দরজা বন্ধ ক'র্‌তে গিয়েছিল।"

গম্ভীরবদনে একটু চিন্তা কোরে সন্দিগ্ধকণ্ঠে রাজপুত্র ব'ল্লেন, "তবেই ঠিক্! বিষ খেয়েছে!"

সচঞ্চলে সখী দুটী শিউরে উঠ্‌লো! আমিও চোম্‌কে উঠ্‌লেম! সবিস্ময়ে ব'ল্লেম, "বিষ খাবে কেন? এতক্ষণ খায় নাই, এখন খেলে কেন?"

রাজপুত্র ব'ল্লেন, "কতক কতক আমি সেটা বুঝ্‌তে পাচ্চি। বুড়ীর পেটে অনেক কথা চাপা ছিল। গোটাকতক আমার কাছে বোলেছে, আরও সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা বাকীই ছিল, সেগুলো ব'ল্‌বে না,—ব'ল্‌তে পার্‌বে না, দায়ে পোড়ে পাছে ব'ল্‌তে হয়, সেই ভয়েই বিষ খেয়েছে। দুখী মানুষ কি না? আমি এত আশ্বাস দিলেম, এত অভয় দিলেম, কিছুতেই বিশ্বাস

ক'র্‌তে পার্‌লে না। শেষ কথাগুলো প্রকাশ ক'র্‌লে পাছে আইনের হাতে বাঁধা পড়ে, বুড়ো বয়েসে পাছে ফাঁসী গাছে ঘুর্‌তে হয়, তার চেয়ে আপ্‌নি মরা ভাল, এই ভেবেই বিষ খেয়েছে! বিষ হয় ত সঙ্গেই ছিল, দরজা বন্ধ কর্‌বার সুবিধা পেয়ে, সেইখানেই ঐ কাজ ক'রেছে। বাড়ীখানা নবরঙ্গের বাড়ী কি না? এর ভিতর অনেক কীর্ত্তি হ'য়ে গেছে; সুড়ঙ্গের ভিতর অনেক মাথা গড়াগড়ি গেছে, দু এক বৎসরের ভিতর পাঁচ সাতটা খুন হ'য়েছে! সকল কর্ম্মেই বুড়ী ছিল! পাছে ষট্‌চক্রে ধরা পড়ে, সেই ভয়েই বুড়ী আগে ভাগে পৃথিবী থেকে পালালো।"

আর বুড়ীর নিশ্বাস পড়ে না! বুড়ীর প্রাণপক্ষী উড়ে গেল! আমার সখীদুটীর চক্ষে ফোঁটা ফোঁটা জল পোড়্‌লো! আমার চক্ষুও শুষ্ক থাক্‌লো না! রাজপুত্র ব'ল্লেন, "বুড়ীর দেহটা আমি কোতয়ালীতেই পাঠিয়ে দিব। সুড়ঙ্গের হত্যাকাণ্ডের দেহ তিনটী রাতারাতিই পার করা হোয়েছে, আবার এই আত্মহত্যার দেহটাও সেইখানে যাক্! খুনোখুনীর ঝঞ্ঝটের ভিতর আর আমি থাক্‌তে চাই না!"

সংবাদ দিতে কে যায়? রাজপুত্র নিজেই আবার কোতয়ালীতে গেলেন। সেখান থেকে লোকজন এনে, বুড়ীর দেহটা বিদায় কোরে দিলেন। তখন আর অন্য কথাবার্ত্তা কিছুই হোলো না; বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত অন্যান্য কাজেই কেটে গেল; দুই প্রহরের পর আমাদের তিনজনকে নিয়ে রাজপুত্র আবার গল্প কোর্‌তে বোস্‌লেন। বাড়ীর

ভিতরে যে ঘরে রত্নবতী থাক্‌তেন, সেই ঘরেই বৈঠক হোলো।

"ভয়ানক কাণ্ড!" গম্ভীরবদনে রাজপুত্র বোল্লেন, "ভয়ানক কাণ্ড! যে দেশে মানুষ আছে, যে দেশে সমাজ আছে, যে দেশে রাজা আছে, সে দেশে এমন কাণ্ড হোতে পারে, সহজে ত বিশ্বাস করা যায় না। উঃ! কথাগুলো শুনে অবধি, চতুর্দ্দিকে আমি যেন ইন্দ্রজাল দেখ্‌ছি!"

এই পর্য্যন্ত বোলেই রাজপুত্র একটু থামলেন। ক্ষণকাল কি চিন্তা কোরে তৎক্ষণাৎ আবার হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লেন, "বুড়ী ত গেল, বুড়ীর কাছে অনেক কথা আমার শোন্‌বার ছিল। বুড়ী ত গেল!—গেল ত গেল;—অনেক কথা আমি জেনে এসেছি; গোপনে গোপনে জানাও অনেক ছিল, তার উপর আরও অনেক জেনে এসেছি। ঘর্ঘর ঘর্ঘর জাঁতার পেষণে রত্নবতী নিজেই অনেক কথা প্রকাশ কোরে ফেলেছে। বুড়ীর পেটে যত ছিল, রত্নবতীর পেটে তার চেয়ে অনেক বেশী আছে। বুড়ীটা অনর্থক বিষ খেয়ে প্রাণ হারালে, সেইজন্যে দুঃখ হয়, নতুবা কাজের কথা রত্নবতীর কাছে আমি অনেক পাব। রত্নবতী মানবী! উঃ! মানবীর চর্ম্মাবরণে ডাকিনী! সুড়ঙ্গের ভিতর রত্নবতী সব নবরঙ্গের মানুষ চেলে আন্‌তো, চোর ডাকাতেরা গাঁতের মাল বস্তাবন্দী কোরে সুড়ঙ্গের ভিতর রত্নবতীর জিম্মায় রাখ্‌তো; খেলওয়াড়েরা রত্নবতীকে জামিন দিয়ে, ভারি ভারি জোয়া খেলায়, গো বেচারা নূতন বড় মানুষের ছেলেদের সর্ব্বনাশ কোর্‌তো; ষড়যন্ত্র করে, অঘটন

ঘটিয়ে বড় লোকের মেয়ে চুরী কোরে ছোট লোকের সঙ্গে বিয়ে দিত; ছোট লোকের মেয়ে ধোরে এনে, বড় লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে, রাশি রাশি টাকা নিত; বড় ঘরের জাত মার্তো; ধনী লোকের গচ্ছিৎ টাকা অপহরণ কোরে, নাকের জলে চোখের জলে ভাসিয়ে পথ-ভিখারী কোরে ছেড়ে দিত; সাম্লাতে না পার্লে, খুন কোরে ফেল্তো! প্রয়াগধামে স্বামী-কেই খুন ক'রেছে! নৌকায় গুণ্ডা ভেজিয়ে কাশীর উপ-স্বামীকে জলে ডুবিয়ে মেরেছে,—তার আর অসাধ্য কর্ম্ম কি? যে লোকগুলি মুরুব্বি হোয়েছিল, যে লোকগুলি সহায় হোয়েছিল, যে লোকগুলি জুড়িদার মিলেছিল, সেগুলিও সব এক একটী ধনুর্দ্ধর! জনকতক আজ্ ধরা পোড়েছে। তারাও সব কোতয়ালিতে গহনা পোরে ব'সে আছে। আমাকে তারা ফরিয়াদীর দলে দেখে, হাড়ে হাড়ে চোম্কে গেছে! আমিও মাঝে মাঝে স্নুড়ঙ্গ পথে আস্তেম, আমার মত আরও কতক-গুলি বন্ধুলোক, কৌশল কোরে দলে মিশ্তে আস্তেন। রত্ন-বতীর চক্র আমাদের সব বন্ধু বোলেই জান্ত। রত্নবতী নিজেও তত ধড়ীবাজ মেয়ে হ'য়ে আমাদের তাই ভাব্তো। আমি রত্নবতীকে মাসীমা বোলে ডাক্তেম। বুঝ্লে কুঞ্জবালা! বুড়ীর মুখে শুনেছিলে রত্নবতী আমার মাসীমা! কথাটী বড় মিথ্যা নয়। সত্যই আমি মাসীমা বোলে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতেম। তোমাকে যে আমি এ বাড়ীতে রাখ্বার জন্যে পাঠায়েছিলেম, তার অনেক কারণ ছিল। নিজে রেখে যাই নাই, কি রকমে তুমি এসেছ যেগিনীই তা জানেন; কিন্তু সেটাও আমারই মত-

লব। রত্নবতী ব্যবসাদার মেয়ে মানুষ কি না? রত্নবতী জেনে-ছিল, আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, সোমরাজ তোমাকে বিয়ে কত্তে চেয়েছিল, সোমরাজকে ফাঁকি দেবে, সেই মতলবেই তোমাকে তত আদর যত্ন করেছিল। ঐ রকম তার অভ্যাস, ঐ রকম তার শিক্ষা, ঐ রকম তার বুজ্‌রুকী, ঐ রকম তার ব্যবসা। পেটের ভিতর হারামের ছুরী! আর একটী ভদ্র-লোকের মেয়েকে, সেই দেশ বিখ্যাত জুয়াচোর সোমরাজের ফন্দীজালে জড়িয়ে দিবার মতলবে, চুরী কোরে বিয়ে দিতে এনে, ছিল। সে বিয়ে তুমি দেখেছ; রত্নবতীর ঘটকালীতে স্মুড়ঙ্গের ভিতর আর যে কটা বিয়ে হ'য়ে গেছে, যে সকল বিয়ের কথা একটু আগে আমি তোমাকে ব'লেছি, সে সকল বিয়ে যে কি রকম বিয়ে, তা হয় ত তুমি বুঝেছ! জুয়াচুরী বুদ্ধিতে সোমরাজ তোমাকে বিয়ে কর্‌বার জন্যে বিস্তর পীড়াপীড়ি ক'রেছিল। চেষ্টার ক্রুটী হবেনা বোলে, রত্নবতীও তাকে আশ্বাস দিয়েছিল; অনেক টাকা নিয়েছিল; শেষকালে সাম্‌লাতে পার্‌লে না। সোমরাজের এখন স্মুর ফিরেছে, সোমরাজ বলে তোমাকে নয়,—শেষরাত্রে কোতয়ালিতে আমাকেই ব'লেছে, 'তোমাকে নয়, ঠিক্ তোমার মত আর একটী।' সোমরাজ বলে,—এখন বলে, 'তার নাম কুঞ্জবালা নয়, তার নাম সরসীবালা।'

হঠাৎ সেই গল্পের কথা আমার মনে প'ড়্‌লো। গল্প কি তবে সত্য? জয়মঙ্গলা বলেছে আমি রাজার মেয়ে; এই বাড়ীতে প্রথম দিন বুড়ী আমায় ব'লেছিল আমি রাজার মেয়ে; পূর্ণিমার রাত্রে যোগিনী-সাক্ষাৎ স্বপ্নেও আমি শুনেছি আমি রাজার

মেয়ে; তিন কথাই এক। স্বপ্নে আরও আমি অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শুনেছি। একটী যদি সত্য হয় সবগুলিই ত তবে সত্য হ'তে পারে? যোগিনী আমাকে স্বপ্নে ব'লেছিলেন, আমার এক সহোদরা ভগ্নি আছে, তার নাম সরসীবালা; রাজপুত্র ব'লেছে কোতয়ালীতে সোমরাজও ব'লেছে সে মেয়েটীর নাম সরসীবালা। কি আশ্চর্য্য! তবে কি সেটা স্বপ্ন নয়? আমি কি তবে তখন ঘুমাই নাই? তত রাত্রি পর্য্যন্ত সত্যই কি আমি জেগেছিলেম? সত্যই কি আমার বিছানার কাছে যোগিনী এসেছিলেন? আশ্চর্য্যই বা কি? অসম্ভবই বা কি? যোগিনী তিনি! কামচারিণী তিনি! যখন যেখানে মনে করেন, তখন সেইখানেই তিনি প্রবেশ ক'র্‌তে পারেন! সত্যই তবে এসেছিলেন! তা না হ'লে, স্বপ্নের কথার সঙ্গে জীয়ন্ত মানুষের কথা কেমন ক'রে মিল্‌ছে? আরও একটা কথা! স্বপ্নে রাত্রে শুনেছি, যোগিনী যেন ব'লেছেন, জয়মঙ্গলা, জয়লক্ষ্মী আর জয়তারা, এরা তিনজন যেমন তার ব্রতদাসী, বিষ্ণুপ্রিয়া আর বিমলা নামে তার সেই রকম আর দুটী ব্রতদাসী আছে। হ্যাঁ! বিষ্ণুপ্রিয়া আর বিমলা! আগ্‌রায় যখন আমি ডাকাতের আড্‌ডায় কয়েদ, বিষ্ণুপ্রিয়া আর বিমলা নামে দুটী আশা-সখী, তখন আমার উদ্ধারের পথে মূর্ত্তিমতী হ'য়েছিল! স্বপ্ন যেন ব'ল্‌ছে, সেটাও ঐ যোগিনীর উপদেশে! যোগিনী তবে আমার অজ্ঞাতে অনেক দিন থেকেই, দুঃখিনী বোলে আমাকে রক্ষা কোরে নিয়ে বেড়াচ্চেন! তবে সেটা কখনই স্বপ্ন নয়! এই চিন্তায় তখন আমি এতদূর বিহ্বল

হ'য়ে উঠ্‌লেম,—রাজপুত্র নিকটে বোসে আছেন, সখীরা আছে, মনেই থাকলো না; ক্ষণকালের জন্য সেটা যেন আমি ভুলেই গেলেম।

সবিস্ময়ে রাজপুত্র জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "কি কুঞ্জবালা! সরসীবালার নাম শুনেই যে তোমার বাক্য রোধ হ'য়ে গেল, চিন্তে পাচ্চো কি? মনে ক'ত্তে পাচ্চো কি? তোমার কি সহোদরা ভগ্নী আছে? সরসীবালা নামে কোন সুন্দরী কুমারীকে কি তুমি চেনো?"

কি উত্তর করি? দুই বৎসরের বয়স থেকেই ত আমি একাকিনী! যাঁদের কাছে প্রতিপালিত হ'য়েছি, তাঁরাই ত আমাকে একাই জানেন! ওরকমের কোন কথাই ত আমি তাদের কাহারও মুখে শুনি নাই! এই বাড়ীতে এসে, এই মাসের পূর্ণিমার রাত্রে, স্বপ্নে পেয়েছি ঐ কথা! কি উত্তর করি? স্বপ্নের কথা প্রকাশ করা হবে না। একে একে সত্য সত্য সব যখন ফ'ল্‌বে,—যদি ফলবার হয়, সবগুলিই ফ'ল্‌তে পারে, তেমন দিন যদি ঘটে, তখন কুঞ্জবালার রসনা স্বপ্নের চাবি খুলবে। মনে মনে এইটী স্থির কোরে, সংক্ষেপে রাজপুত্রের প্রশ্নে এইমাত্র উত্তর ক'ল্লেম, "চিনিনা; কেহ আমাকে বলে নাই।" রাজপুত্র ব'ল্লেন, "কেন? মনে ক'ত্তে পার না? বুড়ী ত এক রকম ব'লেই গ্যাছে! প্রথম দিন তোমাকেই সেই মেয়েটী মনে ক'রেছিল, তার পর তুমি হ'য়ে গেলে কুঞ্জবালা! এতে তোমার কি মনে হয়? আছে না? ঠিক্ তোমার মত আর একটী মেয়ে এ অঞ্চলে আছে না?"

আমি বিমর্ষবদনে ব'ল্লেম, আমি সে কথা কেমন ক'রে ব'ল্‌বো?—বিমর্ষবদনে ব'ল্লেম বটে, কিন্তু তখনই আমার বুকের ভিতর কেমন একটা অন্ধকার জায়গা আলো হ'য়ে উঠ্‌লো! একটু লজ্জায় লজ্জায়, একটু সন্দেহে সন্দেহে, একটু একটু বাদো বাদো ক'রে, ধীরি ধীরি রাজপুত্রকে আমি ব'ল্লেম,—"বল্‌বার আগে সখী দুটীর প্রতি চক্ষু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দু তিনবার চাইলেম, তাদের মুখ দেখে আমার ব'ল্‌বার বাধা হ'লো না; চট্‌পট কোরে রাজপুত্রকে আমি ব'ল্লেম, রাজকুমার! অবলা ব'লে আপনি আমায় মাপ ক'র্‌বেন, আমি আপনাকে একটী প্রশ্ন দিব!"

হাস্‌তে হাস্‌তে রাজপুত্র ব'ল্লেন, তোমার মুখে প্রশ্ন শুন্‌তে বড়ই মিষ্ট লাগ্‌বে! বল দেখি কি প্রশ্ন—বল দেখি তোমার প্রশ্নটী কি?"

আমি একটু ভাব্‌লেম। বলি বলি, মুখে এসেছিল, একটু থাম্‌তে হ'লো; নামটী আমি রাজপুত্রের কাছে ব'ল্‌তে পার্‌বো না। একটু ভাব্‌লেম, তখনি বুদ্ধি যোগালো; আবার সখীদের দিকে চেয়ে রাজপুত্রকে আমি ব'ল্লেম, "আপনার যদি ঐ রকম হয়? আমি ত জানি না, চিনি না, দেখি না, এতদিন শুনিও নাই, আছে কি না আছে, আমি কেমন ক'রে জান্‌বো? আপনার যদি ঐ রকম হয়?"

"কি রকম?"

"ঐ আপনার আর একটী! ঠিক্ যদি আপনার সঙ্গে রূপে রূপে মিলে যায়?"

হাস্‌তে হাস্‌তে রাজপুত্র জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "কে সে? কার সঙ্গে?"

আমিও অম্‌নি মুখ নীচু ক'রে, টিপি টিপি হেসে, ধীরে ধীরে উত্তর ক'র্‌লেম, "জয়মঙ্গলার দাদা!"

অকস্মাৎ রাজপুত্রের বদন গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লো! সহসা ময়ূরমঞ্জরীর দিকে ফিরে, আমার মুখপানে চেয়ে, একটু যেন বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে থেমে থেমে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "আচ্ছা, ময়ূর! বুড়ীটা বিষ খেয়ে মোলো, তুমি তত কাঁদ্‌লে কেন? বুড়ীর সঙ্গে তোমার কি বড়ই ভালবাসা হ'য়েছিল?"

আবার ময়ূরমঞ্জরীর চক্ষে জল এলো! অঞ্চলে নেত্র মার্জ্জন ক'রে, বিশাল একটী নিশ্বাস ফেলে, রুদ্ধকণ্ঠে গুম্‌রে গুম্‌রে ব'ল্লে, অনেক কথার কথা! সে সব দুঃখের বার্ত্তা আপনি আর কেন উষ্‌কে দেন? শুধু কেবল বুড়ীর জন্যে আমার——"

ময়ূরমঞ্জরীর বুক হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌লো! আমি দেখ্‌তে পেলেম; রাজপুত্র অন্যদিকে চেয়ে ছিলেন, বেশী দুঃখের ভাবটা দেখ্‌তে পেলেন না; গম্ভীরভাবেই বোলে উঠ্‌লেন, "হাঁ হাঁ, শুধু কেবল বুড়ীর জন্যেই না? সেই খগেশ্বরের নাম শুনেও তুমি কেঁদে অস্থির হ'য়েছিলে! সেটারই বা ভাব কি?"

ময়ূরমঞ্জরী আর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লে, কোন কথারই উত্তর দিলে না। আমি মনে ক'ল্লেম, কথাটা হয় ত কোন কাজেরই নয়। আমি রাজপুত্রকে যে কথাটা জিজ্ঞাসা ক'রেছি,

কথাটা বোধ হয় কিছু শক্ত হোয়েছে, সেই কথাটা চাপা দিবার জন্যই, রাজপুত্র এই বাজে কথাটা তুলেছেন। মিছামিছি বেচারা ময়ূরমঞ্জরীকে কষ্ট দেওয়া কেন? শুনে যদি দুঃখ পায়, নাম শুনে যদি কাঁদে, তবে ঘেঁটিয়ে ঘেঁটিয়ে সে কথা তোল্‌বার দর্‌কার কি? রাজপুত্রকে বারণ ক'র্‌ব মনে ক'র্‌ছি, মাথার উপর হঠাৎ একটা টিক্‌টিকি ডেকে উঠ্‌লো; "টিক্—টিক্—টিক্!"

আবার এ কি! অকস্মাৎ সহরকোতয়াল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত! পশ্চাতে প্রহরী-বেষ্টিত শৃঙ্খল-বদ্ধ ভীমরাজ আর রত্নবতী! সোমরাজ নাই!

দ্বাবিংশ তরঙ্গ।

পাষাণ প্রতিমা।

গত তরঙ্গের কথোপকথনে আমাদের অনেক সময় লেগেছে; বোসেছিলেম বেলা দুই প্রহরের সময়, যখন কোতয়াল এলো, তখন বেলা তিন প্রহর। কোতয়াল এসে সসম্ভ্রমে রাজ পুত্রকে অভিবাদন কোল্লে, মাথা নীচু কোরে সঙ্কুচিত চক্ষে দুই হাতে আমাকেও সেলাম দিলে। আমি আর সে ঘরে বোসে থাকতে পার্‌লেম না; বক্র দৃষ্টিতে রাজপুত্রকে ইঙ্গিত কোরে, সখী দুটীর

হাত ধোরে, সচঞ্চলে সলজ্জভাবে আমি উত্তর ধারের পাশের ঘরে ঢোলে গেলেম; দরজা ভেজিয়ে ঠিক আগেকার মত তিনটীতে এক সঙ্গে চক্ষু বাহির কোরে কাহিনী শুনতে বোস্‌লেম।

কোতয়ালের প্রথম সংবাদ গুমী বাহির হোয়েছে; দুটী-কেই পাওয়া গেছে; একটীর নাম অরুন্ধতী, একটীর নাম সরসীবালা।

ত্বরিতগতি দাঁড়িয়ে উঠে, ব্যগ্রকণ্ঠে রাজপুত্র জিজ্ঞাসা কোর্‌লেন, "কোথায় পাওয়া গেল?"

নম্রস্বরে কোতয়াল বোল্‌লে, "বোসুন আপনি! এখানে তারা আসে নাই; সে দুটী স্ত্রীলোককে আমরা চক্ষেও দেখি নাই! বোসুন আপনি; ব'লছি আমি সব কথা। পাওয়া গিয়েছে।"

রাজপুত্র বোস্‌লেন। কোতয়াল বোল্‌তে লাগ্‌ল,—"একটীর নাম অরুন্ধতী, একটীর নাম সরসীবালা; অরুন্ধতীর যন্ত্রণার মূল হোচ্চে এই হারামজাদ ভীমরাজ, আর সরসীবালাকে কয়েদ করবার মূল হোচ্চে সোমরাজ। উঃ! এদের দুজনের নিজের নিজের মুখ দিয়ে যত সব ভয়ানক ভয়ানক কথা বাহির হয়েছে, আমি যদি দেশের রাজা হোতেম, তথনই টক্‌ টক্‌ কোরে এই দুটো খুনে ডাকাত রাক্ষসের মাথা কেটে ফেল্‌তেম! কুচক্রেরও বাকী নাই, পাপেরও আর বাকী নাই! এই মাড়ওয়ারী ফেরি-ওয়ালা ভয়ানক জুয়াচুরীর টাকায় বিদেশের রাজা সেজে জুয়া-চুরী করে! দেশ এক রকম অরাজক! ধরা পড়ে না, কাজেই

আরও বুক বেড়ে যায়। কথা গুলো শুনে কোতয়ালী শুদ্ধ সমস্ত,লোক,—এই উপলক্ষে অনেক ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত হয়েছেন কি না? কথা গুলো শুনে সমস্ত ভদ্রলোক কেঁপে উঠ্‌লো! কেহ কেহ বোল্‌ছেন, ডালকোত্তা দিয়ে খাওয়াও, কেহ কেহ বোল্‌ছেন শূলে চড়াও, কেহ কেহ বোল্‌ছেন, গর্ত্ত-খুঁড়ে গলাপর্য্যন্ত পুঁতে রাখ, কেহ কেহ বোলেছেন, পায়ের আঙ্গুল থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত ভোঁতা তলোয়ার দিয়ে খণ্ড খণ্ড কোরে কেটে পাইখানায় ফেলে দাও। এতো পাপের বিকট মূর্ত্তি এরা দুজন!"

ব্যগ্রভাবে রাজপুত্র বোল্‌লেন, "তাত হবেই! তাত বটেই! কিন্তু গুমী দুটী কেমন কোরে পাওয়া গেল?"

সহর কোতয়াল বোল্‌লে, "যা আপনি অনুমান ক'রেছিলেন ঠিক তাই। সাধু লোকের যেমন বন্ধু আছে, বদ লোকেরও তেম্নি অনেক বন্ধুর দল আছে। পাপ-কার্যে সোমরাজের বন্ধু অনেক। সুড়ঙ্গ মুখে পাহারা রেখে আসামী নিয়ে যখন আমরা উপরে এলেম, কিরকমে সংবাদ পেয়ে, সোমরাজের বন্ধুর দল সেই সময় সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ কোরেছিল; গুমী খালাস কোত্তে এসেছিল। সোমরাজের আর সব অপরাধ সাক্ষীর মুখে, চিঠির মুখে প্রমাণ হবে; কিন্তু গুম করা অপ-রাধটা—গুমী হাজির কোত্তে পার্‌লে বড় ভয়ানক হোয়ে উঠ্‌বে! হাতে-নোতে ধরা যা'ক বলে, বিচারের চক্ষের উপর ঠিক্ তাই হবে! দায়ী মদ্দায়ী এক জায়গায় দাঁড়াবে! যাতে সেটা না হোতে পায়, গুমী দুটো গরহাজির থাকে, আসামীর

বন্ধুর দল সেই চেষ্টায় স্থড়ঙ্গপথে এসেছিল। আমাদের পাহারা ছিল, হাঙ্গামা বাধ্‌লো; সে দলের একটা লোক কাটা পোড়্‌লো; তারাও আমাদের লোক দুটীকে কেটে ফেল্‌লে; স্থড়ঙ্গ খোলসা হলো; কোথায় থাকে জান্‌ত, গুমী দুটোকে বাহির কোরে নিয়ে গেল। সেই জন্যই, খানা-তল্লাসির সময় আমরা দেখ্‌লেম, গুমী পাওয়া গেল না। এত বড় ফৌজদারী হাঙ্গামা, কানে-কানে মুখে-মুখে সহরময় টি টি হোয়ে গেছে, গুমী নিয়ে রাখে কোথা? দলের মধ্যে একজনের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েই রাখ্‌লে। দৈবের কর্ম্ম! পোড়বি ত পড় ফরীয়াদীর দলেই পড়! বাতাস ফিরে দাঁড়ালো; যে লোকটীর বাড়ীতে গুমী দুটী থাক্‌তো, সে লোকটী দলের মত স্থড়ঙ্গ-চর ছিলেন বটে, দলের লোকেরা তাঁকে সেই রকম ভাবুতো বটে, কিন্তু——”

শুন্‌তে শুন্‌তে হেসে উঠে, কোতয়ালের কথার মাঝ্‌খানে বাধা দিয়ে, রাজপুত্র ব'ল্লেন, “তা ত ভাব্‌তেই হবে; আগে আগে আমাকেও তারা সেই দলের ভাব্‌তো। হাঁ, তার পর কি হ'লো ব'লে যাও।”

বিস্ময় মেনে কোতয়াল ব'ল্লে, “আপনাকেও তারা চিন্‌তে পারে নি? বোকা জুয়াচোর! এইবার ঘুঘুর বাসায় আগুন লেগেছে! বোকা চতুর সব এক দড়ীতে বাঁধ্‌বো! হাঁ, বোল্‌ছিলেম, যে লোকটীর বাড়ীতে গুমী দুটী থাক্‌লো, দলের লোক হ'লেও, তিনি গুপ্ত মতলবের লোক, দলের লোকেরা সে মতলব জান্‌তো না। গুমী দুটীকে হাতে পেয়ে, তিনি তখনই

তখনই কোতয়ালীতে সংবাদ দিলেন না। নিজের মনের মত গুটীকতক বন্ধুকে বাড়ীতে ডেকে, অনেক তর্ক-বিতর্কে পরামর্শ ক'রে, আমি এখানে আসবার একটু আগে, তিনি স্বয়ং কোতয়ালীতে এসেই,'ঐ গুহ্য সংবাদটী জানালেন।"

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, "দুজন আসামীকে এখানে এনেছ কেন?"

কোতয়াল উত্তর ক'ল্লে, "কুমার ভৈরবীপ্রসাদের অনুরোধ; তিনি ব'ল্লেন, এই রাজাটীর, আর এই রাণীটীর মরণকাল নিকট, সুড়ঙ্গের মন্দিরে ইহাঁদের সিদ্ধিদায়িনী দেবী আছেন; এঁরা সেই পাষাণময়ী দেবীকে বড়ই ভক্তি ক'রে থাকেন। এঁরা বলেন, 'দেবীর প্রসাদে অসাধ্য সাধন হয়,'—হ'চ্ছিলও তাই; মরণকালে এঁরা একবার সেই দেবীদর্শন কোর্‌বেন।"

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "কেবল অনুরোধ? যাঁরা দর্শন ক'র্‌বেন, তাঁদের ইচ্ছা নাই?"

কোতোয়াল উত্তর ক'র্‌লে, "সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে। অনুরোধের আগেই, রাণী রত্নবতী আমার কাছে ঐ জন্য একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছিলেন।"

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "সোমরাজকে আন্‌লে না কেন? সোমরাজের কি দেবী দর্শনের ইচ্ছা নাই?"

কোতয়াল উত্তর ক'ল্লে, "সোমরাজের এখনও দেরী আছে। কথায় বলে, 'বিশ্বকর্ম্মার ব্যাটা বেয়াল্লিশ কর্ম্মা।' তার বুকে এখনও অনেক জাঁতা ঘুরাতে হবে, তার গলায় এখনও অনেক বাঁশ ডোলতে হবে, তার গায়ে এখনও অনেক গুল্ বসাতে

হবে; ভারি ভারি কথা একটাও ভাঙ্‌চে না! এঁরা দুটী আমার লক্ষ্মী আসামী! বার কতক জাঁতার সঙ্গে আলাপ ক'রেই, মন খুলে, আগাগোড়া সব কথা প্রকাশ ক'রে, পাপে পাপে ফুলো পেট খালি ক'রেছে! সোমরাজের এখনও অনেক দেরী।"

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, "ভীমরাজের পেটখালি ক'রে, দরকারী কথা তুমি কি পেয়েছ?"

"অরুন্ধতীর কথা পেয়েছি।"—কোতয়াল উত্তর ক'র্‌লে, "অরুন্ধতীর কথা পেয়েছি। অরুন্ধতী একটী রাণী; অরুন্ধতী বিধবা, অরুন্ধতী রূপবতী, একটীমাত্র কন্যা প্রসব ক'রে, অরুন্ধতী বিধবা হ'য়েছেন; ভীমরাজ দস্তুরমত রাজা পরিচয় দিয়ে, অরুন্ধতীর ধর্ম্ম নষ্ট ক'র্‌বার চেষ্টা করে; অরুন্ধতী সাধ্বী-সতী; বারম্বার ভীমরাজের সে দুশ্চেষ্টা বিফল হয়। জোর-জবরদস্তী, অর্থ-লোভ, জাল মকর্দ্দমা, অরুন্ধতী সমস্ত বিপদ্-জাল থেকে ধর্ম্মের জোরে পরিত্রাণ পান্; শেষকালে প্রাণে মার্‌বার পরামর্শ হয়! রত্নবতী আগেকার কথা জান্‌তেন না; অরুন্ধতীর সঙ্গে ভীমরাজের কি সম্পর্ক হ'য়েছিল, তাও রত্নবতীর জানা অসম্ভব; যখন গুম্ করা হয়, তখন রত্নবতী জান্‌লে। তলোয়ার দিয়ে মাথা না কেটে, গুম্ করা হ'য়েছিল কেন? ভবিষ্যতের আসায়! কষ্ট পেয়ে যদি রাজী হয়, তবে আর প্রাণে মার্‌বে না। ইচ্ছামত গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রেখে, ভীমরাজ অন্যলোকের মুখে রাষ্ট ক'রে দেয়, বিন্ধ্যাচলে অরুন্ধতীকে সর্পাঘাত হ'য়েছিল; অরুন্ধতী ম'রে গেছে।

সুড়ঙ্গের বিয়ের মজ্‌লিসে যে মেয়েটীকে চুরী ক'রে বিয়ে দিতে এনেছিল, সেটী অরুন্ধতীর কন্যা। লোকে ব'লেছিল, 'মা বাপের অমতে বিয়ে''; সেটা মিথ্যা কথা। মেয়েটীর মা বাপ নাই, এই কথাই রাষ্ট্র;—বাপ নাই, এ কথা ত সত্যই; মা সেই অরুন্ধতী। অরুন্ধতীকে বিবাহের সভাতে দেখে, ভীমরাজ চোম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, 'তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে?' চোম্‌কে উঠ্‌বার কারণ ছিল। অরুন্ধতী বেঁচে আছে, অরুন্ধতী পাষাণপ্রতিমার সুড়ঙ্গে লুকানো আছে, ভীমরাজ সেটা জানে, ভীমরাজের মুখে সে কথাটা অন্য লোকে শোনে, আকার ইঙ্গিতে বুঝ্‌তে পেরে, কোন রকম সন্দেহ করে, ভীমরাজের সেটা ইচ্ছা ছিল না। রত্নবতীও ন্যাকা হ'য়েছিলেন; উঁনিও তখন ভাল মানুষের মত জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, 'অরুন্ধতী নয় ম'রেছে?' এই, এখন সময় হ'য়েছে, মরা বাঁচা সব বেরিয়ে প'ড়্‌বে!"

রাজপুত্র ব'ল্লেন, "বুঝেছি সব; যাও এখন! তোমার আসামী দুটীকে ঠাকুর দর্শন ক'রিয়ে আনো!"

"তাঁরা সব আসুন!" নতশিরে কোতোয়াল ব'ল্লে, "তাঁরা সব আসুন! সবগুলি এক ঠাঁই না হ'লে, প্রতিমা দর্শনে রগড় হবে না! সময়টাও আসুক! সূর্য্যদেব আকাশে থাক্‌তে প্রতিমা-দর্শন হবে না। এ বাটীতে সুড়ঙ্গপথে যে যে কীর্ত্তি হ'য়েছে, সে সব কীর্ত্তি রাত্রিকালের খেলা। রাত্রি আসুক! অন্ধকারের কার্য্যের মিলন অন্ধকারেই ভাল হয়!"

সন্ধ্যা হবার তখনও অনেক দেরী। কোতোয়াল আর

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বে ? বিনা দোষে এ শাস্তি কেন তার ? এই ভাবে রাজপুত্রের চক্ষের দিকে আমি একটু ইঙ্গিত কোর্‌লেম ; রাজপুত্র কোতোয়ালকে বোস্‌তে বোল্‌লেন ; কোতোয়াল বোস্‌লো ; আসামী দুটী দাঁড়িয়ে থাক্‌লো।

সে ঘরে আমি নাই ; আমি আড়ালে আছি ; ইতি পূর্ব্বে আড়াল থেকেই ইঙ্গিত কোরেছি। সেই ছিদ্র-পথে ইঙ্গীত কোরে রাজপুত্র আমাকে হাঁস্‌তে হাস্‌তে বোললেন, "কুঞ্জবালা! গুমী বেরিয়েছে! তোমার প্রশ্নের উত্তর হাতে হাতেই মিলেছে!—আমাকে বোল্‌তে বোল্‌তে, কোতোয়ালের দিকে ফিরে, গম্ভীরবদনে জিজ্ঞাসা কোরলেন, "কেমন, গুমীরাও ত প্রতিমা দর্শনে আস্‌বে ?"

কোতোয়াল উত্তর কোর্‌লে "সম্ভব।"

রাজপুত্র আবার আমার দিকে ফিরে, আগেকার মত প্রসন্নবদনে বোললেন, "দেখ কুঞ্জবালা! গুমী ত বেরুলো, এখনকার পরামর্শ কি ? সেটা যদি তোমার ভগ্নী হয়, বহুৎ আচ্ছা,—ভগ্নী যদি নাও হয়, বহুৎ আচ্ছা,—আমি সেটাকে তোমার সখী কোরে দিব। এই রোমিয়া আছে,—রোমিয়া নামটী কিন্তু ভাল না ;—ইচ্ছা হোচ্চে নামটী আমি বদ্‌লে দিই! ময়ূ—"

কপাটের আড়াল থেকে হেসে হেসে ময়ূরমঞ্জরী বোল্‌লে, "রোমিয়া আমার ঠিক নাম নয়, ঠিক নাম হোচ্চে রোমাবতী ; লোকে আদর কোরে ঘৃণা কোরে, 'রোমিয়া' বোলে ডাক্‌তো।"

রাজপুত্র বোল্‌লেন, "না, ওটাও কাজের কথা নয় ;

আমার কাণে ত আর কিছুই ভাল লাগে না। 'ময়ূরমঞ্জরী' আর 'কপোতকুমারী,' এদুটী বেস নাম; আমি চির দিন তোমাদের ঐ নামেই ডাকবো। শোন কুঞ্জবালা! গুমীটী যদি তোমার সহোদরা ভগ্নী নাও হয়, সেটীকে আমি তোমার সখী কোরে দিব। এই ময়ূরমঞ্জরী আছে, কপোতকুমারী আছে, সেইটী আস্‌বে, তিনটী হ'বে; বেশ হ'বে! আরও জয়-মঙ্গ——"

কপাটের ছিদ্র দিয়ে আমি দেখ্‌তে পেলেম, এই খানে রাজপুত্র একটু অপ্রস্তুত হোয়ে জিব্ কাটলেন। তাতে আমি কি বুঝ্‌লেম? এই বুঝ্‌লেম, জয়মঙ্গলার নাম কোচ্ছিলেন, বোল্‌তে বোল্‌তে আট্‌কে গেল; বলা যেন ইচ্ছা নয়,— এই টুকুই প্রকাশ পেলে। সে প্রকাশে আমি কি বুঝ্‌লেম? এই বুঝ্‌লেম, জয়মঙ্গলাদের সঙ্গে কুমার ইন্দুভূষণের দুই একদিনের পরিচয় নয়, গোড়ায় কিছু বাঁধন আছে।

রাজপুত্র থেমেছেন। আবার তিনি সূত্র ধরবার আগে ভাগেই, তাড়াতাড়ী আমি জিজ্ঞাসা কোরলেম, "থামলেন কেন? আমিও তখন বোলেছিলেম, জয়মঙ্গলার দাদার সঙ্গে আপনার রূপ অভেদ!"

ঔদাস্য-ভঙ্গীতে রাজকুমার নীরব। কপাটের আড়াল থেকে আমি কথা কোচ্চি, কোতোয়াল সেটা বুঝ্‌তে পাচ্চে;— কে কথা কোচ্চে, গলার আওয়াজে রত্নবতী সেটা বুঝ্‌তে পাচ্চেন;—ভীমরাজ সেটা বুঝ্‌তে পাচ্চে না।

সূর্য্যদেবকে বিদায় করবার জন্যই আমরা তখন সেখানে

এই সব কথার নূতন পত্তন কোরেছি; বেলা থাক্‌তে প্রতিমা দর্শনের আশা থাক্‌লে, এসব কথা নিশ্চয়ই আমি ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রাখ্‌তেম।

সূর্য্যদেব আমাদের এই সঙ্কেত কথাগুলি শুন্‌লেন; শুনে শুনে রক্তবর্ণ হোয়ে, অস্তাচলে পাটে বোস্‌তে চোল্‌লেন। সূর্য্য এখন বারাণসীর চক্ষের অগোচর। অন্ধকার অবাধে আমাদের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোর্‌লে; সন্ধ্যা বধু চঞ্চলা হোয়ে ঘরে ঘরে পদার্পণ কোর্‌লেন। আমাদের কপোত-কুমারী স্বহস্তে দুটি বাতী প্রজ্বালিত ক'র্‌লে,—একটি আমাদের ঘরে রাখ্‌লে, আর একটী রাজপুত্রের ঘরে দিয়ে এলো; আস্‌বার সময় দেখে এলো, ভিন্ন ভিন্ন শিকল-বাঁধা রত্নবতী আর ভীমরাজ, একটা পাশে মাথা হেট কোরে দাঁড়িয়ে আছে।

কাশীর দেবালয়ে দেবালয়ে আরতির বাদ্য বেজে উঠ্‌লো; বাতাস সেই সকল বাদ্য যন্ত্রের আওয়াজ মুখে কোরে আমোদে আমোদে মেতে বেড়াতে লাগ্‌লো।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হোয়ে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রি প্রায় দু দণ্ড। রাজপুত্রের কাণে কাণে একটী কথার ইঙ্গিত করা আমার তখন নিতান্ত আবশ্যক হোয়ে উঠ্‌লো। কোতোয়াল যখন আসামী নিয়ে প্রথম আসে, তখন আমি ত ঐ ঘরেই ছিলেম। দেখা দেখি হোয়ে গেছে। শীঘ্র শীঘ্র উঠে এসেছি, আসামীদের মাথা হেট, তারা আমাকে দেখেছে কি না বোল্‌তে পারি না; কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য সে ঘরে যেতে আমার বাধা নাই। গেলেম, রাজপুত্রের কাণে কাণে একটী ছোট কথা

বোল্লেম। রাজপুত্র উঠে দাড়ালেন। ভীমরাজ তখন মাথা তুলেছে। চক্ষু তার কোন্ দিকে আছে, বিশেষ লক্ষ্য কোরে দেখে, রাজপুত্র ভীমরাজকে জিজ্ঞাসা কোরলেন, "কি রাজা! তুমি অমন চক্ষু প্যাঙ্কিয়ে পাকিয়ে একই দিকে চেয়ে রোয়েছ, কি মনে কোরে? তোমার কুলধ্বজ পুত্রটি, যে মেয়েটীকে স্লুড়ঙ্গের ভিতর গুম কোরেছিল, সেই মেয়েটীর আর এই মেয়েটীর একই ছবি, তাই বুঝি অমন কোরে কট্‌মট্ চক্ষে চেয়ে চেয়ে মিলিয়ে দেখ্‌ছ? আর বেশীক্ষণ মিলাতে হবে না! ঐ তারা সব আস্‌ছে!

"সিঁড়িতে অনেক লোকের পায়ের শব্দ! আমি স্লুট্ কোরে সে ঘর থেকে সোরে এলেম। লোকগুলি এসে উপস্থিত হোলেন; তফাতে তফাতে প্রহরী-ঘেরা লোহার গয়না বাঁধা সোমরাজ; তাঁদের সঙ্গে অনেক গুলি আলো আছে। ঘরে প্রবেশ কোরে, কুমার ইন্দুভূষণকে সঙ্গে নিয়ে, দলবল সব স্লুড়ঙ্গ-পথে চোল্‌লো; যাবার সময় কপাটের ছিদ্রে রাজকুমার আমার দিকে চেয়ে গেলেন। সে দৃষ্টিতে আমি বেস বুঝ্‌লেম, স্লুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করবার অনুমতি;—একটু পরে।

তাঁরা সব আলো নিয়ে স্লুড়ঙ্গ-পথে নেমে গেলেন; একটু পরে আমরাও একটী আলো হাতে কোরে, তিন জনেই নেমে গেলেম। সব ঘরের দরজা খোলা থাক্‌লো, সদর দরজা উদার মুক্ত।

আলোতে আলোতে নাটমন্দির ছয়লাপ! মন্দিরের

ভিতর কেবল একটী আলো; সেই আলোতে পাষাণ প্রতিমা যেন হাস্‌ছেন; কান্নার চক্ষে দেখ্‌লে, বোধ হয় যেন কাঁদ্‌ছেন; ঝড় নাই, বাতাস নাই, আপনা আপনি যেন দুল্‌ছেন! ভক্তেরা নিকটে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন,—সব লোক মন্দিরের ভিতরে নয়, কতক বাহিরে, কতক মন্দিরে; আমরা গিয়ে উপস্থিত হোলেম। রাজপুত্র আমাদের নিয়ে, মন্দিরের ভিতর, একধারে একটা পরদার আড়ালে দাঁড় কোরিয়ে রাখ্‌লেন; এক একবার আমাদের কাছে আসেন, তখনই তখনই অত্যন্ত অস্থির হোয়ে, অন্য দিকে, অন্য কাজে চোলে যান্‌। অতিশয় ব্যস্ত! মুখটী বুজে ব্যস্ত হোয়ে বেড়াচ্ছেন; আমরা পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি, উঁকি মেরে মেরে প্রতিমা দেখ্‌ছি; বিবাহের রাত্রে ভাল কোরে দেখা হয় নাই, আজ বেস্‌ নিকটে দাঁড়িয়ে চরণ থেকে কেশ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ কোর্‌চি।

মূর্ত্তিটী কি, আমাদের দেবতা ভাণ্ডারের অসংখ্য মূর্ত্তির মধ্যে সেটী নির্ণয় কোত্তে পাচ্চি না; নাম বলা অসাধ্য! মূর্ত্তি স্ত্রী-মূর্ত্তি, মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণা; দিব্য কুচ্‌কুচে কালো! তেমন নিখুঁত্‌ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর আমি অতি অল্পই দেখেছি; মূর্ত্তি এলো-কেশী,—কালী মূর্ত্তি নয়, জিব্‌ বাহির করা নাই, শিবের বুকের উপর নয়, শুষ্ক পাষাণের উপর এই পাষাণ প্রতিমা দাঁড়ানো! মূর্ত্তি দিগম্বরী নয়,—পরিধানে রক্তবাস, অঙ্গে অলঙ্কার নাই, দুখানি হাত;—হাত দুখানি ভক্তের মত অঞ্জলি-বদ্ধ;—রণমুখী নয়, রক্তমাখা নয়, মুণ্ডমালা নাই, করাল-বদনা নয়, লোল-রসনা নয়, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব; তবু যেন সে মূর্ত্তি দেখে

আমার রোমাঞ্চ হোতে লাগ্‌লো! ঠাকুর দেখে ভয় হয় কেন?

অন্যমনস্ক হোয়ে পোড়েছি। হঠাৎ রাজপুত্র ফিরে এসে, প্রায় আমার কাণের কাছে দাঁড়িয়ে, নাম ধোরে ডাক্‌লেন। আমি চোম্‌কে উঠে চেয়ে দেখি, রাজকুমার! মৃদু হেসে, একটু সোরে দাঁড়িয়ে, রাজপুত্র আমাকে মন্দিরের আর এক ধারের দেয়ালের দিকে চাইতে বোল্লেন। ত্বরিত-গতি বিদ্যুতের মত আমি চাইলেম। কি এ!—কি এ! স্বপ্ন, না সত্য? এ আমি কি দেখ্‌ছি? চক্ষুকে বিশ্বাস কোর্ত্তে পাল্লেম না। পলকে পলকে চক্ষু মার্জ্জন কোরে সটান পরিষ্কার চেয়ে দেখি, ঠিক্ তাই! মন্দিরের গায়ে আর্সি আছে না কি? আপ্‌নার ছায়া আমি আপ্‌নি দেখ্‌ছি না কি? কি আশ্চর্য্য! বসন ভূষণ পর্য্যন্ত সব এক! সব ঠিক্! নিশ্চয়ই মন্দিরের গায়ে আসি আছে! দেয়ালের ওধারে ঠিক্ আমিই যেন দাঁড়িয়ে রোয়েছি! চির দুঃখিনী বোলে, জন্মেও কখন আর্সিতে মুখ দেখি নাই, সত্য সত্য তা ত নয়? কতবার দেখেছি! আপ্‌নার দেহ আমি দিব্য চিন্‌তে পার্‌ছি! বুদ্ধিকে শান্ত রাখ্‌তে পার্‌ছি না। মৃদু হেসে, রাজপুত্র বোল্লেন, "জিজ্ঞাসা কর না? তুমি ভাব্‌ছো তোমারই প্রতিবিম্ব; আচ্ছা, জিজ্ঞাসা কর না; দেখ না, কি উত্তর দেয়! জিজ্ঞাসা কর, ওগো! তুমি কি আমি না সরলীবালা?"

বাতাসের ফাঁকা শব্দ যেমন কাণে যায়, রাজপুত্রের কথাগুলি সে সময় ঠিক্ সেই রকমেই আমার কাণে গেল;—কথা-

গুলিও ঠিক্ কাণের তারে বাজ্‌লো; কিন্তু মানে বুঝ্‌লেম না! তখন আমি এত অন্য মনস্ক!

মনে মনে আমি তখন ভাব্‌ছি, এরিই কথা সকলে তবে বলাবলি ক'চ্ছিল। ঐটি যদি সরসীবালা হয়, তবে সেই সরসীবালা ঐ! হয় সরসীবালা হোক্, কিন্তু আমার মত কেন? আমার সঙ্গে সরসীবালার কি কোন সম্পর্ক আছে? সরসীবালা কি তবে আমার ভাগ্যের কথা বোলে দিতে পার্‌বে? রাজপুত্র অনুমান কোচ্ছিলেন, সরসীবালা আমার সহোদরা ভগ্নী; কিন্তু সেটা কি কখন সম্ভব হয়? ত্রিসংসারে যার কেহ নাই, তার কি কখন ভগ্নী থাক্‌তে পারে? এত বয়স পর্য্যন্ত কেহই যখন প্রকাশ হয় না, তখন হঠাৎ এই সুড়ঙ্গের ভিতর একটি গুম্ করা সরসীবালা এসে, আমার ভগ্নী হোয়ে দাঁড়াবে, এটাই বা কি রকম কথা! ওমা! আবার এ কি? আর এক মূর্ত্তি, সরসীবালার পাশে আর এক মূর্ত্তি এসে দাঁড়িয়েছে!

বিস্ময়ের উপর বিস্ময় চেপে প'ড়্‌লো। যতটা অন্য মনস্ক হোয়েছিলেম, ততটা আর থাক্‌লো না; এক ভাবের উপর আর এক ভাব এসে দাঁড়ালেই প্রথমটা আল্‌গা হয়, আমার তাই হোলো। সরসীবালা দেখ্‌তে দেখ্‌তে নূতন মূর্ত্তি দেখে, আমার বিস্ময়ের জায়গায়, অন্যমনস্কের জায়গায় আতঙ্ক এসে প'ড়্‌লো,—কুমার ইন্দুভূষণ নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, আতঙ্কে সচঞ্চলে তাঁর মুখের দিকে চাইলেম। যেমন তেম্‌নি! ঠিক্ তাই! শান্ত মুখ! সে মুখে বিস্ময় অথবা

ভয়ের চিহ্ন কিছুই নাই। সভয়ে আরও একটু নিকটে গিয়ে আমি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, "নূতন মূর্ত্তি দেখেছেন ?"

রাজপুত্র ঈষৎ হাস্য ক'র্‌লেন ; ভাল মন্দ কিছুই ব'ল্‌লেন না। হাস্‌লেন, হাসুন ; না ব'ল্লেন, নাই বলুন ; আমি আমার পাঠক পাঠিকা গুলির কাছে নূতন মূর্ত্তির কথা বলি।

নূতন মূর্ত্তি এ স্থড়ঙ্গে এখন অনেক। যার চক্ষে যা হোক্, আমার চক্ষে প্রায় সব নূতন ! মেয়ে, পুরুষ, দুরকম। সকলের সঙ্গে আমার পরিচয়ের দরকার নাই, সকলের নামও আমার জান্‌বার দরকার ছিল না ; যাঁদের সঙ্গে ঘটনা স্থত্রের যতটুকু সম্বন্ধ, তাঁদের কথার ততটুকুই আমার আলোচনা। সে সব পরের কথা। এখন আমি যে মূর্ত্তি দেখ্‌ছি, সে মূর্ত্তি নূতন ; নূতন আবার ভয়ানক ! তবে ত মন্দিরের দেয়ালে আর্সি নাই ! আর্সি থাক্‌লে, ঐ মূর্ত্তিও আমার কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌তো ! আমি যেমন সরসীবালাকে আমার ছায়া মনে কর্‌ছি, নূতন মূর্ত্তি ত সে রকম কাহারও ছায়া নয় ! আপনার ছায়া আপনি ! বিবাহের মজ্‌লিসে, নীলবর্ণ আলোর ভিতর, এই মন্দিরের চৌকাঠের উপর থেকে যে মূর্ত্তি সাঁ ক'রে উড়ে গিয়েছিল, সেই মূর্ত্তি এই ! সেই রাত্রেই শুনেছি, ঐ মূর্ত্তি ভূত ! ভীমরাজের মুখে নাম শুনেছিলেম, অরুন্ধতি ! রত্নবতী ব'লেছিলেন, "অরুন্ধতি পাঁচ বৎসর ম'রেছে, তবে আবার অরুন্ধতি কেমন কোরে এলো !" সত্য কিন্তু সেই মূর্ত্তি এই ! ভূতে আমার বিশ্বাস নাই ; ভূত এমন শরীর ধারণ কোরে আসে, সে বিশ্বাস ত মূলেই নাই, ভূতের ভয়কে কিন্তু বিশ্বাস আছে। মেয়ে মানুষ বোলে একথা

শুনে কেউ হাস্‌বেন না! অরুন্ধতীতে আমি ভূত দেখ্‌ছি না; সত্য যদি মূর্ত্তির নাম অরুন্ধতী হয়, আমি শপথ কোরে ব'ল্‌তে পারি, অরুন্ধতী জীয়ন্ত মানুষ! অরুন্ধতীতে ভূতের লক্ষণ কিছুই নাই!

সরসীবালার পাশে অরুন্ধতী কেন? অরুন্ধতী কি সরসী-বালার মা? সরসীবালার মাথায় হাত দিয়ে বেশ আদর ক'র্‌লে। সরসীবালার মুখে ঘাম হোচ্ছিল, হাত দিয়ে মুচিয়ে দিচ্চে; সরসীবালা কি অরুন্ধতীর মেয়ে? না,—তা কেমন কোরে হবে? সে রাত্রে যে মেয়েটীকে সোমরাজের সঙ্গে বিয়ে দিতে এনেছিল, শুনেছি, সেইটীর মা অরুন্ধতী;—ওঃ হোঃ! তবে কি সরসীবালাকেই চুরী ক'রে এনেছিল? না, সে মেয়ে ত এ মেয়ে নয়! তার মুখ আমি দেখেছি, মুখ ঢাকা ঘোম্‌টা ছিল না, সে মুখ আমি বেশ দেখেছি;—কেঁদে ছিল, চক্ষের জলের দাগ পর্য্যন্ত দেখেছি। এ ত সরসীবালা নয়! ভগ্নী হবে? তাও ত্‌ হ'তে পারে না! লোকেরা ব'লেছে, অরুন্ধতীর কেবল একটীমাত্র কন্যা। তবে অরুন্ধতী সরসীবালার মা নয়। যদি থাকে, হয় ত আর কোন সম্পর্ক থাক্‌তে পারে। ফলতঃ অরুন্ধতী ভূত নয়, অরুন্ধতী জীয়ন্ত মানুষ, সেটা আমার নিশ্চয় প্রত্যয় দাঁড়ালো;—প্রথমে একটু ভয় হ'য়েছিল, সে ভয়টা স'রে গেল।

আর একবার রাজপুত্রের মুখের দিকে চাইলেম; ঠিক্ তেম্‌নি। তখনও যা, এখনও তা। একটী কথা আমি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি, রাজপুত্রের পায়ে হঠাৎ কে যেন তখনই পালক

বেঁধে দিলে! হাস্যভঙ্গীতে আমার চক্ষের দিকে একবার চেয়েই, ঠিক্ যেন পাখীর মত মন্দিরের বাহিরের দিকে উড়ে চ'ল্লেন। হয় ত মানুষেরা পাখীর মত উড়্তে পারে! সে রাত্রে অরুন্ধতীও তেম্নি ক'রে উড়ে গিয়েছিল। সম্মুখ দিকে চেয়ে দেখি, সে দিক্টা ফর্সা! অরুন্ধতীও নাই, সরসীবালাও নাই! পলকের মধ্যে তারাও তবে উড়েছে! সত্য সত্য এই মন্দিরের গুণেই উড়ে!

আমার মনটা বড় চঞ্চল হ'লো। রাজপুত্র কোথায় গেলেন? মন্দিরের ভিতর ফৌজদারী হাঙ্গামা, এমন শঙ্কট-ক্ষেত্রে আমার তখন সহায় কেবল ময়ূরমঞ্জরী আর কপোত-কুমারী। সখী দুটীর দিকে ফিরে, চোম্কে চোম্কে দুটী কথা আমি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি, হঠাৎ ময়ূরমঞ্জরী আমাকে আঙুল হেলিয়ে, আর একটা দিক্ দেখিয়ে দিয়ে, চকিতনয়নে ব'ল্লে, "ঐ দেখ!"

চমকিত হ'য়েই আমি চাইলেম। কার নাম ইন্দ্রজাল? সমস্তই যে মায়া দেখ্ছি! এরা আবার কোথা থেকে? উত্তরে দেয়ালের গায়ে, বক্রভাবে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্রসন্ন-মুখী যোগিনী, আর যোগিনীর দু পাশে দুটি সঙ্গিনী! সঙ্গিনী দুটিকে দেখেই আমি চিন্তে পার্লেম,—আগ্রার চক্রগড়ের রক্ষাকারিণী সেই বিষ্ণুপ্রিয়া আর বিমলা,—তাঁরা তত রাত্রে সেই সুড়ঙ্গের ভিতর কেমন ক'রে এলেন, সে তর্ক আর মনের ভিতর আন্তে হ'লো না,—যোগিনীর অসাধ্য কর্ম্ম নাই! আহ্লাদে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে, যোগিনীর কাছে ছুটে যাবার জন্যে

দু তিন পা আমি এগিয়েছি, নয়নসঙ্কেতে, হস্তসঞ্চালনে যোগিনী আমাকে নিবারণ ক'র্‌লেন।

কেন নিবারণ ক'র্‌লেন, ভাব বুঝ্‌তে পারি্‌লেম না। এগিয়েছিলেম, পেছিয়ে এসে, যেখানকার মানুষ, সেইখানেই এসে দাঁড়ালেম। একবার প্রতিমার দিকে চেয়ে দেখ্‌ছি, একবার যোগিনীর দিকে মুখ ফিরাচ্চি, মনটা কেমন চোম্‌কে চোম্‌কে উঠ্‌ছে! হঠাৎ প্রতিমার পশ্চাতে শত শত শিখায় রক্ত আলো প্রদীপ্ত! বিবাহের মজ্‌লিসে যে রকম দেখেছিলেম, ঠিক্ সেই রকম ভয়ানক লাল! পূর্ণ মন্দির লালে লাল! মন্দিরের মানুষগুলি পর্য্যন্ত—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ প্রতিমাখানি পর্য্যন্ত গভীর লালে বিমণ্ডিত! যে দিকে চাই, সেই দিকেই লাল! আমিও লাল! মন্দিরময় গন্ধকের গন্ধ! চক্ষে যেন ধাঁদা লাগ্‌তে লাগ্‌লো, নিশ্বাস যেন আট্‌কে আস্‌তে লাগ্‌লো। ভীমরাজ, সোমরাজ আর রত্নবতী, তিনজনে সেই লাল সাগরের মাঝ্‌খানে লাল হ'য়ে, প্রতিমার সম্মুখে করপুটে দাঁড়িয়েছে। আর একটি পুরুষমূর্ত্তি মহামূল্য মৃগয়ার সাজ পোরে, আসামীদের সম্মুখভাগে একটি যুবতী কন্যার হাত ধোরে, এসে দাঁড়িয়েছেন। সেই পুরুষমূর্ত্তির মস্তকে স্ত্রীলোকের মত দীর্ঘ কেশ, সেই কেশগুচ্ছ স্তরে স্তরে বিকুঞ্চিত হ'য়ে পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত। ললাটশিখরে মণিময় মুকুট, কণ্ঠে মতিহার, কর্ণে বীরবৌলী, কটিবন্ধে তরবারি! মূর্ত্তির মুখ দেখে হঠাৎ যেন আমার মাথার ভিতর বিদ্যুৎ চম্‌কালো! হঠাৎ একটা অনেক দিনের পূর্ব্বকথা মনে প'ড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সংশয়! কি সেই পূর্ব্ব-

কথা, কি সেই সংশয়, চিন্তা ক'র্‌বার অবসর হ'লো না। প্রতিমার দিকে চেয়ে, আসামী ভীমরাজের দিকে ফিরে, সেই মুকুটধারী নূতনমূর্ত্তি ব'ল্লেন, "ভীমরাজ! মনে ক'রে দেখ, তুমি অশেষ পাপের পাপী! সংসারে যত প্রকার দুষ্কর্ম্ম থাক্‌তে পারে, তোমার কাছে তার একটিও অপরিচিত নয়! একটি অনাথিনী রাজরাণীকে পথের ভিখারিণীর মত অসহায়িনী পেয়ে, তার পরম ধন সতীত্বধন চুরী ক'র্‌তে তোমার মতি হোয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বিষয় লোভ! বিষয় তুমি বড় ভালবাস; অবলাকে নরকে ডুবিয়ে, তার মৃতপতির রাজ্যসম্পদ্ হস্তগত করা তোমার আকাঙ্ক্ষা ছিল! জাল দলিল প্রস্তুত ক'রে, জাল মকর্দ্দমা উপস্থিত ক'রেছিলে! শিকার হস্তগত হ'লো না, সেই আক্রোশে, সেই অবলাকে অনাহারে প্রাণে মার্‌বার মন্ত্রণা স্থির ক'রেছিলে। জালটা ছিঁড়ে গেল। যত সব পাপকর্ম্ম তুমি ক'রেছ, তোমার মত লোকের পক্ষে সে সব কাজের সঙ্গে তুলনায় এ কাজটা ত অতি তুচ্ছ! পাপ তোমার ষোল কলায় পূর্ণ হ'য়েছে! এই সময় সেই অনাথিনী রাণীর পরিচয় একটু জেনে রাখ। রাজ্যলোভে দেশে তখন মোগল পাঠানে মহা সংগ্রাম। পাঠানেরা হিন্দু সেনাপতি রাখ্‌তো না, তথাপি সেই অনাথিনীর পতি—তিনি যিনিই হউন,—তিনি একজন মান্যগণ্য রাজচক্রবর্ত্তী;—তথাপি, পাঠান সৈন্যে তিনি একজন গণ্য সেনাপতি ছিলেন; তাঁর পরাক্রমে পাঠানেরা অনেক যুদ্ধে জয়লাভ ক'রেছিল। মিথ্যা ছলনায় মোগলেরা তাঁকে রাজবিদ্রোহী বলে! মনের ঘৃণায় তিনি নির্ব্বাসিত হন!

রাজ্যসম্পদ্ রাজসংসারে বাজেয়াপ্ত হয়! অনেকদিন নিরুদ্দেশ, লোকে অনুমান করে, মৃত্যু। নিশ্চয় মৃত্যুসংবাদ তুমি জান না। গর্ভবতী পত্নীসঙ্গে তিনি বনবাসী হ'য়েছিলেন। বনবাসিনী রাণী, বনবাসে তরুতলে, দুটি জমজ কন্যা সন্তান প্রসব ক'রেছিলেন।" মুকুটধারী মূর্ত্তি এইখানে একবার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, ক্ষিপ্র-হস্তে নেত্রমার্জ্জন ক'র্‌লেন। আবার তখনই আত্মসংযম ক'রে ব'ল্লেন, "সেই কন্যাদুটি যে কোথায়, রাণীটিই বা কোথায়, তাও তুমি জাননা;—জান যদি, তবু সেটা তুমি গ্রাহ্যই কর না! তোমার লোভের ফল, তোমার প্রতারণার ফল, তোমার দুষ্ক্রি-য়ার ফল, হাতে হাতে ফল্‌বার সময় উপস্থিত হ'য়েছে! এই পাষাণময়ী প্রতিমাতে তোমার অচলা ভক্তি, এইবার মনের সাধে প্রতিমা দর্শন কর! কাছে স'রে এসো! এই প্রতিমা তোমাদের সমস্ত দুষ্কর্ম্মের সহায়,প্রতিষ্ঠার সময় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রতিমাকে আলিঙ্গন কর।"

ভীমরাজকে এই সব কথা বোলে, রত্নবতীর দিকে ফিরে সেই মূর্ত্তি ব'ল্লেন, "রত্নবতি! তুমিও তাই। ভীমরাজকে যে যে কথা ব'ল্লেম, তোমার সম্বন্ধেও সেই সেই কথা। পাপ তোমার চরমসীমার উঠেছে! প্রতিমার প্রতি তোমারও অচলা ভক্তি, প্রতিমা দর্শন কর! ভক্তিভাবে প্রতিমাকে আলিঙ্গন কর।"

এইবার সোমরাজের পালা। সোমরাজের নিকটে অগ্রসর হোয়ে নব মূর্ত্তি বোল্লেন, "সোমরাজ! তোমার বাপের পাপের চেয়ে তোমার পাপ আরও বেশী! সেটা সম্ভবও

হোতে পারে। তোমারই মুখের উপর, তোমার বাপ আজ্ জাঁতার পেষণে নিজে মুখে প্রকাশ কোরেছে, তোমার বাপের বিবাহ করা স্ত্রীর গর্ব্ভে তোমার জন্ম নয়। অধর্ম্মে তোমার জন্ম, অধর্ম্মের সংসারে, সমস্ত অধর্ম্মই তোমাতে সম্ভবে! স্ত্রী জাতিকে তুমি ভাল বাস;—ভাল বাসার কথাটা তুমি মুখে আন, তাতে ভাল বাসার অপমান হয়! ভাল বাসি বোলে কত কুলবতীর কুল তুমি নষ্ট কোরেছ! যাকে যখন ফাঁদে ফেল্‌বার ইচ্ছা হোয়েছে, তখনই তাকেই তুমি বোলেছ, আমি তোমাকে ভালবাসি! মনে কর, সেই সরসীবালার কথা;—ললিত গড়ে সরসীবালা তোমাকে কত বড় একটা বিপদ্ থেকে উদ্ধার কোরেছিল, সেই বিপদে সেই বালিকা হোতেই তোমার প্রাণ রক্ষা হোয়েছিল। ললিত গড়ের অধিপতি ললিতানন্দ যখন ললিত গড়ে ছিলেন, কি জান, কি বিধির নির্ব্বন্ধে, সরসীবালা সেই সময় সেই বাড়ীতেই ছিল। ললিতানন্দ যখন মোহনপুরীতে, ললিতানন্দ যখন দেশ ভ্রমণে, তখনও সরসীবালা সেই বাড়ীতে ছিল। তুমি ললিতানন্দের বন্ধু,—বেছে বেছে বন্ধুটী পেয়েছিল ভাল বটে! বিপদ্ থেকে বেঁচে, বন্ধু বোলে, তুমিও সেই বাড়ীতে স্থান পেয়েছিল;—ললিতানন্দের বন্ধু বোলেই সরসীবালা তোমাকে বিশ্বাস কোরেছিল। তুমি কি কোরে ছিলে?—সরল বালিকাকে তুমি ব'লেছিলে, "আমি তোমাকে ভাল বাসি!" তার পর সেই ভালবাসা বালিকার যে দুরবস্থা কোরেছ, মনে মনেই তা তুমি জান;—কোতয়ালির জাঁতাও আজ্ তোমারই মুখে

সেই সব কথা প্রকাশ কোরিয়েছে! তত কায়দায় আটক্ কোরে রেখেও, দলের লোকের উপর তোমার সন্দেহ ছিল। তুমি ভাব্‌তে, কেউ বুঝি সরসীবালাকে চাবি খুলে দেয়, এক এক রাত্রে সরসীবালা বুঝি পালায়, ভয়ে ভয়ে বুঝি আবার ফিরে আসে, এইটীই তুমি ভাব্‌তে;—তাই ভেবেই, এক রাত্রে মোহনপুরীর ঠাকুরবাড়ীতে, আর একটী ভদ্রলোকের মেয়েকে সরসীবালা বোলে পীড়াপীড়ী কোর্‌তে গিয়েছিলে। সে মেয়ে ত ভয়েই অজ্ঞান! চেনে না, শোনে না, জন্মেও দেখে নাই, তারে তুমি বল কি না, তুমি আমাকে সোমেশ্বর বল! একে ত তোমার মুখ দেখ্‌লেই ভয় হয়,—আমাদেরই হয়, বালিকা ত কোন্ ছার। চেহারা খানা ভাল আছে বটে, কিন্তু মুখে যেন পৃথিবীর সমস্ত পাপের মূর্ত্তি আঁকা! সে বালিকা তখন তোমাকে মানুষ বোলেই চিনে ছিল, তোমার পেটের ভিতর যে দুষ্ট বুদ্ধি খেলা কোর্‌ছে, আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তোমার মুখ চক্ষের ছাঁচে সে বালিকা তার স্পষ্ট স্পষ্ট ছবি দেখেছিল! ধর্ম্মই ধর্ম্ম রক্ষা করেন; ধর্ম্ম বলেই তারা রক্ষে পেয়েছে, তুমি রক্ষে পেলেনা! ধর্ম্ম তুমি চেননা, ধর্ম্ম তোমাকে ছোঁবেন না, ধর্ম্ম তোমাকে দয়া ক'র্‌বেন না! নিশ্চয় জেনো,—রত্নবতি! তুমিও শোন, ভীমরাজ! তুমিও একথাটায় কান দাও! তোমরা নিশ্চয় জেনো, যে সকল অভাগা অভাগীদের তোমরা একবারে প্রাণে মেরে ফেলেছ, তারা আর ফিরে আস্‌বে না; কিন্তু যারা যারা বেঁচে আছে, আমি যতদূর জেনেছি, তারা চির জীবন ধর্ম্মের সেবা করে,

তোমাদের দৌরাত্ম্যে তাদের গায়ে একটুও কলঙ্কের আঁচড় লাগে নাই। তারা পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ। তারা এসংসারে অবশ্যই সুখ সূর্য্যের মুখ দেখ্‌বে। আর তোমরা?—তোমরা অনন্ত নরকের অনন্ত অন্ধকারে ডুবে যাবে! যাও প্রতিমা দর্শন কর!

তখনও মন্দিরে লাল আলো বিদ্যমান। সেই আলোর ভিতর দিয়ে সাঁ কোরে ছুটে এসে, যোগিনী সেই খানে তৎক্ষণাৎ প্রতিধ্বনি কোর্‌লেন, "তথাস্তু! তথাস্তু!" তোমরা অনন্ত নরকের অনন্ত অন্ধকারে ডুবে যাবে! যাও প্রতিমা দর্শন কর।"

সমস্তই নিস্তব্ধ। মুকুটধারী মূর্ত্তির সঙ্গিনী যে কন্যাটী, সেই কন্যাটীর মুখের দিকে চক্ষু দিয়ে মূর্ত্তি আবার সোমরাজের দিকে চেয়ে চেয়ে বোলতে লাগ্‌লেন, "সোমরাজ! এ মেয়েটীর তুমি নাম জান? একে তুমি ভাল বেসেছিলে? একে এখন তুমি চিন্তে পার? বিয়ে কর্‌বার জন্যে একে তুমি এই সুড়ঙ্গে চুরী কোরে এনে ছিলে? রাজকন্যা বোলে চুরী কোরেছিলে? বিধাতা রাজকন্যার সঙ্গে তোমার মত বরের বিবাহ সংঘটন হোতে দিবেন কেন? তুমি জারজ, তোমার জন্মদাতা একজন ফেরিওয়ালা, প্রজাপতি তোমার উপরে রাজকন্যাদের মতি ফিরাতে দিবেন কেন? অসম্ভব, অসম্ভব। তাই জন্যেই তারা ভয় পায়; তাই জন্যেই তারা কাঁদে; তাই জন্যেই তারা হাত ছাড়া হোয়ে পালায়। হাজার ভাল বাসি ভাল বাসি বোলে পায়ের কাছে গড়াগড়ি খেলেও, শুদ্ধ সম্ব

রাজকন্যাদের তুমি বশে রাখ্‌তে পার না! তবু দেখ সোম-রাজ! সংযোগটা দেখ! এ কন্যা রাজকন্যা নয়; একটী রাণী দয়া কোরে এটীকে প্রতিপালন কোরেছিলী, এইমাত্র। এই কন্যার নাম অমলা। এ কন্যার মাতা পিতা সামান্য লোক ছিল, সে অবস্থায় পরিচয়ে কোন প্রয়োজন নাই। কন্যার জননী বেঁচে আছে; জননী একটী রাজরাণী, তোমার কাণে রাষ্ট্র হোয়ে ছিল এই কথা; সেটা মিথ্যা কথা; দুঃখের অবস্থায় সকলই হয়। কন্যার মাতা পিতা দুঃখের অবস্থায় কন্যাটীকে অন্নপূর্ণা-পুরীর চৌকাঠের উপর ফেলে দিয়েছিল, রাণী কুড়িয়ে এনে যত্ন ক'রে মানুষ কোরেছেন। রাণীই নাম দিয়েছেন, অমলা। রাণী এখনও বেঁচে আছেন, সে কথাটি সত্য। বুঝ্‌তে পেরেছ ভীমরাজ সে রাণীটী কে? থাক্ থাক্, যাও তোমরা, এসো! প্রতিমা দর্শন কর!

প্রতিমাকে স্পর্শ কোরে আলিঙ্গন না কোর্‌লে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। এস রত্নবতি! তুমিই আগে এসো! প্রতিমার পদ চুম্বন কোরে তুমিই আগে প্রতিমাকে আলিঙ্গন কর! মন্দিরের দ্বারদেশে, সুড়ঙ্গের উপরে খিলানের গায়ে, লোহার শিকলে প্রকাণ্ড একটা ঘণ্টা দোদুল্যমান থাকে; ভয়ানক ঠন্ ঠন্ গর্জ্জনে অকস্মাৎ সেই ঘণ্টাটা বেজে উঠ্‌লো!—থেমে থেমে বাজে, ঘোর গম্ভীরে প্রতিধ্বনি হয়, 'গোঁ গোঁ বোঁ বোঁ' প্রতিধ্বনি শব্দ যেন মন্দিরের ঘুরে বেড়াতে থাকে; শব্দ শুনে সাহসী মানুষের মনেও ভয় হয়। বাজে, গর্জ্জন হয়, প্রতিধ্বনি হয়, হুম্ হুম্ শব্দে ভয় দেখায়,

একটু একটু থামে, আবার বাজে; জীবন্ত মানুষ ভয়ে আড়ষ্ট! চারিদিকে গন্ধকের গন্ধ-পূর্ণ রক্তিম আলোর রক্তিম মূর্ত্তি, আলোর ভিতরের মানুষগুলির ও আরক্ত মূর্ত্তি; সমস্ত বদন নিস্তব্ধ, সমস্ত নেত্র সুস্থির, সমস্ত মূর্ত্তি অচল; তার উপর বিপর্য্যয় ঘণ্টার ভয়ঙ্কর নিনাদ, ভয়ঙ্কর স্তম্ভিত লোমহর্ষণ ভাব! লাল আলোর উপর সব মনুষ্য-মূর্ত্তির ছায়া প'ড়েছে, ছায়ারা সব দাঁড়িয়ে র'য়েছে; সমস্তই নিস্তব্ধ!—ভয়ঙ্কর স্তম্ভিত! যোম যেন মন্দিরের ভিতর বিদ্যমান। অবিরাম ভীষণ ঘণ্টা-ধ্বনি ক্রমশই ভীষণ! কন্যাটীর হাত ছেড়ে দিয়ে মুকুটধারী মূর্ত্তি রত্নবতীর হাত ধোর্‌লেন। অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি! মুকুটধারী রত্নবতীকে প্রতিমার দিকে এগিয়ে এগিয়ে নিয়ে চ'ল্‌লেন; বাধা দিয়ে ত্বরিত স্বরে যোগিনী বোলে উঠ্‌লেন, "না—না—না, ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা। ছেড়ে দাও, ধ'রো না, আপ্‌নি যাবে! অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি।

লৌহভূষণবতী রত্নবতী আপ্‌নিই এগুতে লাগ্‌লেন। লোকেরা সব ফাঁক। রত্নবতী এগিয়ে গিয়ে প্রতিমার পদ চুম্বন কোর্‌লেন; বদ্ধ-হস্তে প্রায় মুখোমুখী হোয়ে দাঁড়ালেন। অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি! প্রতিমার হস্ত অঞ্জলীবদ্ধ। হঠাৎ ধীরে ধীরে যেন হাত দুখানি কাঁপ্‌লো; জোড়া হাত যেন ছাড়া ছাড়া হোতে লাগ্‌লো; প্রতিমার মুখের ভিতর দাঁত কড়্‌ মড়ের শব্দ হোল। অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি! প্রতিমার মুখ খানা হাঁ হোয়ে গেল; হাত দুখানা সমান বিস্তৃত হোয়ে ছড়িয়ে প'ড়্‌লো। তখনও লাল আলো! প্রতিমা কাঁপ্‌ছে,

প্রতিমা দুল্‌ছে, প্রতিমা হাঁ ক'র্‌ছে, প্রতিমা বাহু বিস্তার কোর্‌ছে, রত্নবতী অগ্রবতী। অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি! প্রতিমার হাত দুখানা দুদিক্‌ থেকে ঘুরে এসে রত্নবতীকে চৌচাপটে জ'ড়িয়ে ধার্‌লে,—যেমন ক'রে সাপে জড়ায়, ঠিক্‌ তেম্‌নি কোরে জড়ালে। রত্নবতীর পরিত্রাহি চীৎকার! ভীষণ ঘণ্টাধ্বনি! প্রতিমার ভয়ানক দাঁত কড়্‌ মড়্‌! বাহু পেষণে রত্নবতীর হাড় মড়্‌ মড়্‌! রত্নবতীকে বুকে ক'রে প্রতিমা যেন চক্রাকারে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো। ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি! যে দিকে যখন ঘোরে, সেই দিকেই তখন বেশী চাপ পড়ে। প্রতিমার সর্ব্ব শরীরে রত্নবতীর সর্ব্ব শরীর মিশে গেল। ক্ষণকাল মধ্যেই সব ফর্সা। ঠনাঠন্‌ ঘণ্টাধ্বনি! রত্নবতীর দেহ খানা চূর্ণ বিচূর্ণ,—পাপ জীবন বহির্গত! প্রতিমার হাত দুখানা ক্রমে ক্রমে আবার শিথিল হোয়ে এলো! পাপিনীর চূর্ণ দেহটা ধুপ্‌ কোরে পদতলে প'ড়ে গেল! ঘণ্টাও থাম্‌লো!

ত্রয়োবিংশ তরঙ্গ।

রাণী অরুন্ধতী।

দেখে শুনে আমি ত একবারেই হতবুদ্ধি। কুমার ইন্দুভূষণ কোথায় গেলেন? এতগুলো আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌ছি, এতগুলো অদ্ভুত কথা শুন্‌ছি, সকলের উপর আমার বেশী

ভাবনা ইন্দুভূষণ কোথায়? ইন্দুভূষণ এখানে আস্‌বেন না। প্রকৃতি যে রকম শীতল, তিনি এ হত্যাকাণ্ড দেখ্‌বেন না! আমি পাষাণী, তাই জন্যে আমার চক্ষে সহ্য হ'চ্ছে! কেন? এত নিষ্ঠুরই বা কেন হই? রত্নবতী পাতকিনী, প্রতিমার হস্তে পাতকিনীর শাস্তি, সেই জন্যই সেটা আমি সহ্য ক'র্‌তে পার্চ্ছি। ইন্দুভূষণ আস্‌বেন্ না;—এলেন্ না।

মুকুটধারী মূর্ত্তি ভীমরাজকে প্রতিমার হস্তে সমর্পণ কর্‌বার আকিঞ্চন ক'চ্ছেন; ভীমরাজটা কেঁদে উঠ্‌লো,—"বাবা! আমাকে মাপ কর! ও রাক্ষসীর মুখে আমি যাব না! তোমরা আমাকে তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেল, গলায় বরং সাপ জোড়িয়ে দাও, ইচ্ছা হয় গুলি কোরে মার, না হয় ত গলায় পাথর বেঁধে স্রোতের জলে ডুবিয়ে দাও,—"

ঈষৎ হাস্য কোরে মুকুটধারী বোল্লেন, "হাঁ, যে রকমে তুমি মহীপত বাহাদুরকে ডুবিয়ে মেরেছিলে!—আচ্ছা, হাঁ, বল! ব'লে যাও! আর কি কি রকমে তোমার মর্‌বার ইচ্ছা আছে, বল!"

কেঁদে কেঁদে ভীমরাজ ব'ল্লে, "দোহাই বাবা তোমার! আমার ইচ্ছা, তোমার মতে; তোপের মুখে, কুকুরের মুখে, আগুণের মুখে, তলোয়ারের চোটে, জলের স্রোতে, যে রকমে তোমার ইচ্ছা হয়, সেই রকমে তুমি আমাকে সংসার থেকে তাড়াও! দোহাই বাবা! ঐ রাক্ষসীর মুখে দিও না!"

মধ্যবর্ত্তিনী হ'য়ে, যোগিনী হস্তবিস্তার ক'রে ব'ল্লেন, "তথাস্তু! তথাস্তু!" ভীমরাজের মরণ প্রতিমার কোলে হবে

না, পুরুষের দণ্ড অন্য রকমে হবে। ভীমরাজের আর সোম-রাজের দণ্ড একটু বিলম্বে হোলেই ভাল হয়। ভীমরাজ এখন যে কার কাছে দাঁড়িয়ে, মুখ তুলে কথা ক'চ্চে, সেটা বতক্ষণ——"

যোগিনীর মুখপানে চেয়ে, সচকিতে মৃদু হেসে, মুকুটধারী-মূর্ত্তি ব্যগ্রহস্তে মাথার মুকুটখানি আর উপরের অঙ্গাবরণটা চকিতমাত্রে খুলে ফেল্লেন। চকিতমাত্রেই প্রতিমার পশ্চাতের লাল আলোটা নির্ব্বাণ হ'য়ে গেল। মন্দিরের পূর্ব্ব আলোর জ্যোতি বেরুলো। সেই জ্যোতিতে নবীনমূর্ত্তি সগর্ব্বে গম্ভীর-স্বরে বিদ্রূপচ্ছলে ব'ল্লেন, "দেখ দেখি. ভীমরাজ! আমি কে? দেখ দেখি একবার মুখ তুলে চেয়ে! আমাকে তুমি চিন্তে পার? আমি সেই অরুন্ধতী! আমি সেই অনাথিনী অভাগিনী রাণী, যার উপর তোমার দৌরাত্ম্য! দেখ ভীমরাজ! বিবাহের মজ্‌লিসে তোমাদের জন্য আমাকে অপদেবতা সাজ্‌তে হ'য়েছিল! আমি মরি নাই! ঘটনায় দেখা গেল, তোমার আগে আমার মরণ হবে না! আমি তোমার বন্দিনী হ'য়েছিলেম! আমাকে তুমি চাবি দিয়ে রাখ্‌তে! সুড়ঙ্গে আমার বন্ধু ছিল; আমার ইচ্ছা হ'লে, বন্ধু আমাকে মুক্তি দিতেন। আমি সেই সময় পুরুষবেশে তোমাদের অজ্ঞাতে অনেক কীর্ত্তি ক'রে বেড়িয়েছি! বোল্‌তে আর এখন আমার মায়া হয় না,—মায়া মমতা তুমি সব ঘুরিয়ে দিয়েছ! আমার দুটী জমজ কন্যা হ'য়েছিল; দৈবের ঘটনায়, বিধির বিপাকে, নিতান্ত শিশুকাল থেকে সে দুটী যে কোথায় গেল, কি হ'লো, পৃথিবীতে থাকলো,

কি বন্য জন্তুতে খেয়ে ফেল্লে, কিছুই আমি জাস্তেম্ না! এখনও নিশ্চয় জানি না। কিন্তু দেখ ভীমরাজ! তোমা হ'তে একটী আমার শাপে বর হ'য়েছিল! তোমার কুলধ্বজ বংশধর এই সোমরাজ, একটী সুন্দরী কুমারী বালিকাকে জোর ক'রে, এই সুড়ঙ্গের ভিতর ধ'রে আনে, সেই মেয়েটীর নাম সরসীবালা। সরসীবালাকে দেখে আমার বুক ফেটে কান্না এসেছিল! আমার মেয়েরা বেঁচে থাক্‌লে, ঠিক্ তত বড় হ'তো; তেম্‌নি রূপ হ'তো! কেননা, আমি জানি, ছোট বেলা সে দুটী বেশ ফুট্‌ফুটে সুন্দর ছিল! সরসীবালার উপর ঠিক্ আমার কন্যা-স্নেহ জন্মেছিল! তার পর এক রাত্রি শুন্‌তে পাই, মোহন-পুরীতে ললিতানন্দের বাড়ীতে, সরসীবালার মত আর একটী মেয়ে এসেছে; সে মেয়েটীর নাম কুঞ্জবালা! কন্যাস্নেহ আমার অন্তরে এত বড় প্রবল! আমার কন্যা কি কার্ কন্যা, কিছুই জানি না, তবু আমি সেই রাত্রে, বীরপুরুষের মত রণ-বেশে তলোয়ার ধোরে, মোহনপুরীতে কুঞ্জবালা দেখ্‌তে গিয়েছিলেম! বারাণ্ডায় বারাণ্ডায় বেড়িয়ে, উঁকি মেরে দেখে এসেছিলেম। কুঞ্জবালা আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছিল কি না, তা আমি জানি না। কন্যাস্নেহ আমার এত প্রবল! এই মেয়েটীকে আমি সঙ্গে ক'রে এনেছি, লোকে হয় ত এটীকে আমার কন্যা ব'লেই জানে; কিন্তু তা ত নয়,—কন্যাস্নেহে পাগলিনী হ'য়ে, এই মেয়েটীকে আমি অমলা নাম দিয়ে, পোষ্য-কন্যা ক'রেছিলেম। তোমারই কুলধ্বজ এই অমলাকে চুরী ক'রে এনেছিল! জন্মে তুমি অনেক পাপ ক'রেছ; কিন্তু শেষ-

কালে এই বামাকুলের অপমান ক'রে, সামান্য শেয়াল কুকুরের মত তোমার প্রাণ গেল! জারজ সোমরাজকে যদি তুমি বংশধর বোলে অঙ্গীকার কর, তা হ'লে এই অবলার শাপে, তোমার বংশ পর্য্যন্ত নির্ব্বংশ!"

অরুন্ধতী দেবী একটী নিশ্বাস ফেলে, বিমর্ষবদনে সেই পাষাণের উপর ব'স্‌লেন। আমার সেই সময় ঘন ঘন কতই যে নিশ্বাস প'ড়্‌লো, তা আমি গণনা করি নাই! উঃ! মায়াচক্রের কতই ঘোর! মায়ার সংসারে বাস ক'রেও, মানুষে সে ঘোরের একটী রেখাও বুঝে উঠ্‌তে পারে না! বিবাহের রাত্রের সেই অপচ্ছায়া 'অরুন্ধতী' দেবী! কুমার ইন্দুভূষণের মায়ায়, একটু পূর্ব্বে দেখেছি, মন্দিরের ধারে, সরসীবালার পাশে 'অরুন্ধতী!' মুকুটধারী বীরবেশী এলোকেশী মূর্ত্তিও 'অরুন্ধতী' দেবী! দেবলীলার মত এ সকল মানবীলীলাও অসম্ভব আশ্চর্য্য জ্ঞান হ'চ্চে! ওঃ! তিনিও তবে এই 'অরুন্ধতী' দেবী!

চক্রগড়ের যমযন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে, অজ্ঞাত-নাম ললিতানন্দের জাহাজে, যে সময়ে আমি মোহনপুরীতে উপস্থিত হই, দেবী অরুন্ধতীই তবে সেই সময়ে রাত্রিকালে বীরবেশে, কন্যাস্নেহে পাগলিনী হ'য়ে, ললিতানন্দের গৃহে প্রবেশ ক'রেছিলেন! কথাবার্ত্তা কিছুই না! চুপি চুপি স'রে এসেছিলেন! কিন্তু ভাব কি? কন্যাস্নেহে পাগলিনী হ'য়ে, কুঞ্জবালা দেখা কেন? অরুন্ধতী দেবী তবে কি কুঞ্জবালার মা হন্? লাল আলোতে মুকুটধারী বীরমূর্ত্তি দেখেই, আমি সেই মূর্ত্তি ব'লেই চিনেছি! চিনেছি ব'লেই তখন শিউরেছিলেম; কিন্তু এমন

কেন? কন্যাস্নেহ বলেন কেন? আমি কি তবে অরুন্ধতী দেবীর কন্যা? এমনটাও কি সম্ভব হবে? হা অদৃষ্ট! মানুষের সকল কথাই তুমি ব'লতে পার, কিন্তু ভোগাভোগের আগে কিছুই তুমি বল না! দুঃখিনী কুঞ্জবালার গর্ভধারিণী কি পৃথিবীতে বেঁচে আছেন? না থাকাই বা কি ক'রে সম্ভব ব'লে ভাবি? সরসীবালার উপরেও বলেন কন্যাস্নেহ! সরসীবালা আমার কে? কুমার ইন্দুভূষণ শুনেছেন, সহোদরা ভগ্নী! তাই কি তবে সত্য হবে? অরুন্ধতী দেবী তবে কি আমাদের দুজনেরই মা? সাগরের তরঙ্গের মত, আমার বুকের ভিতর তখন কতই তরঙ্গ আন্‌তে লাগ্‌লো, কতই আমি ভাবতে লাগ্‌লেম, কতই আমি ভাব্‌ছি, ইন্দুভূষণ আস্‌ছেন না! যোগিনীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে পার্‌ছি না। উপকারিণী বিমলা বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত ধোরে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, দুটী মিষ্টকথা বল্‌বারও অবসর হ'চ্চে না!

সহসা দেবী অরুন্ধতী সচঞ্চলে উঠে দাঁড়ালেন। কতই যেন উল্লাসে দর্প ক'রে ব'ল্লেন, "শোন ভীমরাজ! তোমার সঙ্গে আমার আরও কথা আছে; প্রতিমার কোণে তোমার প্রাণ না যাওটা ভালই হ'য়েছে; তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হ'য়েছে! রত্নবতী ম'রেছে; কার ঘরের রাণী হ'য়ে কার রাজত্ব ভোগ ক'চ্ছিলো, নিষ্কণ্টক ভোগ কি না, প্রকৃত ভোগের অধিকারী আছে কি না, মরণের আগে রত্নবতী সেটা ভাল ক'রে জেনেই গেছে! কুমার ইন্দুভূষণ রত্নবতীকে মাসীমা ব'লে ডাকতেন। মুখে আত্মীয়তা জানিয়ে, ষটচক্র ভেদের উপযুক্ত

পন্থা অন্বেষণ ক'ত্তেন। কুমার ইন্দুভূষণ রত্নবতীর ভগ্নীপুত্র নয়, রত্নবতীর বিষয় ভোগের কণ্টক! পাপাচার নির্জ্জীব দুঃশীল লঘুচেতা মহীপতি রাওয়ের. সাধুব্রত ধর্ম্মশীল মহাতেজস্বী বীরপুঙ্গব বহুগুণাকর ভ্রাতষ্পুত্রণ মহীপতির রাজত্ব হ'লে, ইন্দুভূষণ এ রাজত্বকে পদধূলির মত অস্পৃশ্য জ্ঞান ক'র্‌তেন ;—পিতৃ-পিতামহের রাজত্ব, পাপিষ্ঠের সোপার্জ্জিত রাজ্য-সম্পদ্‌ নয় ; সমস্ত বিধিব্যবস্থা মতে; কুমার ইন্দুভূষণ এই সমস্ত রাজ্য-সম্পদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আর একটী উত্তরাধিকারী আছে, সেটী ইন্দুভূষণের ইচ্ছাবিরোধী হবে না! ভীমরাজ! তুমি বৃদ্ধ, তুমি অনেকদিন এ দেশে আছ, তুমি কি এ সকল তত্ত্ব জাননা? অবশ্যই জান। তুমি জালিয়াত! তুমি রত্নবতীর বন্ধু! তোমারই লেখা দলিলের জোরে রত্নবতী রাণী হ'য়েছিল! তুমি দাগাবাজ! তুমি স্বহস্তে সেই জাল দলিলে মৃত মহীপতির নাম দস্তখত ক'রেছিলে! সে দলিল এখন কুমার ইন্দুভূষণের হস্তগত হ'য়েছে! রাজবংশের যা যা কিছু নিদর্শন, সমস্তই এখন ইন্দুভূষণের হাতে! তোমরা মনে ক'রে রেখেছ, রত্নবতীর বাড়ীতে ডাকাত প'ড়েছিল; ডাকাত নয়, তাঁরা সকলগুলিই কুমার ইন্দুভূষণের বন্ধু। ডাকাতির ছলনায় সব কায়দা হস্তগত কর্‌বার অভিপ্রায়ে, ইন্দুভূষণের বন্ধুরা ছদ্মবেশে, গুপ্ত অগুপ্ত সমস্ত জিনিস পত্র লুঠ তরাজ করেন। যার ধন তারই জন্য লুঠ, তাতে অপরাধ হয় না;—পুণ্য হয়! ইন্দুভূষণের বন্ধুগণ সেই পুণ্যের অধিকারী হ'য়েছেন! এত সব সূক্ষ্মতত্ত্ব আমি এতদিন জান্‌তেম না; কাজের গতিকে, আমার

মুখেই এই সব তত্ত্ব পরিস্ফুট হওয়া বিধিসিদ্ধ ব'লেই, এই যোগিনী দেবী আমাকে সমস্ত পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন! দেখ ভীমরাজ! আরও শোন। এই যোগিনী দেবী কে, তা তুমি জান? ইনি আমার গর্ভধারিণী জননী 'মহিষী দেবী' যবনের অবিচারে, মহাপ্রতাপশালী পরমধার্ম্মিক সম্বলরাজ যখন সর্ব্বসম্পদে বঞ্চিত হোয়ে, বনবাসে নির্ব্বাসিত হন, এই অভাগিনী আমি তখন দময়ন্তীর মত বনবাসিনী সঙ্গিনী হোয়ে ছিলেম। আমি তখন গর্ভবতী! আমাদের শোকে, আমার এই পুণ্যবতী করুণাময়ী জননী, সেই সময়ে স্বইচ্ছায় গৃহত্যাগিনী বনবাসিনী হন। জননীর আমি, বড় আদরিণী একমাত্র কন্যা! আমার সেই দশা দর্শন কোরে, মা আমার সংসার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেন! যোগসাধনায় মন যায়। জননীর যোগের কথা আমি জননীর মুখেই শুনেছি, আজ আমি জননীর মুখে আরও শুনেছি, বনবাসে আমি যে যুগল কন্যা প্রসব করি, সে দুটী কন্যা বেঁচে আছে! উঃ! আজ ষোল বৎসরের কথা! সে কন্যা দুটী কোথায়, তা এখনও আমি জানি না! সরসীবালাকে আর কুঞ্জবালাকে দেখে, আমার হৃদয়ে অপত্যস্নেহের ধারা বয়। এই যুগল বালিকা আমার সেই যুগল কন্যা কি না, তাও এখন আমি নিশ্চয় কোরে ব'লতে পারি না। জননী ব'লেছেন, আমি যখন বিপদে প'ড়েছি, আমার কন্যারা যখন বিপদে প'ড়েছে, যোগবলে তখনই তিনি, গোচরে অগোচরে, আমাদের বিপদ্‌কালে সহায় হোয়েছেন। সেই কন্যা যদি সরসীবালা, আর কুঞ্জবালা——"

যোগিনী যেন নাচ্‌তে নাচ্‌তে করতালি দিয়ে প্রমোদ ভরে ফুল্‌তে ফুল্‌তে বোল্লেন, "তাই—তাই—তাই! তুমি সতী অরুন্ধতী! তোমারই কন্যা এই সরসীবালা আর কুঞ্জবালা! সতী অরুন্ধতি! তোমারই কন্যা কাশ্মীর-কুসুম—কাশ্মীর-কুসুম—কাশ্মীর-কুসুম!—কেন কাশ্মীর-কুসুম, কি গুণে কাশ্মীর-কুসুম ফুটন্ত, তোমারই কুঞ্জবালা নিজ মুখে তোমাকে একদিন সে সব কথা শোনাবে। যত দিনে শোনাবে, ততদিন আমি যদি বেঁচে থাকি, আমিও এই পাকাচুলে সে সব কথা শুন্‌বো। যে সব কথায় কুঞ্জবালা কুণ্ঠিত হবে, যে সব কথায় কুঞ্জবালার লজ্জা আস্‌বে, আত্মশ্লাঘার ছায়া মাখা থাক্‌বার ভয়ে, যে সব কথায় কুঞ্জবালার ভয়ের সঙ্গে ঘৃণা আস্‌বে, সে সব কথা কার মুখে প্রকাশ হবে, সে কথাটী এখন আমি তোমাদের কাহারও কাছে নিশ্চয় কোরে বোল্‌তে পারি না। বনবাসে জন্মকাল থেকে আজ্‌ এই সুড়ঙ্গবাসে প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত, সমস্ত জীবন-বিবরণ এক সঙ্গেই জানা চাই। কাহিনীটী হবে, একটী ফুলের গাছ;—যথা সময়ে বসন্তকালে সেই ফুলগাছে ফুল ধোর্‌বে, একটি বৃন্তে দুটী ফুল ঝুল্‌বে, ফুলেরা পরস্পর মুখোমুখী কোরে হাসি খুসী কোর্‌বে; সেই ফুলের পরিচয় পেয়েই পৃথিবী শুদ্ধ লোকে জান্‌বে, সুদৃশ্য সুগন্ধ সুন্দর ছাঁচের কাশ্মীর-কুসুম!—সেই কুসুম এই কুঞ্জবালা আর সরসীবালা! কুঞ্জবালার লজ্জার কথাগুলি বোল্‌বে কে? যে তীব্র চক্ষু কুঞ্জবালার জীবনের সঙ্গে অনবরত ছায়ার মত ঘুরেছে, যে মুখে সেই চক্ষের অবস্থান, সেই মুখ থেকেই

কুঞ্জবালার সেই সকল গৌরবের কথা বাহির হবে। এইরূপ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান। তিনকালের বাক্য এককালে উচ্চারণ কোরে, য়োগিনী-দেবী একটু থাম্‌লেন। আমার চক্ষে আর অশ্রু ধরে না। চৈত্র মাসের চপলার মত দ্রুত ছুটে গিয়ে জননীর কণ্ঠ ধারণ কোরে, অনন্ত অশ্রুপ্রবাহে তাঁর বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত ক'র্‌লেম। আর একদিক্ থেকে কুমার ইন্দুভুষণের সঙ্গে সরসীবালা ছুটে এলো, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে জননীর গলা জ'ড়িয়ে ধ'র্‌লে।

চতুর্ব্বিংশ তরঙ্গ।

পরিচয়।

কুঞ্জবালার জননী হইলেন অরুন্ধতী দেবী, সরসীবালার জননী হইলেন অরুন্ধতী দেবী। কুঞ্জবালার সহোদরা ভগ্নী হইল সরসীবালা। অরুন্ধতী দেবী সম্বলরাজ মহিষী। এ পরিচয়ে কুঞ্জবালা সম্বলরাজ-কুমারী। রাজচক্রবর্ত্তী মহানন্দ রাওজীর গুণাকর পুত্র কুমার ইন্দুভূষণ রাও, কুঞ্জবালাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, শেষে আবার যোগিনীর উপদেশে, সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, কুঞ্জবালার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন, বিদায় লইয়াছিলেন; কিন্তু সে

সংশয় দূর হইল। যোগিনীর যে প্রকার উপদেশ, কুঞ্জবালার ভাগ্যে সেই উপদেশ মিলিল। তাহার পর এখন প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

কুমার ইন্দুভূষণের আকৃতির সঙ্গে, মোহনপুরীর ললিতানন্দের আকৃতির চমৎকার মিলন। ললিতানন্দ কুমার ইন্দুভূষণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। রত্নবতীর চক্রের গুপ্ত অনুসন্ধানে, প্রয়োজন মত উত্তর সাধকতায় এবং প্রমাণপত্র সংগ্রহে কুমার ইন্দুভূষণকে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হইত,—বেশী দিন নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীতে থাকিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ সর্ব্বদা রত্নবতীর সুড়ঙ্গে গতি বিধি থাকিলে, চক্রী লোকেরা সন্দেহ করিবে, সাবধান হইবে, ইহা ভাবিয়াই, ভিতরে ভিতরে দূরে দূরে থাকিতেন, মধ্যে মধ্যে এক একবার আসিতেন। কাশীর সুলুক সন্ধানের জন্য ললিতানন্দ কিঞ্চিৎ ছদ্ম পরিচয়ে মোহনপুরীতে আছেন। কাশীর লোকে জানে, ললিতানন্দ সামন্ত; কিন্তু বাস্তবিক তিনি মহানন্দ রাওজীর দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভজাত পুত্র ললিতানন্দ রাও। জয়মঙ্গলা, জয়লক্ষ্মী আর জয়তারা ললিতানন্দের সহোদরা ভগ্নী। ইন্দুভূষণের জননী কন্যা সন্তান প্রসব করেন নাই। কুমার ইন্দুভূষণ ললিতানন্দের ভ্রাতা, এটা ভীমরাজ জানিত না; কিন্তু কুমার ইন্দুভূষণ যে মহীপতি বাহাদুরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, এটা ভীমরাজ জানিত। ইন্দুভূষণ বালক, দূর দেশে থাকে, কাশীর খবর রাখে না, যদি দৈবাৎ কিছু শোনে, দুই কথায় থাক্ দিয়া রাখিতে পারিবে, শুধু মুখে না হয়, কিছু

বেশী রকম টাকা দিয়া বশীভূত করিতে পারিবে, এই ভরসা ভীমরাজের বুকে বিলক্ষণ জাজ্জ্বল্যমান ছিল। ইন্দুভূষণ মাঝে মাঝে, সুড়ঙ্গে আসিতেন, রত্নবতীকে মাসী মা বলিয়া আত্মীয়তা করিতেন। ভীমরাজ আদর করিত, রত্নবতীও ভাল বাসিত, ইন্দুভূষণও ভীমরাজের দলের অন্য পরামর্শে মাঝে মাঝে সায় দিতেন, মাঝে মাঝে যোগ দিতেন; ভীমরাজের আহ্লাদ বাড়িত। স্বচ্ছন্দে ভোগ। দিতে পারিবে, এ বিশ্বাস তাহাদের মনে দৃঢ়-বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু দেখ, জগদীশের কি অপরূপ মহিমা! সেই ইন্দুভূষণ হইতেই ভীমরাজের পাপিষ্ঠ দল সমূলে নির্ম্মূল হইল!—কেবল সুড়ঙ্গের দল নয়, বাহিরের ডাকাইতেরাও ইন্দুভূষণ হইতে ছার খার হইয়া গেল। বিশে ডাকাতের দল, ভীমরাজের আর সোমরাজের পরামর্শেই, কুঞ্জবালাকে বনমধ্যে ধরিয়া ধরিয়া লইয়া যাইত। কুঞ্জবালার পৈতৃক রাজত্বে ভীমরাজের লোভ ছিল, অরুন্ধতী দেবীর পরিচয়ে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। কুঞ্জবালা সরসীবালা অরুন্ধতীর কন্যা, ইহাও ভীমরাজ জানিত। কন্যারা প্রকৃত বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে না পারে, চিরকাল অজ্ঞাতবাসে অন্ধকারে থাকে, তাহারা নিজে বালিকাদের ন্যায্যধনে অধিকারী হয়, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষার অগ্নিঘর্ষণেই বালিকাদের উপর উৎপীড়ন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কারণ।

প্রতিমার কোলে ভীমরাজের মরণ হইল না। প্রতিমা খানা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। প্রতিমা সত্য সত্য পাষাণ প্রতিমা ছিল না, সমস্তই লোহার গঠন। রং করিবার এমনি তারিফ!

লোহার উপর পাথরের রং করিয়া সমস্ত দর্শকের নয়নে ভ্রম জন্মাইয়া ছিল! অভিন্ন কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ প্রস্তর! কুঞ্জবালা যথার্থ ই অনুমান করিয়াছিলেন। তাদৃশ সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর অতি অল্পই দেখা যায়। ফলে কিন্তু ছাঁচে ঢালা লোহা। মন্দিরের নীচে, প্রতিমার পদতলে সুড়ঙ্গ; সুড়ঙ্গের সঙ্গে, প্রতিমার সঙ্গে, নানাপ্রকার কল প্যাঁচের যোগাযোগ, ভিতরে ভিতরে তার গাঁথা। দুরন্ত দুর্দ্দান্ত লোকেরা ঐ মন্দিরের ঐ সুড়ঙ্গে, ঐ মানুষমারা যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল; ঐ সাংঘাতিক যন্ত্রকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত। মানুষ মারিবার প্রয়োজন হইলে, প্রতিমার পদতলের সুড়ঙ্গে মানুষ থাকিত, সেই মানুষ, পাকে পাকে কলপ্যাঁচ ঘুরাইয়া,প্রতিমাকে রাক্ষসী করিয়া তুলিত। নীচের মানুষেরাই সময়ে সময়ে অবসর বুঝিয়া, লাল আলো, নীল আলো, সাদা আলো, সবুজ আলো, হাসির আলো, কান্নার আলো, সব রকম আলো জ্বালিত। প্রতিমার পাশে লাল আলোটাই, মানুষ মারিবার মহাপাতকের ক্ষণবিনশ্বর আবরণ! এইরূপে এই প্রতিমা অনেক মানুষ খাইয়াছে!

কথা উঠিতে পারে, গুপ্ত সুড়ঙ্গে দুষ্ট লোকেরা ঐ প্রকারে মানুষ মারে, দেশের রাজা কিছু বলে না? রাজা তখন কে? কখনও পাঠান, কখনও মোগল, কখনও ক্ষত্রিয়, কখনও মারহাট্টা, কখনও মগ, কখনও অন্ত্যজাতি। যাহার যখন ইচ্ছা হয়, সেই তখন আসিয়া রত্নালয় ভারতের রত্নভাণ্ডার লুঠপাট করিবার চেষ্টা পায়। নামমাত্র এক একজনকে এক এক সময়

রাজা বলায়, কিন্তু কাণ্ড সমস্তই অরাজক! মোগল তখন ভারতে আধিপত্য স্থায়ী করিবার জন্য, ধীরে ধীরে চেষ্টা করিতেছেন। আক্‌বরের পিতা হুমায়ুন তখন যেন গঙ্গার জোয়ার ভাটার মত স্থানে স্থানে আহত-তাড়িত হইতেছেন। রাজপুত-নার সহিত, মহারাষ্ট্রের সহিত, প্রধানতঃ পাঠানের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ সম্ভাবনা মাথার উপর ঝুলিতেছে। নূতন রাজত্ব পত্তনের অবসরে, এ প্রকার শঙ্কটে, কোন প্রকার রাজকার্য্যের সুশৃঙ্খলা থাকা অসম্ভব, সুতরাং দেশ অরাজক! দেশের কোথায় কত স্থানে কত অরাজক কাণ্ড ঘটিয়া যাইতেছে। কাশীর বড় মানুষ গুণ্ডারা ঐ এক প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া, সুড়ঙ্গের ভিতর অরাজক কাণ্ড দেখাইত!

প্রতিমাখানি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল দুষ্টলোকে, প্রতিমাকে ভক্তি করিত দুষ্টলোকে, প্রতিমার পেষণে মানুষ মারিত দুষ্ট-লোকে। এবার এই শেষবারে বিপরীত পর্য্যায়। দুষ্টা পাপী-নীর পাপজীবন নিধনে, এ ক্ষেত্রে শিষ্ট লোকেরাই সুড়ঙ্গমধ্যে কলচালক হইলেন, শিষ্ট লোকেরাই রক্ত আলো জ্বালিলেন, শিষ্টলোকেরাই যন্ত্র পেষণে দুষ্টা পাপিনীর দণ্ডবিধান করিলেন। এই লীলাই শেষলীলা। পাপ রত্নবতীর পাপদেহ-স্পর্শে এই বারেই প্রতিমা বিসর্জ্জন!

প্রতিমাখানা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। দুই দিক্ হইতে দুটী সুন্দরী কন্যা, ছুটিয়া আসিয়া, অরুন্ধতী দেবীর কোলে উঠিল। কুমার ইন্দুভূষণ মন্দিরের সমস্ত লোকগুলিকে উপরে লইয়া গেলেন। ভীমরাজ সোমরাজ সেই রাত্রেই কোতয়ালের সঙ্গে

কোতয়ালের হাজতে গেল, আর আর সকলেই পুরীমধ্যে রহিলেন। শেষরাত্রে কুঞ্জবালা নির্জ্জনে যোগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। অধিক আহ্লাদের সময় এককালে সকল কথা শুনিতে নাই, শুনিতে পাইলেও, মুখ ফুটিয়া বলিতে নাই, মনোমধ্যে সেই বিষয়ের অধিক আন্দোলন করিতে নাই, যোগিনী এইরূপ উপদেশে কৌতূহলবতী কুঞ্জবালাকে শান্ত থাকিতে বলিলেন। 'দীর্ঘজীবিনী হও! চিরমঙ্গলের ঈশ্বরী হও! কাশ্মীর-কুসুম নামে তোমার নাম, সর্ব্বপ্রকার যশঃকীর্ত্তি-গৌরবে পৃথিবীমণ্ডলে বিঘোষিত হউক!' এইরূপ মঙ্গলবাক্যে প্রণতিবতী কুঞ্জবালাকে কোলে করিয়া অসংখ্য অসংখ্য আশীর্ব্বচনে, মঙ্গল আচরণে ছাইয়া ফেলিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া রাজমহিষী। ধর্ম্ম-জীবনে মনের বিরাগে, গৃহাশ্রম-পরিত্যাগিনী। এক বনমধ্যে ঐ যোগিনীর সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার সাক্ষাৎ হয়। বিষ্ণুপ্রিয়া বৃদ্ধা। বয়স অনুমান ৭০।৭৫ বৎসরের ন্যূন নয়। যোগিনীর নিকটে যোগ শিক্ষা করিয়া, মানসিক বলের সহিত দৈহিক বলেও বলবতী আছেন। বিমলাটীও ভদ্রলোকের কন্যা। মহামারীতে উপর্য্যুপরি সমস্ত স্বজনবর্গ কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে, বিমলা-সুন্দরী উদাসিনী। বিধাতার সংঘটনে যোগিনীর সঙ্গে বিমলারও দেখা হয়। ভক্তিবশে বিমলাও যোগব্রতে ব্রতী হন। বিশে ডাকাতের দল, বিস্তর নিরীহ ভদ্রলোককে সর্ব্বস্বান্ত করে, প্রাণান্ত করিবার চেষ্টা পায়। কুঞ্জবালার মত যাহাদের ভাগ্য, তাহারা অবলাই হউক, অথবা বলবান্ বীর্য্যবান্ ভদ্র-বংশোদ্ভব পুরুষই হউন, দস্যুহস্তে পতিত হইলে, কৌশলে

উদ্ধার করিবেন, সেই ইচ্ছায় যোগিনী দেবী ঐ দুটী বুদ্ধিমতী নারী শিষ্যকে, বিশে ডাকাতের দলের তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। দুষ্টলোকের কুচক্রে কুঞ্জবালা ডাকাতের হস্তে পড়িবেন, যোগিনী ইহা বুঝিয়াছিলেন। কুঞ্জবালাকে উদ্ধার করিবার পরামর্শ আরও বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ডাকাত বিশ্বাস করিবে কিসে? শিষ্য দুটী ডাকাতের গুপ্তদূতী হইবে, এইরূপ মৌখিক অঙ্গীকার।

কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। জীবনদায়িনী বিশ্বাসে অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া, কুঞ্জবালা অবনত মস্তকে বিষ্ণুপ্রিয়াকে আর বিমলাকে প্রণিপাত করিলেন। সকলের বদনেই আনন্দরাগ সুরঞ্জিত!

নিশা শেষে প্রকৃতিও এদিকে ঊষাগাত্রে ধূসররাগে রঞ্জিত। ঊষা আসিল, ঊষা বিদায় হইল; দুঃখের বিভাবরী শেষকালে সুখের জলে স্নান করিয়া, সমস্ত দিনের মত বিশ্রামগুহায় বাস করিতে চলিল। রজনী প্রভাত হইল।

প্রভাতে ইন্দুভূষণের প্রথম কার্য্য, সুড়ঙ্গ পথ বন্ধ করা। প্রভাতে তিনি সেই কার্য্যটী সমাধা করিলেন। সূর্য্যদেবের গতির সঙ্গে ক্রমশঃই বেলা বাড়িতে লাগিল। ক্রমশঃই এক এক করিয়া এক একটী নূতন সংবাদ রাজপুত্রের কর্ণগোচর হইতে আরম্ভ হইল।

বিশে ডাকাতের দলের দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। কুঞ্জবালা যেরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিচারকেরা সেই মর্ত্তেই রায় দিয়াছেন। প্রাণদণ্ড হয় নাই; জীবন থাকিতে এ দেশে আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে না, এইরূপ দৃঢ় আজ্ঞা

দিয়া অভাগাদের নাসা-কর্ণ-ছেদনপূর্ব্বক, দেশান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক পক্ষ অন্তেই সেই দণ্ডাজ্ঞা প্রতি-পালিত হইবে। আগরার চক্রগড়ের বিশ্বেশ্বরের যে দস্যুচক্র ছিল, তাহাদেরও কতকগুলো বিন্ধ্যাচলের গুপ্তকেল্লায় বাঁধা পড়িয়াছে, বাকী যাহারা ছিল, তাহারা এই দুর্দ্দৈব শুনিয়া, কে কোথায় ছড়িভঙ্গ হইয়া পলাইয়াছে, তাহার সংবাদ নাই। বিমলা বলিয়াছেন, কুঞ্জবালা যে রাত্রে ধরা পড়েন, সে রাত্রে ডাকাতের ঘরে সাতটী স্ত্রীলোক ছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া বিমলা সে সাত জনের মধ্যে ছিলেন না; সেই সাত জনের মধ্যে ছজন দস্যুদলের বেতনভোগী গুপ্তদূতী; আর শেষেরটী সেই রাত্রের নূতন ধরা। তাহারই বালিকা কন্যা, ডাকাতের উৎপীড়নে সেই খানে অজ্ঞান ছিল। কুঞ্জবালার উদ্ধারের পর বিষ্ণুপ্রিয়া সেই দুঃখিনী মাতাকে কন্যাটীর সহিত নির্ব্বিঘ্নে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মাতাল ডাকাতেরা কিছুই জানিতে পারে নাই।

সুড়ঙ্গপথ রুদ্ধ করিবামাত্র, রত্নবতীর চূর্ণ দেহটা অন্তিম-সদ্গতির জন্য, ভাগীরথীর তীরে পাঠান হইয়াছে। সৎকার করিবে কে? মুদ্দফরাশ!

বৈকালে সংবাদ আসিল, ভীমরাজের আর সোমরাজের চারিখানা হাতের কুড়িটা অঙ্গুলী কাটিয়া, মস্তক মুণ্ডন করিয়া, কৌপীন পরাইয়া, গর্দ্দভে চড়াইয়া, বহুজনতার মধ্যে নগর প্রদ-ক্ষিণ করান হইয়াছে। কল্য প্রত্যূষে, সর্ব্বজনসমক্ষে, গর্দ্দভা-রূঢ় মণ্ডিত-মুণ্ড অঙ্গুলীশূন্য কৌপীনধারী সেই দুই দুর্জ্জন

পাপীকে, ঢাক ঢোল বাজাইয়া, জন্মের মত এদেশ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইবে।

সূর্য্য অস্ত হয় হয় এমনি সময়। পশ্চিম দিক্ রক্তবর্ণ হইয়াছে; পশ্চিমাকাশে রক্তিম মেঘ উঠিয়াছে, সেই রক্ত মেঘের কিরণ আর অস্তাচলগামী সূর্য্যদেবের আরক্ত রশ্মির হেমপ্রভায়, পূর্ব্বদিকের অট্টালিকা ও বৃক্ষগুলি যেন স্বর্ণমণ্ডিত হইয়াছে। সম্মুখের রাস্তায় জনতা বৃদ্ধি হইয়াছে; জোর জোর বাতাস উঠিয়াছে, কাশীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি রাস্তারা চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে, গোধূলিও নয়, সন্ধ্যাও নয়, বেলাও নাই;—ঠিক্ সেই সময়ে—রত্নবতীর—এখন ইন্দুভূষণের বাড়ীর সদর দরজায় একখানি পাল্কী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাল্কীতে কে? কুমার ইন্দুভূষণ।—পাপিনী রত্নবতীর জালদখলী নিজের পৈতৃক বাড়ীর মালিক হইয়াছেন; নিষ্কণ্টক পূর্ণ অধিকারী হইয়া, কুমার ইন্দুভূষণ তত বড় রঙ্গপূর্ণ বাড়ীখানির নিজনামে ইন্দুপুরী নাম দিয়াছেন। কুঞ্জবালা সম্বলরাজের মেয়ে হইয়াছে, কুঞ্জবালা মা পাইয়াছে, কুঞ্জবালা ভগ্নী পাইয়াছে, কুঞ্জবালা সুখী হইয়াছে, ঘরে বসিয়া এই সকল খোস খবর পাইয়া, প্রমোদিনী কুমারী জয়মঙ্গলা দেবী, প্রিয়সখী কুঞ্জবালাকে দেখিবার অভিলাষে, ইন্দুপুরীতে আসিয়াছেন; ঐ পাল্কীতে ললিতানন্দের প্রিয় সহোদরা জয়মঙ্গলা দেবী।

আনন্দভরে সখী সঙ্গে কুঞ্জবালা হাসিতে হাসিতে আসিয়া, পাল্কী হইতে জয়মঙ্গলাকে গৃহে লইয়া গেলেন, অবস্থার সম্ভবমত আনন্দ-বিনিময় হইল, পরিচয়ের কথা প্রকাশ হইয়াছে, কুঞ্জবালা

সমস্তই শুনিয়াছে, জনরবের রসনা ততদূর সূক্ষ্মতত্ত্বটুকু জয়মঙ্গলার কর্ণে ঝংকার করিয়া গুঞ্জন করিতে পারে নাই। কাশীতে আসিয়া জয়মঙ্গলা শুনিলেন, কুঞ্জবালা আর অন্ধকারে নাই। জয়মঙ্গলা যাহা জানিতেন কুঞ্জবালা তাহা জানিতেন না। কুঞ্জবালার ভাগ্য-ঘটনা অসীম অদ্ভুত! আনন্দ বিনিময়ের সঙ্গে উভয়ের চারি চক্ষে সেই প্রকার বিস্ময় বিনিময় হইয়া গেল।

জয়মঙ্গলার আগমনে কুমার ইন্দুভূষণ প্রসন্ন নহেন। সর্ব্বক্ষণ যেন উদাস উদাস চিন্তাযুক্ত ভাব। রাত্রিকালে তিনি এক সভা করিলেন। সভাতে উপস্থিত থাকিলেন যোগিনী দেবী. অরুন্ধতী দেবী, বিষ্ণুপ্রিয়া, বিমলা, কুঞ্জবালা, সরসীবালা আর জয়মঙ্গলা। বক্তা হইলেন স্বয়ং রাজকুমার ইন্দুভূষণ। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, এবাড়ীর পুনঃ সংস্কার করা আবশ্যক। এবাড়ীতে অনেক গুলি মনুষ্য হত্যা হইয়াছে, এবাড়ীতে অনেক গুলি সাংঘাতিক সাংঘাতিক দুষ্কর্ম্ম হইয়াছে, এ বাড়ীতে অবলা জাতির অপমান হইয়াছে, এবাড়ীর বাতাস পর্য্যন্ত কলঙ্কিত! এবাতাস অধিক দিন গায়ে লাগিলে, দেহ ক্ষয় হয়—আয়ুক্ষয় হয়! সকলগুলি আদরের সামগ্রী লইয়া, এমন দূষিত সাংঘাতিক অট্টালিকায় বাস করা আমার অপরামর্শ। আমার ইচ্ছা, কোন একজন বিশ্বাসী লোকের প্রতি, গৃহ সংস্কার ভারার্পণ করিয়া কিছু দিন আমরা মোহনপুরীতে গিয়া বাস করি।

সর্ব্বসম্মতিতে ইহাই ধার্য্য হইল। অট্টালিকার মূল্যবান্

সামগ্রীপত্র সমস্তই, ইতিপূর্ব্বে কোতরালিতে গিয়া জমা হইয়াছিল, বাকী যৎসামান্য যাহা কিছু, পরদিন প্রাতঃকালে তাহা সংগ্রহ করিয়া কুমার ইন্দুভূষণ সকলগুলিকে সঙ্গে লইয়া, মোহনপুরীতে উপস্থিত হইলেন। প্রস্থানের আয়োজনের অবসরে যোগিনী কখন্ কোথা দিয়া কোথায় সরিয়া গিয়াছেন, কিছুই উদ্দেশ হইল না। বিষ্ণুপ্রিয়া বিমলাও যোগিনীর মত অন্তর্দ্ধান! অরুন্ধতী দেবী অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের নিত্য দর্শন বাসনায় কাশী ধামেই অন্য একখানি বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহারা মোহনপুরীতে আসিলেন না। মোহনপুরীর যাত্রী জয়মঙ্গলা, কুঞ্জবালা, সরসীবকলা, ময়ূরমঞ্জরী আর কপোতকুমারী; প্রহরী রাজকুমার ইন্দুভূষণ।

পরিচয় প্রমাণে কুঞ্জবালা সম্বলরাজের কন্যা হইলেন। জগতের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে, কুঞ্জবালার ভাগ্য কতই অন্ধকারে ঢাকা ছিল। ঘোর কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া একে একে ক্রমে ক্রমে দীপ্তি বিকাশ করিল! অসম্ভব পরিবর্ত্তন! এ অবস্থায় জনরবমৃত ধর্ম্মাত্মা সম্বলরাজ সত্য সত্য সংসার ধামে জীবিত আছেন, কি নশ্বরলীলা পরিত্যাগ করিয়াছেন, আনন্দের অবসরে সেই কথাটী উত্থাপন করিবার অগ্রেই, যোগিনী দেবী অদৃশ্য হইয়াছেন। সকলেই স্থির করিলেন, যোগিনী ভিন্ন সে গুহ্য সংবাদ অপর কাহারও পরিজ্ঞাত থাকা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে! পুনর্ব্বার যোগিনীর সাক্ষাৎ না হইলে, সে অন্ধকার ভেদ হইবার অবসর আসিবে না। যোগিনীকে ডাকিলেই

আইসেন না, সুতরাং যোগিনীর ইচ্ছামত আবির্ভাবের উপরেই সে প্রত্যাশা নির্ভর করিয়া রাখিতে হইবে।

কুমার ললিতানন্দ, কুঞ্জবালাকে সম্মুখে দর্শন করিয়া, আনন্দে বিজয়-গৌরবে যেন ফুলিয়া উঠিলেন! জয়লক্ষ্মী আর জয়তারাও সেইখানে আসিয়া জুটিল। ক্ষণকালের জন্য মোহনপুরীর বৃহৎ অট্টালিকার একটী গৃহ যেন, আনন্দাভিনয়ের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিল! কুমার ললিতানন্দ সুড়ঙ্গচক্রের বিচার দেখিতে কাশীধামে যান নাই, ডাকাতির রাত্রেই প্রস্থান করিয়াছেন, কুঞ্জবালা হাস্য করিয়া সেজন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। ললিতানন্দ হাস্য করিয়া সে তিরস্কার মাথা পাতিয়া লইলেন। কুঞ্জবালা আরও বলিলেন, "আপনি আমার শুভাদৃষ্টের ধ্রুব তারা। আপনি আমারে ধূম্র তরণীতে সর্ব্বপ্রথমে মোহনপুরীতে এনেছিলেন, মোহনপুরীর মহিমাতেই আমার চক্ষের সমস্ত ধূম্রজাল তিরোহিত হ'য়ে গেছে। এখন আমি কতক কতক আপনাকে আপনি চিন্তে পেরেছি। আপনার ধূম্র জাহজের গুণ আছে! ধূম্র জাহাজটী নূতন জিনিস! কারিকরের তারিফ আছে!"

গম্ভীর বদনে ললিতানন্দ বলিলেন, "মহারাজা কারিকর! আমার পিতা স্বয়ং কৌতুকবশে, ধূম্র-বারির পরাক্রমের পরীক্ষার জন্য, স্বহস্তে সেই তরণীখানি প্রস্তুত করেন! পরীক্ষায় দেখ্‌তে পেলেন, ধোঁয়ার বলে জলে চলে। আমার জল ক্রীড়ার জন্য, সেই

পিতা আমার স্নেহের নিদর্শন বোলে দিয়ে গিয়েছেন। এদেশে সচরাচর অমন তরণী দেখা যায় না!"

ললিতানন্দকে কুঞ্জবালার আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ছিল। জাহাজের কথা সমাপ্ত হইবামাত্রই, সকৌতুকে কুঞ্জবালা সেই কথাটী তুলিলেন। সকৌতুকে ললিতানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া, কুঞ্জবালা বলিলেন, "আর একটী কথা! জাহাজে তুলে আপনি আমাকে নিয়ে এলেন, বাড়ীতে এনে রাখ্‌লেন, অভয় দিলেন, আদর যত্ন কোর্‌লেন, তার পর হঠাৎ একদিন রাত্রে সস্ত্রীক বৃন্দাবনে চোলে গেলেন। না বলা না কওয়া; কার কাছে থাক্‌বো, তার ব্যবস্থা না কোরে, একা ফেলে চুপি চুপি লুকিয়ে যেন পালিয়ে যাওয়া; এমনটা হোয়েছিল কেন?"

নিশ্বাস ফেলিয়া ললিতানন্দ বলিলেন, "কিছু দিন আগে যদি তুমি ও কথাটা আমাকে জিজ্ঞাসা কোত্তে, তা হোলে আমি উত্তর দিতে পাত্তেম্ না। এখনও উত্তর দিতে গা কাঁপে! আমি পাগল! আমি নির্ব্বোধ! যে কাজ আমি কোরেছিলেম, তাতে আমি মনুষ্য নামের অনুপযুক্ত! তোমাকে আমি রাক্ষসের হাতে সমর্পণ কোরেছিলেম!"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, ললিতানন্দ বিমর্ষবদনে ক্ষণকাল কি একটু চিন্তা করিলেন। তাঁহাদের বৃন্দাবনে গমন করিবার পরামর্শ পূর্ব্ব হইতেই ছিল; কুঞ্জবালা আসিলেও সেই পরামর্শ নূতন হইয়াছিল,—স্বয়ং যাইবেন, স্ত্রী যাইবেন, ভগ্নীরা যাইবে, কুঞ্জবালা একাকিনী থাকিবে না, কুঞ্জবালাও

যাইবে—এই পরামর্শই পূর্ব্বে ছিল ; হঠাৎ একটা লোক আসিয়া উপস্থিত হয়। ললিতানন্দ বোধ হয়, সেই লোকটার কথাই চিন্তা করিলেন। কেননা, তৎক্ষণাৎ তিনি পুনরুক্তি করিলেন, "তোমাকে আমি রাক্ষসের হাতে সমর্পণ কোরেছিলেম্! তুমি জান্‌তে না, হঠাৎ রাত্রিকালে সোমরাজ এসে উপস্থিত হয়। তুমি জেনেছ, সেই দুরাচার বিশ্বাস ঘাতকটা আমার মূর্খতার বন্ধু হোয়েছিল! তার পরামর্শে আমি অনেক কাজ কোরেছি! তার উপর আমার ষোল আনা বিশ্বাস ছিল! সোমরাজ এসে বোল্লে, "বড় মজা হোয়েছে! এক চেহারার দুই মেয়ে বেরিয়েছে। যে মেয়েটাকে তুমি জাহাজে তুলে এনেছ, সেটাকে বাড়ীতে রেখে যাও! আজ রাত্রেই তোমরা রওনা হও! ভগ্নী তিনটাকে রেখে যাও! তাঁরা বিন্ধ্যাচলে আছে, কাল প্রত্যূষেই আস্‌বে, রেখে যাও! আমি পরীক্ষা কোর্‌বো! আর একটা আমার সন্ধানেই আছে, এইখানে আন্‌বো, রূপে রূপে মিলাবো। তোমরা বাড়ীতে থাক্‌লে সে কাজটা হবে না, তোমরা এই রাত্রেই চোলে যাও! আমি চৌকী থাক্‌বো! কোন বিঘ্ন হবে না!"—আমি আপত্তি কোরেছিলেম, তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের নিতান্তই জেদ ছিল, শেষ কালে ধূর্ত্ত সোমরাজটা বোল্লে কি? 'বিপদ হবে! এই মেয়েকে ধর্‌বার জন্যে চারি দিকে ডাকাত ফেরে ; এ মেয়ে সঙ্গে থাক্‌লে, ডাকাতেরা তোমাদের মেরে ধোরে, সর্ব্বস্ব লুটে, শিকার কেড়ে নিয়ে পালাবে। কুঞ্জবালা থাক্, লুকিয়ে রাখাই ভাল, কোন চিন্তা

নাই, আমি চৌকী দিব!'—বুঝ্‌লে কুঞ্জবালা? সেই মোহন-মন্ত্রে আমি ভুলে গেলেম! তুমি বিপদে পড়ো, সে ইচ্ছা আমার কখনই হোতে পারে না;—বাড়ীতে থাক্‌লে বিপদ হবে না, সেই জন্যই পাপিষ্ঠের মন্ত্রণায় তোমাকে না ব'লে না কোয়ে——"

কথার ভাব বুঝিতে আর বাকী রহিল না। উজ্জ্বলনয়নে চাহিয়া, কুঞ্জবালা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "বুঝ্‌লেম এত দিনের পর! আপনারা বাড়ীতে থাক্‌লে রূপে রূপে মিলানো হবে না, পাকা ধূর্ত্তের সেটা পাকা চাতুরী! আপনারা বাড়ীতে থাক্‌লে, বিশে ডাকাতের হাতে, কুঞ্জবালাকে ধরিয়ে দিবার সুবিধা হবে না, কুঞ্জবালা আপনাদের সঙ্গে বৃন্দাবনে গেলেও দাগাবাজ নরনারী হন্তার মনোবাসনা পরিপূর্ণ হবে না, সেই ছলেই ঐ সকল কুমন্ত্রণার সৃষ্টি! আপনারাও বাড়ী থেকে বেরুলেন, রাত্রিটী প্রভাত হবামাত্র, আমাকে ডাকাতেরা ধ'রে নিয়ে গেল! শেষের কথাটাও এই সময় মনে ক'রিয়ে দিই! আপনারা যখন বৃন্দাবনে, তখন জাল ব্রজবাসী সেজে, জাল চিঠি নিয়ে দুজন ডাকাত আসে! সোমরাজও একজন লোক দিয়ে, জয়মঙ্গলার নামে একখানি চিঠি পাঠায়, সে চিঠিখানা অমনি অম্‌নি চাপা প'ড়ে গেল; ব্রজবাসীর চিঠিতেই, আমরা সবগুলিতে ডাকাতের হাতে ধরা প'ড়্‌লেম! সমস্তই সোম-রাজের কুচক্র। এত বড় জাতশত্রু ছিল, আমার সোমরাজ!"

স্থূল স্থূল পরিচয় গুলি পাঠক মহাশয় অবগত হইলেন। যেখানকার যে ধুমে, যে বাষ্পে, যে মেঘের জন্ম, যোগিনীর

মুখে, অরুন্ধতীর মুখে আর ইন্দুভূষণের মুখে, তাহার তোথা পরিচয় বুঝিয়া পাওয়া হইয়াছে;—কোন্ মেঘে বৃষ্টি হইবে, সে বৃষ্টিতে কি কি উপকার হইবে, তাহাও পরিষ্কার কল্পনাপথে উদয় হইতেছে; ইতিমধ্যে আখ্যায়িকার প্রধান নায়ক নায়িকা গুলির আকস্মিক ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। বিশেষ জরুরি কার্য্যে, দিল্লী হইতে কুমার ইন্দুভূষণের আহ্বান আসিল; কুমার ইন্দুভূষণ দিল্লী যাত্রা করিলেন;—অরুন্ধতী-দেবী, জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে, যোগিনীর উদ্দেশে বাহির হইলেন;—ভৈরবি প্রসাদ নামে কুঞ্জবালার অপরিচিত একটী রাজকুমারের প্রতি বারানসীর ইন্দুপুরীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পিত হইল;—তিনি যখন কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে যাইবেন, পুরী তখন চাবি বন্ধ থাকিবে,—কুমার ললিতানন্দ মোহনপুরীর নিজ বাড়ীতেই রহিলেন,—তাঁহার পত্নী পিত্রালয়ে;—জয়মঙ্গলা, জয়লক্ষ্মী, জয়তারা এই তিনটী ভগ্নী, অভ্যাসমত সহোদরের নিকটে থাকিল;—কুঞ্জবালা সংসারে এখন আর একাকিনী নহেন; এক জননীর গর্ভ-প্রসূতা, বহু দিনের অপরিচিতা, এখনকার আদরিণী ভগ্নী সরসীবালার যত্নে মোহন পুরীতেই রহিলেন;—ময়ূরমঞ্জরী আর কপোতকুমারী এখন আর সামান্য পরিচারিকা নয়, রাজকন্যাদের প্রিয় সহচরী,—কুমার ইন্দুভূষণ যেমন বলিয়া-ছিলেন, সেইরূপে তাহারা, ভগ্নীদের দলে, ভগ্নীর মত হইয়াই থাকিল। স্বাধীনতার বাতাস গায়ে লাগিয়াছে, কুঞ্জবালার বদন প্রফুল্ল-রাগে রঞ্জিত হইয়াছে, কিন্তু সেই বদনে এক ঐক-

বার প্রগাঢ় চিন্তার রেখা দেখা দেয়। বিরলে যখন একাকিনী থাকেন, যোগিনী-দেবী কখন আসিবেন? জননী কতদিনে ফিরিবেন? আপনা, আপনি এই দুইটি প্রশ্ন করিয়া, দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। এইরূপ আনন্দ-সংসারে রাজকন্যা কুঞ্জবালা, মোহনপুরীর মোহন নিকেতনে ভগ্নী সঙ্গে—সখীসঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।